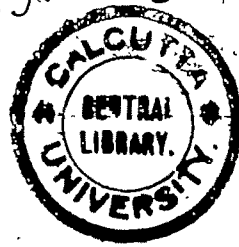


57578-2-8



4

স্বদেশী

শান্তিনিকেতনের অতিথি ভবন...

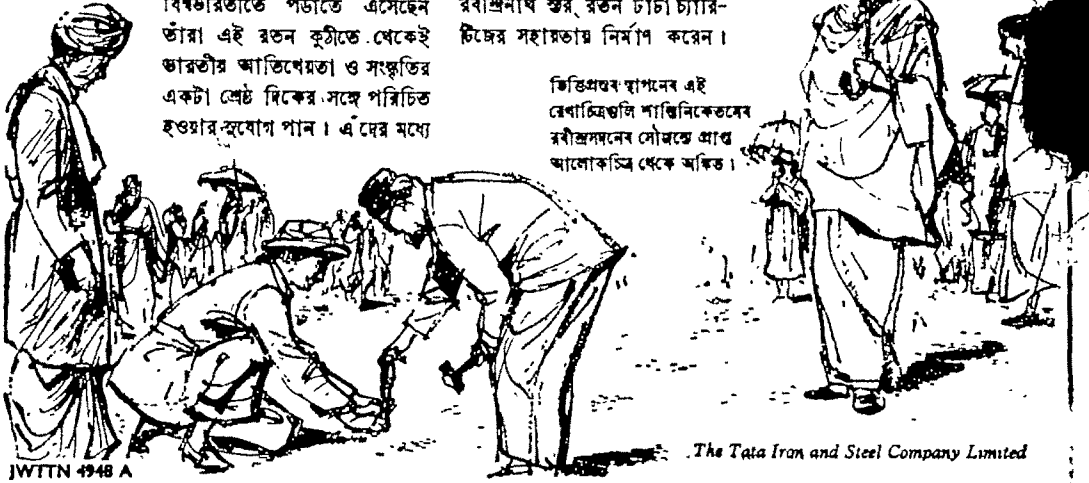
শান্তিনিকেতনের নানা ঐষ্টব্য স্থান-
গুলির মধ্যে একটি হোট একতলা
গতা ও গাছ ঘেরা বাড়িও পড়ে।
বাড়িটির নাম রতন কুঠী।

১৯২৪ সাল থেকে নানান দেশের
যে সব জানী, শুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি
বিশ্বভারতীতে পড়াতে এসেছেন
তারা এই রতন কুঠীতে থেকেই
ভারতীয় আতিথেয়তা ও সংস্কৃতির
একটা শ্রেষ্ঠ নিকের সঙ্গে পরিচিত
হওয়ার সুযোগ পান। এঁদের মধ্যে

সিলভা, লেডি ও ডি হুজুকা,
এম, উইনটাবনিটস্ ও জ্যু পিমন,
এম কলিনস্ ও এলু বোগডানভেব
নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

জানী, শুণী ও বরেন্দ্র আত্মগতদের
অন্ত রতন কুঠী অতিথিভবনটি
রবীন্দ্রনাথ স্তর, রতন টাটা চারি-
টিজের সহায়তায় নির্মাণ করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই
প্রেক্ষাগস্থলি শান্তিনিকেতনের
রবীন্দ্রদেবের সৌরভে প্রাণ
আলোকিত থেকে অধিত।



JWTTN 4948 A

The Tata Iron and Steel Company Limited

অপরূপ বিজ্ঞানিক কীর্তি আমাদের
প্রাচীন নৈবেদ্য বিজ্ঞানকে দেওয়া
বাহুল্য।

প্রাচীন নৈবেদ্য

২৪, বিদ্যম বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-২২।
ফোন: ২২-৭২৩৭

CUK - H04922 - 4 - 1257

4

জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত
হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরূপ—কিন্তু
সকলের চেয়ে বড় তাঁর সূদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্সের সাধনায় আত্ম-
প্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনায় পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনও
হারিয়ে ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপদজনক সেখানে সত্যকে তিনি
ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায়
করেননি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশ-
পূজার যে অর্ঘ্য অসম্মোচে প্ৰবীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি
সত্যের নিম্নতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি
কটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা
করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে
বড় দান।

৮ই মার্চ ১৯৩৬
শান্তিনিকেতন

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩য় বর্ষের বর্ষসূচী

১৩৭১, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

আমার বাল্য কথা—	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
শেকসপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ—	সংকলক, সোমেন্দ্রনাথ বসু	৫২
রবীন্দ্রনাথ—	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (ভাষণ ১৯১৩)	৬৩
রাজপুত্র—	শিশিরকুমার দাস	৬৫
রবীন্দ্র সাহিত্যের দুটি উপমা	দেবদাস জোয়ারদার	৬৯
রবীন্দ্র মানসে যুগে চেতনার প্রতিকলন—	সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৮৬
রবীন্দ্র কাব্যে বৌদ্ধ কাহিনীর পুনর্জন্ম—	নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১০৫
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রজাবলী—		১১৭
পিতৃদেব সম্বন্ধে আমাব জীবনস্মৃতি—	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৪
রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনা ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—	নন্দরাণী চৌধুরী	১২৮
আলোচনা—	সোমেন্দ্রনাথ বসু ও অরুণ ভট্টাচার্য	১৩৪
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমকালীন জগৎ—	সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৬
গ্রন্থ আলোচনা—	সুধীর দাশগুপ্ত, শান্তি সিংহরায়, ৮৬, ১৩৯	
	ঋষি চক্রবর্তী, শচীনন্দন সিংহ, মঞ্জুলা বসু, শিশির	
	কুমার দাস, নীলরতন সেন, নন্দরাণী চৌধুরী,	
	সোমেন্দ্রনাথ বসু বিভাস রায় চৌধুরী, ধ্যানেশ	
	নারায়ণ চক্রবর্তী, অরুণা মিত্র, প্রশান্ত মিত্র	
কবিতাশুদ্ধি-সি, এক, এণ্ড জ—	অম্বাবাদ : সোমেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার দাস,	
	রবেন্দ্রনাথ দেব, কৃষ্ণ ধর, অসিত ভট্টাচার্য	১৫৭
প্রথমতম গুরুদেব (পত্রাবলী)—	অম্বাবাদ : মঞ্জুলা বসু	১৬৩
দীনবন্ধু এণ্ড জ—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৮
গুরুদেব-সি, এক, এণ্ড জ—	অম্বাবাদ : শচীনন্দন সিংহ	১৭২
শযবানী—	সি, এফ, এণ্ড জ	১৭৬
দীনবন্ধু এণ্ড জ স্মরণে—	মহাত্মা গান্ধী	১৭৭
চিরপথিক এণ্ড জ-রোমাঁ রলা—	ইন্দ্রাণী রায়	১৭৮
C. F. A.	গুরুদয়াল মল্লিক	১৮৬

চাৰ্লস ফ্ৰীয়াৰ এণ্ড্ৰুজ—	নিৰ্শিকান্ত সেন	১৮৭
বিশ্বভাৰতী ও সি, এফ, এণ্ড্ৰুজ—	জুধাকান্ত ৰায় চৌধুৰী	১৯৩
দীনবন্ধু চাৰ্লস ফ্ৰীয়াৰ এণ্ড্ৰুজ—	ৰামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৯৭
ৰামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েৰ বেতাৰ ভাষণ—		২০০
একটি চিঠি—	অমিয় চক্ৰবৰ্তী	২০১
শাস্তিনিকেতন পত্ৰিকা : এণ্ড্ৰুজ প্ৰসঙ্গ—	সংকলক : সোমেন্দ্ৰনাথ বসু ও ঋগিন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ	২০২
অভ্যৰ্থনা—	ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ	২০৭
C. F. Andrews from Viswabharati News—	সংকলক : সোমেন্দ্ৰনাথ বসু	২০৮

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ॥
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ॥
বৈশাখ ১৩৭৯

১৫৬৩
০৭/১
১৩৭৯

সূচী

আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
শেখরপায়ের ও রবীন্দ্রনাথ—সংকলক, সোমেন্দ্রনাথ বসু	৫২

সম্পাদক : সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহ-সম্পাদক : সোমেন্দ্রনাথ বসু

বৈতানিকের পক্ষে সোমেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও লোক-সেবক প্রেস, ৮৬এ, আচার্য
জগদীশচন্দ্র বসু রোড হইতে মুদ্রিত।

২৫১৭৭৭

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা

- ১। পদনশচ—অমলেন্দু বসু, ভূদেব চৌধুরী, নীলরতন সেন, রণেন্দ্রনাথ দেব,
সোমেন্দ্রনাথ বসু .৫০
- ২। স্মৃতিকথা—সৌদামিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, হেমলতা দেবী,
ইন্দিরা দেবী ১.৫০
- ৩। কাড়ি ও কোমল ও মিঠেকড়া—সোমেন্দ্রনাথ বসু .৫০

প্রাপ্তিস্থান

বৈজ্ঞানিক প্রকাশনী
৪নং এলগিন রোড
কলকাতা-২০

সন্ধ্যাল এন্ড কোং
১-১এ, বার্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-১২

Phone No. : 34-4369

53, BOWBAZAR STREET
CALCUTTA—12

With Compliments of

P. K. MOOKERJEE & SONS

PRINTERS & BLOCK MAKERS

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৥
বৈশাখ ১৩৭১ ৥
৩য় বর্ষ । ১ম সংখ্যা ৥



আমার বাল্যকথা

● সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেবেলায় আমরা বাবামহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না। তিনি কখন কখনও আমাদের ডেকে ইংরেজি বাঙলায় পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে গিয়ে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার বেলায়। ব্রাহ্মধর্ম পড়বার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রত্যহ আমাদের পারিবারিক উপাসনা হত, তাতে আমরা সকলে যোগ দিতুম। আমি মূখে মূখে প্রার্থনা আবৃত্তি করতুম। একটি স্তোত্রমালার পুস্তকে কতকগুলি ভাল ভাল স্তবস্তোত্র সমিবিষ্ট ছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু আরও অন্য কার কারও বিরচিত। তার প্রায় সকলগুলিই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ফরাসী ব্রহ্মবাদী Fenelon হ'তে অনুবাদিত যে প্রার্থনাটি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেওয়া হয়েছে সেটিও তার মধ্যে ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের একটি প্রার্থনা ছিল তা এখনো আমার কিছু কিছু স্মরণ আছে। তাঁর ভাষার বিশেষত্ব তা হ'তে স্পষ্ট ফটে বেরছে। আরম্ভ এই—

“হে ধ্রুবসত্য সনাতন! কালসহকারে কত বিষয়ের কত প্রকার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার অপরিবর্তনীয় অপার কারুণ্য-স্বরূপের কদাচ পরিবর্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হইতেছে, নগর সকল পুরাতন হইতেছে, রাজ্য ও রাজ্য বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষ অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শমন করিতেছে কিন্তু তোমার সেই কারুণ্য-স্বরূপের কোন পরিবর্তন নাই, ইত্যাদি।”

তখন ১১ই মার্চের উৎসব খুব ধুমধামে সম্পন্ন হত। বিস্তর লোকজনের সমাগম আর রাগ্রে এক বৃহৎ বৈঠকী ভোজ। তাতে আমরাও যোগ দিতুম। সেই একদিন যেদিনে ছোট বড়র কোন প্রভেদ থাকত না। ঐ উপলক্ষে একবার একদল মিলে পলতার বাগানে গিয়ে বড়ই আমোদ আহ্লাদ করা গিয়েছিল; সেদিনের ব্যাপার আমার বেশ মনে পড়ে। ভোজের কর্মকর্তা ছিলেন জগমোহন গাঙ্গুলী। লোকটি বিলক্ষণ ছদ্মপুষ্ঠ বলিষ্ঠ—তাঁর ভুড়িটিও অতুলনীয়। এমন সৌখীন আমদে অথচ ক্রিমিষ্ঠ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। খাওয়া, পরা, ওঠা, বসা, প্রত্যেক কার্যে তাঁর কারিগরি প্রকাশ পেত। রান্না বাস্না ঘর কমা—পোষাক সাজ সজ্জা, কারুকার্য, ছুতরের কামারের কাজ—সকল কর্মেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা ছেলের দল তাঁর বড় নেওটা ছিলুম—তাঁর ঘরে গিয়ে খেলা করতুম,— তাঁর কাছে গল্প শুনতুম; তাঁর খুঁটিনাটি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে কোনওটা আবদার করে আদায় করতুম,—তাঁর মূখের পান কি মিষ্টি লাগত! তিনি আমাকে উদর প্রথম কেতাব “চাহার দরবেস” শেখাতেন—“সুদান আদ্যা ক্যা সানে হ্যায় কি জিসনে এক মিটি খাকসে ক্যা ক্যা সুরতে আওর মিটিকি মুরতে পয়দা কিয়া।”

তঁার ছুঁড়িটি আমাদের আদরের সামগ্রী ছিল আর তিনি সকালে যে নাকডাকানী গম্ভীর আওলাজে দিগ্বিদিক ধ্বনিত করতেন আমরা ভোরে উঠে তাই শুনতে যেতুম। তিনি এক-প্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বারপাল ছিলেন। একবার একদল পদূলিস ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে বলপূর্বক আমাদের একটা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার যোগাড় করছিল—তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। আমাদের জগমোহন সেকালের রামমূর্তি।

সেই গাঙ্গুলীমশায় পলতার বাগানে আমাদের বনভোজনের আহার সামগ্রী প্রস্তুত করলেন—সে মাছের ঝোল ভাত আর ভুলব না! আমাদের বাহনগদূলি সারি সারি চলেছে—৮।১০টা বোট—আমরা রাগিশেষে পলতার বাগানে দলবলে গিয়ে উপনীত হলাম। বোটে আমাদের বিদূষক ছিলেন নবীনবাবু; তাঁর হাস্যপরিহাসে সন্ধ্যাটা খুব আমোদে কেটে গেল। তাঁর বিদ্রূপের বাণ বিশেষরূপে যঁর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল সে লোকটি বে—বাবু। আমি তাকে হাবু বলব। বাবু শব্দের নবীনবাবু এক ছড়া বেঁধেছিলেন তা হাবুবাবুতে বেশ খেটে যায়—

বাববো বহবঃ সন্নি বাবুয়ানা পরাম্পনা হাবুবাবু সমো বাবু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

তিনি একজন কক্ষপ্রধান লোক—ঠান্ডার ভয়ে গলায় সালের গলাবন্ধ ও গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে মৃড়িসৃড়ি দিয়ে বসে ঝিমছেন। বোটের ভিতর একপাশে একটা ছোট কাচের আলমারী ছিল। নবীনবাবু যখন হাবুর প্রতি লক্ষ্য করে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব করলেন যে ঐ কাপড়ের পার্সেলখানা তুলোয় জড়িয়ে এই গ্লাসকেসে পুরে রাখলে ভাল হয়, তখন আমাদের হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল। পলতায় নেমে আমরা দলে দলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লাম। প্রধান দুইদল—একদল চড়ুইভাতী রামার চারিদিকে, অন্য দলের কেন্দ্র হচ্ছেন—চাটুখোমশায়। ভবিষ্যতে তিনি আমাদের একজন পরম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়ত ৪০ পেরিয়ে থাকবে কিন্তু বালকের মত তাঁর ভাবভঙ্গী উৎসাহ কলরব, নৃত্যগীত লীলাখেলায় আমাদের সর্বলকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর তখনকার গান মনে পড়ছে—

ব্যাটাছেলের (মুখে)* কড়ি সর্বলোকে কয়,
সাহসের কার্ণে ব্যাটাছেলের পরিচয়।
কলম্বস নাবিক ছিল, সাহসে আমেরিকা গেল,
দেশের বার্তা জেনে শেষে দেশটি করলে ছয়।
ব্যাটাছেলে হবে যদি, সাহস কর আজ অবধি,
বিধবা বিবাহে কর আনন্দ উদয়।

উপরে আমি পারিবারিক উপাসনার কথা উল্লেখ করেছি। কোন কোন দিন উপাসনান্তে বাবামশায় আমাদের উপদেশ দিতেন। আমাদের যা কিছু দোষ দেখতেন কোন কোন দিন উপদেশে তার উল্লেখ করে শৃঙ্খলে দেবার চেষ্টা করতেন। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরাজি রকম চাল চলনের বাড়াবাড়ি আরম্ভ কবেছিলুম তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময় ইংরাজি রীতিনীতির অম্ব অনুকরণ—অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ভৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন—সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। বিলেতে থাকতে আমি তাঁকে একবার নাচ-মজলিসে বিবিসাহেবের একসঙ্গে নৃত্য

* কথাটির সামান্য একাটি অক্ষর বদল করিলাম।

বর্ণনা করে পত্র লিখেছিলুম—তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি সেই রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না যাই।

বাবামহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথম দিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেহেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়েছিলেন; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটি পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স—আমি ছিলাম যোরা Radical.

এই সকল বিষয়ে আমাদের যতই মতভেদ থাক না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক দূর ইচ্ছামত চলতে দিতেন।

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, “তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?” আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয় মুসলমান রীতির অনুকরণ। অনুকরণ এবং মুসলমান অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হতে তার উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু-আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিচ্ছাকৃত কুপ্রথা বলে মনে হত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্সী করতুম এখন মনে হলে হাসি পায়। John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে ‘স্ত্রী-স্বাধীনতা’ নামে এক Pamphlet বের করেছিলাম। বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করছে।—গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলরতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন। আমি একবার একটি সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবার মধ্যে অতিথিরূপে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলাম। গৃহে অনেকগুলি কন্যা কুমারী ছিলেন—সমস্ত গৃহকার্থে তাঁহাদেরই আধিপত্য। বিদায় নেবার সময় তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ আমার হস্তাক্ষর রেখে যেতে অনুরোধ করাতো আমি লিখেছিলাম—

“স্থিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্মি কশ্চন।”

তাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীরা পর্দার অন্ধকারে কি খবরীকৃত বস্ত্র জীবন যাপন করেন, —উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ,—তাঁদের স্বাভাবিক স্তানবলক্ৰিয়া কিছই স্ফূর্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্বপশ্চিমের পরস্পর বিপরীত ভাব আমাদের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হলে—পর্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জ্বলে উঠল। কিন্তু তখন ভাল করে দেখতে পেলুম আমার সামনে যে পর্বত সমান বিঘ্নাবাধা তা অতিক্রম করা কঠিন। যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুর্লভ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়। তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে এসেছি—বোম্বাই আমার কর্মস্থান নিয়োজিত হয়েছে—বোম্বাই যেতেই হবে, আর আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তখন আবার কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে রেলপথ প্রস্তুত হয়নি—জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামহাশয় তাতে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। এখন কথা হচ্ছে ঘাটে

উঠা যায় কি করে? গাড়ী করে ত যাওয়া চাই? আমি প্রস্তাব করলুম বাড়ী থেকেই গাড়ীতে উঠা যাক। কিন্তু বাবামহাশয় তাতে সম্মত হলেন না—বল্লেন মেয়েদের পাশ্কাঁ করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক। অসুখস্পন্দ্য কুলবধু কর্মচারীর চত্বরে সামনে দিলে বাহির দেউড়ি ডিঙিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এ তাঁর কিছতেই মনঃপুত হল না। এই ত গেল পর্দা ভাঙ্গার প্রথম অবস্থা। আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ-মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বোঁকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এসব কথা গল্পের মতই মনে হয়। এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিস্কৃত হলে এল। ক্রমে আমাদের বাড়ীর লোকেরা (মেয়ে পুরুষ) আমার ওখানে গিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবাস-স্বাপন করতে লাগলেন। ওদেশে বোম্বাই মাদ্রাজে কোথাও বাংলা দেশের মত মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতার মুক্ত-বায়ু সেবন করে তাঁদের মনোভাব অনেক পরিমাণে বদলে গেল। পর্দার উচ্ছেদ সাধন আমার যে চিরকালের সাধ তা ক্রমে মেটবার মত হয়ে এল। আমি বোম্বাই থেকে ছুটির সময় মাঝে মাঝে বাড়ী আসতুম—তখন দেখি পর্দার তেমন কড়াকড় বাঁধুনি নেই, অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তারপর এখন!

সেকাল আর একাল—কি তফাৎ! কলকাতা সহরের ভদ্র মহিলারা রাস্তা ঘাটে গাড়ীতে মোটরে ইচ্ছামত বেড়িয়ে ব্যাড়াচ্ছেন এ দৃশ্য কারও নতুন ঠেকে না। যা কিছুকাল পূর্বে কম্পনারও অভীত ছিল এক্ষণে তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। সত্যি সত্যিই অস্তঃপুরু-বাসিনীগণ এখন মেমের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। এতদিনে আমার মনস্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে।

আমি আমার বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে-কালের কথা পেড়েছি সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল। তখন আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার স্মৃতি তারও উর্ধ্ব অনেক দূর পর্যন্ত যায় এবার যতটা পারি স্মৃতির অতীতের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব।

স্মারকানাথ ঠাকুর

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমার পিতামহ স্মারকানাথ ঠাকুরকে মনে পড়ে কি না? তার উত্তরে বলতে পারি একেবারে মনে পড়ে না তা নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে তাও নয়। একদিন তিনি আমাদের তিন ভাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু দিয়েছিলেন, দুচারটি হাসির কথা বলেছিলেন, সে ঘরটি মনে আছে আর তাঁর চেহারাও মনে পড়ে, তবে কাপসা কাপসা। তাঁর যে চেহারা আমার মনে অঙ্কিত আছে তা সে-সময়কার চাক্ষুষ স্তম্ভ থেকে কিম্বা তাঁর যে সকল চিত্র আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তার প্রতিচ্ছবি তা ঠিক বলা যায় না—খুব সম্ভব শেষটাই হবে।

কর্তাদাদা যখন আমাদের ছেড়ে বিলাত যাত্রা করেন তখন আমরা নিতান্ত শিশু, সে সুব ঘটনা কিছুই মনে নাই। এদেশে যখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসে তখন আমরা বোটের মধ্যে গঙ্গার উপরে ভাসছিলাম—ভয়ানক বড় ভুফান উঠেছে আর বড়দাদা হেমেন্দ্র ও আমি মার কাছে ভয়ে জড়সড়,—সেই ভুফানের মধ্যে আমাদের একজন ভৃত্য কর্তাদাদার মৃত্যু সংবাদ এনে বাবামহাশয়ের হাতে দিলে। এই ঘোর দুর্ভোগে আমরা পলতার বাগানে নেমে, সেখান থেকে গাড়ীতে উঠে কোন প্রকারে বাড়ী পৌঁছিলাম—পৌঁছেই দুধ দুধ করে অস্থির। এইটুকু আমার মনে আছে। পিতার আত্মজীবনীতে ঘটনাটির বর্ণনা এইরূপঃ—

“আমাদের স্বরূপ খানসামা আমার হাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ আনিয়া দিয়া বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমাদের বোট ও পিনিস কালনা ছাড়াইয়া কতদূর গিয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতার অভিমুখে ফিরিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টি ও বাতাসের কোলাহল। পলতায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। পলতায় পৌঁছিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এখানে আসিয়া বোট কাং হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত জল দাঁড়াইয়াছে, সকলি বৃষ্টির জল। যদি পলতায় গাড়ী না থাকিত তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; একথা আর কাহাকেও বলিতে পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতর গাড়ির চাকা অর্ধেক মগ্ন। অতিক্রমে বাড়ী পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতর স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতলায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ব্রজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।” পৃঃ ৬০—৬১

স্বারকানাথ ঠাকুর দুবার ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বারে লন্ডন নগরে ১৭৭৮ শকে (আগষ্ট ১৮৪৬) তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স্ক্রম ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও অপর একজন আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুনোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। লন্ডন সহরের প্রান্তবর্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। আমি প্রথম যখন সেই সমাধি মন্দির দেখি তখন তার নিতান্ত ভ্রান্তবোধ, পরে তার জীর্ণসংস্কার হয়েছে। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় দুই মহাত্মা যাঁরা ঐ সমুদ্র পশ্চিমে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন যাতে বিলুপ্ত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, একথা বলা বাহুল্য।

স্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় তাঁর অগাধ জমিদারী বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে যান তা তাঁর মনের মতন হয়নি। যে সকল কর্মচারীর উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাঁদের কার্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কতটা নিজে তত্ত্বাবধান না করলে ‘যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়’ এ এক প্রকার ধরা কথা। আমার পিতা যদি তেমন মনোযোগ করে বিষয় কর্ম দেখতেন তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু করতে হ’ত তাই করতেন। কর্তাদাদা তাঁকে লন্ডন থেকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখেছিলেন তার এই উদ্বেগ থেকে দাদামশায়ের মনোভাব কতকটা জানা যায়ঃ—

“আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উদ্ভাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লন্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।”১

আমি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্রের উপকূল Worthing নামক বন্দরে গিয়া কিছুদিন বাস করি। উহা আমার নিকট এক প্রকার তীর্থস্থানের ন্যায় মনে হইছিল, কেননা ঐখানে আমার পিতামহ স্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একমাস কাল যাপন করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি

এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন, এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক মাটির পুরামর্শে রোগ শান্তির জন্যে এই বন্দরে গিয়ে অবস্থিতি করেন। তিনি যে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গ দেখা করি; সাহেবটির নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক খবর শুনতে পাই। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইঃ—

স্বারকানাথ ঠাকুরের সর্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভূত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জার্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোট কাকা নগেন্দ্রনাথ আর দুই সম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীনবাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোট কাকার গায়ে এক বহুমূল্য্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর তাঁর জুতাজুতলে কাল চোখের প্রশংসা সর্বত্র শোনা যেত। তাঁর কথা আর বেশী কিছু জানতে পারলাম না। আমার পিতামহের শরীর শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ওটার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন—তারপর আহা! তাঁর ভৃত্য হুঁলির তয়েরি কারি-ভাত আর একটু কমলানেবুদর জেলী, এইমাত্র আহা! পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন—Duchess of Inverness রোজ পত্রম্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ঐশ্বর্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে চটুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্মী ভূত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুঁলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (Tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হ'ত না, জানালা খুলে শূন্যে দিতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফজল ভাল বাসতেন। দিনরাত তাঁর সেবাশ্রুতায় নিযুক্ত প্রিয়ভৃত্য হুঁলি তাঁর শোবার ঘরের বাহিরে শূন্যে থাকত। অনেক সময় তাঁর বিছানার পাশে মাদুরের উপর বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, “I am content” আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হ'তে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গ করে লন্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

স্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমুলায় সম্পর্কে কথোপকথন

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় প্রোফেসর ম্যাক্সমুলায় আমার সংস্কৃতির পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষান্তে যখন আমি তাঁর সঙ্গ দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে ও আমার স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতৃদেব সম্পর্কে আমাকে অনেক কথা বলেন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রেমাকর্ষণ সর্বপ্রথমে কিরূপে হয়, সে বিষয়ে তিনি বলেন যে অতি শৈশবকাল হইতে লোকমুখে ভারতবর্ষের নানা প্রকার বিবরণ শুনে তিনি সেটাকে একটা স্বপ্ন-রাজ্যের ন্যায় জ্ঞান করতেন। রূপকথায় যেমন থাকে যে, যোম্মা একদিন হঠাৎ

স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন অজানা দেশে এক পরমাসুন্দরী কন্যা বন্দিনীভাবে বাস করছে, তাই দেখে যোন্ধ্যার মন এমন বিচলিত হ'ল যে, কত খোঁজ করে যত্ন করে যতদিন না তার উদ্ধার সাধন করতে পারতেন, ততদিন যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন না; তেমনি ভারতবর্ষকেও তিনি তাঁর স্বপ্ন-রাজ্যের সুন্দরী বলে কল্পনা করতেন। তারপর যখন তাঁর দশ বৎসর বয়স তখন তাঁর ইন্সকুলের কর্তৃপক্ষের মলাটে হঠাৎ একদিন কাশীর স্নানের ঘাটের চিত্র দেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই দিকে চেয়ে বসে রইলেন। চিত্রটি যদিও বিশেষ পরিস্ফুট ছিল না, তবুও সে ছবিখানি তাঁর বেশ মনে ছিল। তিনি বঙ্গেন, “ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক তখন আমার কতটুকু জ্ঞান ছিল? কেবল এই শুনিয়েছিলাম যে ভারতবাসীরা কৃষকায়, তারা বিধবাদের জ্বলন্ত চিত্র অর্পণ করে, আর স্বর্গলাভ করবার জন্য জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে নিজেদের নিক্ষেপ করে শরীরকে ক্ষতিবিক্ষত করে। আমার কর্তৃপক্ষের চিত্রে কিন্তু দেখলাম যে তারা বেশ লম্বা এবং সুশ্রী। আর গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দিরাদি অঙ্কিত ছিল তাদের সৌন্দর্য ও উচ্চ চূড়াগুলিতে এমন একটি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছিল যে, আমার স্বদেশে গির্জা ও প্রাসাদগুলি তাদের নিকট হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের কল্পনায় মগ্ন হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার শিক্ষকমশায় এসে কানটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বঙ্গেন যে, এতক্ষণ কুঁড়েমি করে বসে থাকার দরুণ আমাকে আরও অনেকগুলি পাতা করিতে হবে। এই তো গেল ভারতের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষর পরিচয়।

“তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। ১৮৪১-সালে আমি যখন লিপ্সিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন আমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার লক্ষণ দেখা গেল। একদিন শুনলাম যে সংস্কৃত-চর্চার জন্য নতুন শ্রেণী খোলা হয়েছে এবং প্রোফেসর ব্রুকহস্ ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে লেকচার দেবেন। আমি রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করে দিলাম এবং নলোপাধ্যান, শকুন্তলা ও ঋগ্বেদের কতক অংশ পড়তে শিখবার পর বার্লিন ও তৎপরে প্যারিসে সংস্কৃত-চর্চা করতে যাই।

“সেই সময় ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা আমার বড়ই প্রবল হয়েছিল। ইয়োরোপীয় ছাত্রদের যেমন রোম অথবা এথেন্স দেখবার একটা তীর্থ স্পৃহা থাকে, আমারও তেমনি একবার ভারতবর্ষ দর্শন করে কাশীর পবিত্র গঙ্গায় স্নান করবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন তাহা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, কারণ একে ত তখন ভারতবর্ষ ছিল ছয় মাসের পথ, তার উপর অধিক ব্যয়সাধ্য। ভারতের মূখ্য দর্শন করা জীবনে আমার ভাগ্যে ঘটিল না। যৌবনকালে অর্ধাভাবে যাওয়া ঘটে নাই, এবং পরে যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুদের দ্বারা বার বার নিমন্ত্রিত হয়েছি; কিন্তু একে বৃন্দকাল, তায় নানা কষ্টব্য কর্মে জড়িত হ'য়ে পড়ে এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া দুর্ঘটন হ'ল। তা ছাড়া শব্দ ভারতবর্ষ একবার বেড়িয়ে এলেই তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ত না। অন্ততঃ দুই তিন বৎসর সেখানে বাস করতে না পারলে, ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিখতে না পারলে এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে না পারলে আমার পক্ষে ভারতভ্রমণ বৃথা হ'ত। আমার সঙ্গে ভাবতের সম্পর্ক তো শব্দ উপর থেকে নয়, তাহা বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে। কেবল যদি কলিকাতা বা বোম্বাই ঘুরে আসা আমার উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে তো বিলাতের অক্সফোর্ড বা বন্ড স্ট্রীট একবার বেড়িয়ে এলেই হয়।

“কিন্তু যদিও আমি কোন দিন ভারতে পদার্পণ করিনি তথাপি আমার সৌভাগ্যবশতঃ যুরোপে ভারতের কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও সুযোগ্য সম্রাটের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অনেকে আমাকে বলেন যে, এই সকল মহৎ-চরিত্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ায়, ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা জন্মেছে;

কারণ সর্ববিষয়ের উৎকৃষ্টতা দেখলাম কিন্তু নিকৃষ্টতা কিছু জানতে পারলাম না। আমার মনে হয়—তাতে ক্ষতি কি? ভারতবাসীর চরিত্রের চরিত্রোৎকর্ষ যে কতদূর হইতে পারে তাহা তো দেখলাম। অবশ্য আমি এমন আশা করি না যে, একটা সমগ্র জাতি কেবল রামমোহন রায়, স্মারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মালাবারী বা রমাবাইয়ের ছাঁচে ঢালা হবে, কিন্তু তা বলে, যে দেশের মধ্যে থেকে এই সব মহচ্চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশের জাতীয় চরিত্র উপেক্ষা করবার নয়।

“৫০ বৎসর পূর্বে ভারতবাসীরা এমন অবাধে ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার বিভীষিকা তখন খুব প্রবল ছিল; সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাস্ত্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থূল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসর বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে নবাগত ভ্রমলোকটি আমারই এই প্রোফেসরের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে বড় বেশী বিলম্ব হ’ল না। প্রোফেসর বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ’ল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ স্মারকানাথ ঠাকুর।

স্মারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হ’লেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তখন তিনি ইন্সটিটিউট-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসর বারনুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসর তাঁকে নিজের ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুণি, অপর দিকে ফরাসী তর্জমাগুণি ছাপান ছিল। স্মারকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গগুণী ফরাসী তর্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বলেন, ‘আহা! এইগুণি যদি আমি পড়তে পারতাম!’ তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জ্ঞানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

‘যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হ’ল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হ’ত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এই ভাবে আমাদের দিনগুণি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পার্শ্বিক গজল, এবং আমিও তাতে বিশেষ কোন মাধুর্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বলেন, ‘তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।’ তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলিতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হ’ল যে, গানে না আছে সূর্য, না আছে কান্দকার, না আছে সামঞ্জস্য। স্মারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বলেন, ‘তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদা শুনিনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্রান্ত হইনি; আমি ক্রমাগত চর্চা করতে লাগলাম যতক্ষণ না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম।

সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ বাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বদ্বতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ বাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম বদ্বতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জ্ঞান, আমরা হয়তো তারো অধিক জানতে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।

“এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; তাঁকে ঠান্ডা করবার জন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতারণা করে বললাম যে, ‘আমি শুনছি যে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি অশ্বশাস্ত্র হইতে। আমি একবার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা সংস্কৃত খসড়া দেখেছিলাম কিন্তু কিছুই বদ্বতে পারলাম না। প্রোফেসর উইল্‌সন্‌ একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক এবং তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন, সেইজন্য তাঁকে আমি ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা শিখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। তিনি বলেন যে, তিনি গান শিখবার জন্য একবার একজন কালোয়াতের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কালোয়াত বলেন যে, ছয় মাস পর্যন্ত সন্তাহে দুই তিন দিন করে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে পর তিনি বলতে পারবেন যে এই ছাত্র সঙ্গীত-বিদ্যা শিখবার উপযুক্ত কি না এবং তারপর একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করলে তবে পারদর্শী হতে পারবেন। এই কথা শুনে প্রোফেসর উইল্‌সন্‌ সেই-খানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীত-রসিকের প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দেখে আমার বড়ই লোভ হ’ত শিখবার জন্য, কিন্তু প্রোফেসর উইল্‌সনের মূখে ঐ কথা শুনে পর্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা দমন করতে হ’ল। তোমাদের ঠাকুরপরিবারের মধ্যে আর একজন সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রধান পুস্তকপোষক আছেন—তিনি হচ্ছেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

“তোমার পিতামহ স্মারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না, তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রাশ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বলেন, ‘আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণকে পোষণ করে আসছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রাশ্চিত্ত।’ কিন্তু তিনি যে কেবল দেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়—তিনি যাদের নাম-করণ করেছিলেন ‘কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ’,—তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করতেন, কিন্তু পাদ্রিকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও পারমাণবিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্ন সহকারে পাদ্রিদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অশ্রুত সংগ্রহ—অনেক সময় আমি ভাবি যে সে খাতাখানির কি দশা হ’ল। তোমার স্বামি-প্রতিম পিতা কখনই সে খাতা লয়ে রহস্য করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই ‘খৃষ্টধর্ম’ ও হিন্দুধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, স্মারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ বের করতেন। অবশ্য আমি বলতাম যে, কোন দেশেরই ধর্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে ধর্মের বিচার করা চলে না।

“স্মারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই

ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শব্দে তা নয়—স্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সন্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সম্রাটক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। স্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কব যে তাদের কি অনির্বচনীয় আনন্দ হ'ল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন।

“ইংলণ্ডে বাসকালীন স্বারকানাথ একটি মহা পুণ্যকর্ম করেন। ভারতের প্রধান ধর্ম-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের ভ্রম্ম দ্বিষ্টলের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল; স্বারকানাথ সেই স্থানের উপর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। হয়! তখন তিনি কল্পনাও করেন নি যে, অল্পকালের মধ্যে তাঁকেও এইরূপ বিদেশে প্রাণত্যাগ করতে হবে।

বেদ,

“আমার বড়ই আশ্চর্যবোধ হয় যে, যে দেশে বেদের এত মহাত্ম্য এবং যা প্রধান ধর্মপুস্তক বলে গণ্য, সে দেশে কি না আজ পর্যন্ত বেদ ছাপানো হয়নি এবং সকলের তাতে অধিকারও নেই, কেবল অল্পসংখ্যক পণ্ডিতের নিকট বেদের কতকগুলি খসড়া আছে মাত্র এবং তাই থেকে কেহ কেহ কণ্ঠস্থ করেছেন। সুতরাং পরলোকগত জে, মিয়োর যখন বেদের একটা সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন, তখন কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করলেন না।

“আমি যখন বেদের সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য প্যারিস, বার্লিন ও লন্ডনের পুস্তকালয়ে বেদের যত খসড়া আছে, নীরবে সব সংগ্রহ করে, তা থেকে নকল করে ধারাবাহিকরূপে গোছ করি তেছিলাম, তখন স্বারকানাথ খুব আগ্রহ সহকারে আমার কার্যাবলী দর্শন করতেন। ঠিক সেই সময়েই তোমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ চারজন ব্রাহ্মণ-কুমারকে চতুর্বেদ শিক্ষা করবার জন্য কাশীতে পণ্ডিতদের কাছে পাঠান। আমি প্রথমে মনে কবেছিলাম যে, বাক্সি স্বারকানাথ আমার বেদ প্রকাশ সম্বন্ধে পুস্তকে কিছু লিখে থাকবেন, এবং তাই থেকে কাশীতে ছাত্র পাঠাবার কল্পনা তাঁর মাথায় আছে, কিন্তু পরে তাঁর কাছ থেকে যে চিঠি পাই, তাতে জানলাম যে আমার ভ্রম হয়েছিল; দেবেন্দ্রনাথের বহুদিন থেকেই এরূপ মানস ছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, কোন ছাত্রই পরে কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারে নাই।

মহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

“আমি কখনও তোমার পিতাকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে আমি অনেকগুলি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাঁর দেশের ধর্মোন্নতির জন্য তিনি যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান করেছেন তাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদিও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ধর্মবিশেষে ঘটেছিল, তবু তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

“বিদায়কালীন পূর্বকথা স্মরণ কবে তিনি বলেন. “Oh ! I have smoked many a Hookah with your grandfather in Paris.

কর্তাদাদামশায়ের স্মৃতি যতই অস্পষ্ট হোক না কেন, মেজকাকা ও ছোটকাকাকে (গির্জাবিন্দনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আমার বেশ মনে পড়ে। তাঁদের মুখশ্রী জীবন্তভাবে দেখছি, তাঁদের কথাবার্তা শুনছি, এখনো মনে করতে পারি। বাবামশায় অনেক সময় বাড়ী থাকতেন না। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাই তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় কোন না কোনখানে ভ্রমণে বেরোতেন। যখন গঙ্গায় বেড়াতে যেতেন তখন কোন কোন বার আমাদের সঙ্গে

নিতেন, নইলে বাড়ীতে রেখে যেতেন। মার কাছ আমরা বেশিক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আস্তা ছিল মেজ কাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম-স্থান। বলতে গেলে মেজ কাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয় ছিলেন; তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম, তাঁর সঙ্গে তাস খেলতুম, তাঁর কাছ থেকে বেছে বেছে নিয়ে বই পড়তুম—হাতেমতাই, লয়লা-মজনন, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, লাম্বস্ টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ, এই রকম কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল। আমাদের অন্তঃপূরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চ-শিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বাঙালা বেশ জানতেন, তাঁরাই আমাদের একপ্রকার শিক্ষায়ত্নী ছিলেন। কিন্তু অন্য সময় যাই হোক, ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতুম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়ে তিনদিনব্যাপী একরকম জ্বর হ'ত তা ম্যালেরিয়া বলতে পারি না, কেননা তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। জ্বর হ'লেই ডাক্তার স্মারি গদুস্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল—প্রথম দিন তেল (Castor Oil) ও তেলের চেয়েও বিস্বাদ জলের সাগুদ্বিভীয় দিন এলাচদানার মত সামান্য কিছু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত—সেই জ্বরের এই ক্রম ছিল। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্য বরাহনগর প্রভৃতি কাছাকাছি গঙ্গার ধারের জায়গা ও হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি দূরের কোন কোন স্থান স্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হ'ত। এইক্ষণে সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি বলে পরিভ্রাণ্য। তেমনি আবার কলকাতা এখন জলের কলে, নালানদার সৎকারে ও আর আর মুনিসিপাল বন্দোবস্ত পূর্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নাই; এমন কি, কলকাতাই এক্ষণে পল্লীবাসীদের বায়ু-পরিবর্তনের ও স্বাস্থ্য-অর্জনের প্রধান স্থান বলেও অতীতি হয় না। মৃত্যুর তালিকাপরীক্ষায় কলিকাতা ইউরোপেরও প্রধান প্রধান নগরীর সমকক্ষ দেখা যায় অনেক ইংরাজে বলেন দুই একমাস ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যের হিসাবে কলিকাতার সমতুল্য স্থান ভারতবর্ষে মেলা দৃষ্কর।

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটকাকা)

ছোটকাকার কাছে আমরা অনেক সময় যেতুম। তিনি গৌরবর্ণ তেজস্বী স্ত্রী পুত্রস্ব ছিলেন কিন্তু কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হ'ত, আমরা তাঁকে ভয় করি চলতুম। তাঁর বৈঠকখানায় নানা রকম লোভনীয় জিনিস ছড়ান থাকত। একবার মনে আছে ছোট ছোট ছুরা-ভরা মকমলের কাপড় মোড়া একরকম সর্পাকৃতি কাগজ চাপা তাঁর লেখবার টেবিলে ছিল, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। কাপড় ঢাকার ছিদ্র দিয়ে গুলিগুলো ঝরে পড়ছে, তাই এক মূঠা কুড়িয়ে নিয়েছিলুম। একটু পরে আমার তলব পড়ল, চোরামাল শৃঙ্খ ধরা-পাড়ি আর কি! তখন কি করি সীসার গুলি মূখে পুঁরে রেখে ছোটকাকার কাছে হাজির। তার ক্রিয়দংশ গলাধঃকরণ হয়েছিল কি না মনে নাই, আর গেলবার দরুণ পরে কোন অসুখ ভোগ করতে হয়েছিল কি না বলতে পারি না।

ছোটকাকা স্মারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন তা দেখে বোধ হয় তিনি সে দেশে বেশ আনন্দে ছিলেন, আর তাঁর প্রবাসকালে ইংলন্ড স্কটল্যান্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করে ব্যাড়াতেন। তাঁর রূপ লাভগোচর দরুণ তিনি সাহেব বিবিদের, বিশেষতঃ বিবিদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে স্বদেশে সহজে ফিরতে চাইতেন না। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবু তাঁকে দেশে ফেরবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পর লেখেন, তাতে তাঁকে এইরূপে লোভ দেখাচ্ছেন—

“আগামী মাসে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের আদর্শ উচ্চ শিক্ষা বিধান উদ্দেশ্যে কলিকাতায়

একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহাতে তুমি প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছামত বিদ্যা-শিক্ষা করিতে পারিবে। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বিদ্যার্থীগণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে উপাধি ও সম্মানের বিবিধ চিহ্ন সকল লাভ করিতে পারিবে। অতএব বাড়ী ফিরিলে তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিবার যে আপত্তি-তার গুরুত্ব অনুভব করিবে না।” (21st September 1846)

ছোটকাকা সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এইরূপ লিখেছেন—

“তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার এখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা নাই, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না। তুমি জ্ঞান, আমি সাধারণতঃ ইংরাজ জাতিকে ভালবাসি না, তাদের চাল-চলন দৃষ্টক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাদের সকল বিষয়ে বণিকবৃত্তি আমি মনের সহিত ঘৃণা করি, তথাপি একটা কি আছে যাহা এই সকল বিরুদ্ধভাবকে খণ্ডন করিয়া দিতেছে; ইংলন্ড ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে কোন মতেই আমার মন উঠিতেছে না।”

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হ’ল; যেদিন ফিরে এলেন আমার বেশ মনে পড়ে। ছেলেদের সে মহোৎসবের দিন, কেননা তিনি আসবার সময় তাদের জন্য নানা রকম খাওয়ানা নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হ’ল, আমি একটা কলের ময়ূর পেয়েছিলাম।

ছোটকাকার কাছে অনেকানেক লোক যাওয়া আসা করত—রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র—পূরাকালের সব খ্যাতনামা পুরুষ—এ-সবার মধ্যে তাঁর দুজন মুসলমান বন্ধু ছিল, বজলুল করীম ও বজলুল রহীম। তাঁদের নিয়ে অনেক আমোদ প্রমোদ হ’ত, কখনও বা ইংরাজি মোগলাই মিশ্রিত খানা দেওয়া হ’ত। হিন্দু মুসলমানে যেমন হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল এখন তা দূর্লভ-দর্শন।

বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরে ছোটকাকা দেখলেন আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি হাউস তখনো বেশ চলছে। ভিতরে ভিতরে তার যে অসার টলমল অবস্থা তা বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষে সেই হাউস ফেল হওয়াতে তিনি অশেষ ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। এই বিষয় পিতার জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

“এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়েছে। কিন্তু আমার আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়, এমন কি, ১০০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর একজনের আনন্দলাভ করিতেন—তিনি এমনি পবিত্রত্বের দৃষ্টান্ত ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয়ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল।” (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

তিনি উল্লিখিত নানা কারণে বিলাত থেকে ফিরে এসে অবধি একটা উচ্চ পদের সরকারী চাকরীর সন্ধানে ফিরছিলেন। যে সকল বড় বড় সাহেব তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি ৬ই মার্চ ১৮৫৪ সালে কন্টম্‌স কলেজের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে পদ তাঁকে অধিক দিন ভোগ

করতে হয় নাই। ১৮৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইস্তফা পত্র দিয়ে তাঁর কলেজের Young সাহেবকে লিখছেন—

“আজ আমার অবকাশের দিন সমাপ্ত হইল। দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি, গত তিন মাস ধরিয়া আমার বিষয় কর্মের ঝঞ্জাট মিটাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাতে যদিও অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হইতে পারি নাই। আরো তিন সপ্তাহকাল সময় না পাইলে এই সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া আমার কর্মে ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। আপনি আমার পুনঃ পুনঃ ছুটির আবেদন গ্রাহ্য করিয়া আমাকে অনুগ্রহীত করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন; পুনরায় ছুটির দরখাস্তে একদিনের জন্যও আপনাদিগকে বিরক্ত করা আমি নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করি, অতএব একান্ত বাধ্য হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট আমার এই চাকরীর ইস্তফা পত্র প্রেরণ করিতেছি। যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেন্টের এই চাকরী স্বীকার করি, তখন তাহার বেতনের প্রতি আমার ঔদাসীন্য করা ঠিক হয় না। আমার এই যে দরখাস্তা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিজের দোষে দৃষ্টি ছিল না কিন্তু এইক্ষণে আমার ষেরূপ বৈষয়িক অবস্থা এখন তাহাতে আমার যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেন্টের এই চাকরী স্বীকার করি, তখন তাহার বেতনের প্রতি নয় কিন্তু আমার স্বর্গগত ভ্রাতার ঋণভার আমার উপরে পড়িবার দরুন আমি একান্ত বিরত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেন্ট আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় সেই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন।”

Young সাহেব এই পত্রের উত্তরে লেখেন—“তুমি লিখিতেছ যে তিন সপ্তাহ সময় পাইলে তুমি তোমার পাণ্ডানাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইতে পার। তা যদি হয় তাহা হইলে আমার পরামর্শ এই যে একেবারে ইস্তফা না দিয়া তুমি আর এক মাসের অবকাশ প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত কর; উত্তর পাইলে যথাকর্তব্য স্থির করবে। আপাতত আমি তোমার এই ইস্তফা-পত্র গবর্ণমেন্টে না পাঠাইয়া আগামী কল্যা পর্যন্ত তোমাকে মনঃস্থির করিবার সময় দিতেছি।”

কলেজের সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ছোটকাকা কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কয়েক মাস পরেই দেখা যায় তাঁর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও স্বাস্থ্যখোলাভ মানসে তিনি বোম্বাই নাসিক ইন্দোর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হন।

কলিকাতা হতে বিদায় নিয়ে তিনি বিদেশ থেকে বন্দুবান্ধবদের যে সকল পত্র লিখিছিলেন তা হতে তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তটাই পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এই :—

বোম্বাই, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

তিনি সমুদ্র-পথ দিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই পেঁচিিয়া Elephanta ও সালসেটের গুহামন্দির ও অন্যান্য হিন্দুকীর্তি দর্শন করিয়া তলঘাট পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পিম্পলগমে উপনীত হন।

পিম্পলগাম, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

“মারওয়াড় প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতেছি—এই দেশ রাজপুতবীর ও বীরাক্ষণাগণের রণভূমি। কিন্তু হায়! সে সব কীর্তি কোথায়? যাইতে যাইতে মনে হইতেছে, “Tis Greece but living Greece no more গ্রীস বটে কিন্তু সে জীবন্ত ভাব তাহাতে নাই।

পরে তথা হইতে নাসিকে উত্তীর্ণ হইলাম, যাহা শিবাজীর অযোগ্য প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বাসস্থান। সঙ্গের কোন ভৃত্য নাই, বন্ধু নাই, মনে অশান্তি, শরীর অপটু

এই অবস্থায় ডাঙ্গা পথ দিয়া সহস্র ক্রোশ নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই।”

মালেগাম, ২১এ ডিসেম্বর

“চান্দোর দেখিলাম। অতুল্য পর্বত পরিবৃত্ত মনোজ্ঞ দুর্গম স্থান। যে সকল প্রদেশ মরাঠী ও পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের গোলাগুলি বর্ষণে ক্ষতিবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা অন্যতর, ইহার গায়ে সেই ক্ষতিচিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্তমান। রাজবাটী (রঙ্গমহল) দর্শন করিলাম। ইহার ভিতর প্রথম হোলকারের গদী রক্ষিত আছে, একটি সামান্য কাঠের গদী, সেই অশ্বারোহী বীরসেনার যোগ্য আসন বটে। চান্দোর ভাগ করিয়া দিনের আলো থাকিতে থাকিতে তলঘাটের শোভা সন্দর্শন করিলাম। চারিদিকে পাহাড়শ্রেণী—কি চমৎকার দৃশ্য! এই পর্বতমালার উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার নির্মাণকৌশল কি আর বর্ণন করিব—যে কারিগরের ইহা মনঃকল্পনা তাহাব প্রতিভা স্মরণ করিয়া দিতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির উপরে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঘাট হইতে নামিয়া উপত্যকা ভূমির দৃশ্যও অতি মনোহর—শ্যামল শস্যাঙ্কুরে যেন মখমল বিছাইয়া দিয়াছে। চতুষ্পাশ্বস্থ কুঞ্জবন আবার বিহঙ্গদলের মধুর গানে প্রতিধ্বনিত—এ সকল যারপর নাই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ভাই সে যাহাই হোক, বাড়ীর দিকে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে—মনে হইতেছে আমার সেই কোণের ঘরটি পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে সেরা।”

ইন্দোর, ২৮এ ডিসেম্বর

ইন্দোর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তলঘাটের শোভা সৌন্দর্য পূর্নবার উদ্ভাপন করিয়া লিখেছেন, “আমি Alps পর্বতে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার উপর দিয়া যে পথ কাটিয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসারোগ্য, তবুও এই গিরিপথের নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়। এই সকল পথ দিয়া ভ্রমণ করা অতিশয় শ্রান্তিকর। আমি বালাকাল হইতে ভ্রমণে অভ্যস্ত না হইলে এতটা কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম না”

তারি আর এক বন্ধুকে লিখিতেছেন—“আমি ইন্দোর সহর দেখিলাম। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই। রাস্তা ঘাট পাথরে বাঁধান, ভাল স্প্রিংয়ের গাড়ীর পক্ষে একেবারে অচল। ঘিঞ্জী সহর, বাজার যেমন আমাদের বড় বাজার,, সরু সরু গলী, ময়লা ধূলিময়, ঠিক আমাদেরই পুণ্য নগরীর অনুরূপ। রাজপ্রাসাদে গিয়া সমস্ত দেখিলাম; ছোট ছোট ঘর, সংকীর্ণ সিঁড়ি, ঠিক যেন একটি কয়েদখানা। দেখিবার মধ্যে সুবিখ্যাত অহল্যাবাইয়ের সমাধি মন্দির, প্রস্তর নির্মিত, নানা মূর্তি খোদিত। ইহার কারুকার্য বাস্তবিক সুন্দর ও প্রশংসনীয়। আমার ভ্রমণকালে আমার দেশীয় লোকেরা আমাকে যে আদর স্বত্ব করিয়াছে তাহা কখনও ভুলিব না।” (To Jadub Kissen Singh)

“ইন্দোর হইতে যখন তোমাকে পত্র লিখি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আগ্রায় আসিয়া আমি এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িব। আসল কথা হচ্ছে, এ সকল স্থানে ব্যাড়াইবার আরাম নাই, রাস্তা ঘাট দুর্গম, গাড়ীর ঝাঁকানি, আবহাওয়াও পীড়াদায়ক। এই শরীর লইয়া কোন রকমে যে আগ্রায় পৌঁছিয়াছি, হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এই আশ্চর্য! সাত দিন সর্দি কাশীতে শয্যাগত ছিলাম—গলার আওয়াজ বন্ধ, অস্ত্র করিতে হইল। এখন একটু ভাল হইয়াছি, কল্যাই কলিকাতার অভিমুখে রওয়ানা হইব। আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিয়াছি—আমার যে এতটা পথের কষ্ট—এত অর্থব্যয় এই তাজ দর্শনে তাহা সার্থক বোধ হইতেছে।”

আগ্রা ৫ই জানুয়ারী ১৮৫৭

১৮৫৮ সালে ছোটকাকার বিবাহ হয়। যখন তিনি ‘তলবী শ্যামা শিখরিদশনা’ যশোহরের একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেন তখন আমার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর—ঘটনাটি আমার

বেশ মনে পড়ে। বিবাহের পর তাঁহার বৈল্যতিক বন্ধুরা তাঁহাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন। Duke of Inverness লিখিতেছেন—“আমি ইংলণ্ডে তোমাকে অতি ভালক দেখিয়াছিলাম—ইহার মধ্যে তোমাকে বিবাহিত বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না। তুমি যে আমাদের দৃষ্টান্তে এক পত্নী লইয়াই সংসার করিবার মানস করিয়াছ, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়, কেননা বহু বিবাহে গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে, নিদান আমার তাই বিশ্বাস।”

বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন ও কি কারণে পদত্যাগ করলেন তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। কর্মে ইস্তফা দিয়েই দেশপ্রমণে বাহির হন—কিন্তু সেই ভ্রমণে তাঁর শরীর শোধরান দূরে থাকুক তিনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত রোগগ্রস্ত হইয়া বাড়ী ফিরে আসেন। এই যে তাঁকে রোগে ধরল তার হস্ত হতে তিনি আর মজু হতে পারলেন না। এই ক্ষীণ শীর্ণ রক্ত শরীরে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর উপর দিয়ে কত ডাক্তারী হাকিমী চিকিৎসা পরীক্ষিত হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একজন হাকিম মস্তাচর্ষ ঘটিত এক বহুমূল্য ঔষধ প্রস্তুত করে আনে ও তিনি সেই ঔষধ সেবন করেন কিন্তু তাঁহার মূল্যের অনুরূপ গুণের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। তাঁর সেই পীড়িত অবস্থায় আমি তাঁর সঙ্গে এঁড়েদহ বাগানে কিছু দিন বাস করেছিলাম, ক্রমে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি হতে লাগল। তাঁর শরীর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হইয়া এল, অবশেষে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ডাসিয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হলেন।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজকাকা)

মেজকাকা মহাশয় সুদূরসিক অমায়িক সৌখীন পুরুষ ছিলেন। যেন বিলাসিতা মূর্তি-মান। তাঁর সখের বাগানটি ফলে ফুলে সুশোভিত—আম্রের বাতাবী নেবু পীচ প্রভৃতি বাছা বাছা ফল, আর চম্পা চামেলী মালতী, বেল জুই রজনীগন্ধা গোলাপ বকুল কত রকম সুগন্ধ ফুলের গাছ। একটি ছোটজাতের জুই ফুলের ব্যাড়া ছিল, রোজ বিকেলবেলা সেই সব জুই ফুল আমরা রাশি রাশি কুড়িয়ে আনতুম। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমন বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক Experiments নিয়ে আমোদ করতেন ও আমাদের ডেকে আমোদ দিতেন। রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রদর্শনের মধ্যে যা মনে আছে তা হচ্ছে Galvanic Battery-র প্রয়োগ, তড়িত-প্রবাহযোগে আমার যে সর্বাপেক্ষ কম্পমান হত সে সহজে ভোলবার নয়। সে সব বৈজ্ঞানিক ভেল্কীবাজীতে আমাদের খুবই আমোদ হত। যেমন বিজ্ঞানে তেমন সাহিত্যক্ষেত্রেও মেজকাকার গতিবিধি ছিল। তিনি যে কতকগুলি সংগীত রচনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি শিখেছিলাম—সে এইঃ—

ললিত

দুখে গেল সুখনিশি প্রাণনাথ কৈ এল

সুখের শয়ন আজ নয়নজলে ভেসে গেল।

আকাশেরি শোভা তারা, আকাশে মিশাল তারা,

রমণীর দুখতারা সুখতারা প্রকাশিল।

মেজকাকা “বাবুবিলাস” নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল সেই ‘বাবু’ সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা

ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উর্গিক বৃদ্ধি দিলে যা কিছু দেখা। 'কামিনীকুমার' বলে তার একখানি পদ্যোপাখ্যানেরও সেকালে বেশ আদর ছিল।

মেজকাকার সব দিকেই চৌকোষ বৃদ্ধি ছিল। বিষয়কর্মে তাঁর যে দক্ষতা মহাবীর আত্মজীবনী থেকে তাঁর কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে দীননাথ ঘোষালের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি আমাদের ভারী প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁকে হাতের কাছে পেলে তাঁর কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প আদায় না করে কিছুতেই ছাড়তুম না। তিনিও কথক ঠাকুরের মত গল্পের ঘটায় আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। রামায়ণ ও মহাভারত ছেলেবেলায় এইরূপ মৃদুখোমৃদু শব্দেই আমাদের এক রকম শেখা হয়ে গিয়েছিল।

শিবজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)

ছেলেবেলায় বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মেশবার অধিকারী ছিলেন না। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি-আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়—কিন্তু হয়! এই দুই বিদ্যার কোনটিই তাঁর জীবনে স্থায়ীভাবে কার্যকরী হ'ল না। তাঁর বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছ্বাসে দুইটি কাব্যরত্ন প্রসূত হয়—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্নপ্রয়াগ; তা ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাব্য* ও অন্যান্য ছোটখাট কবিতা অনেক আছে যা সেই সময়কার ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি জানি কি কারণে, বাস্পবী চপলা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর নিকট হতে সহসা অস্তর্ধান হলেন। বড়দাদা কাব্যমতপান হতে বিরত হয়ে তত্ত্ব-বিদ্যানুশীলনের দরুণ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হলেন, চিত্রকলার চর্চাও ঐখানে থেমে গেল। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখীন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার কবে বসল—বাস্তুরচনা প্রণালী, আর রেখাঙ্কর বর্ণমালা। এতে এত সময় নষ্ট করা হল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শব্দ ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেবই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই। কাগজ, কাগজ রাখবার বাস্তু, পকেট বই—এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়—তাই লেখাপড়ার দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দাদা লেখবার জিনিস তথ্যের কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাগজের কারুকার্য, অন্যদিকে লিখনপ্রণালী সংস্কারেব প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাঙ্কর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্য ব্যবসায়ীর ঘাতে সময় সংক্ষেপ হয় তাই উদ্দেশ্য। এই দুই সখের বিদ্যায় তাঁর বিস্তর সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায়সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিষ্কল্ল বইলেন। তাব জন্যে চিন্তা শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাস্তবতত্ত্বের জন্য সমৃদ্ধ গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নুতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে। সেই নব গণিতশাস্ত্র বারংবার সংস্কারের পর এইক্ষেণে কোন এক আমেরিকান পণ্ডিতের হস্তে সমর্পিত হয়েছে। পরীক্ষার ফল কি হয় দেখবার জন্য বড়দাদা পথ চেয়ে আছেন। এই ত গেল বাস্তু-প্রকরণ। রেখাঙ্কর, সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতবকম বেষ্মপাতের কৌশল ছডাছডি না

* পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুরুলোক ইহার পরে।

যথা গুরুধারী ভারি ভারি, গৌপের সেবা করি সূত্রে বিচরে ॥

স্বাস্থ্যনারায়ণ বসুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কাব্য রচিত হয়।

দেখলে তার মর্ষাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এই রেখাঙ্কর পম্পতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে—এ বিষয় কেহ জানতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে কৌতুহল চরিতার্থ করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর কোন ছাত্র রেখাঙ্কর লেখায় এ পর্যন্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। এখনকার সময়ে কোন সূনিপুণ রেখাঙ্কর-লেখক পেলে আমরা অনেকে ভাগ্য মনে করি।

আমি বাল্যকালে রেখাঙ্কর লিখনপম্পতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সঙ্কেত লিপিতে টুকে নিয়ে অনেকানেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছি। আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে পিতৃদেব যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বলবার সময় আমি অমনি নোট করে নিতুম, পরে অবসর ঘাতে বিস্তার পূর্বক লিখে দিলে তিনি সংশোধন করে ছাপাতে দিতেন, পর সপ্তাহে সেই ছাপা কাগজগুলি উপাসকমন্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হত—সেইগুলি ‘ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান’ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন; নূতন নূতন বক্তৃতা, নূতন ব্রহ্মসংগীত—ব্রাহ্মসমাজে যেন নবজীবন সঞ্চার করেছে। ধর্ম-শিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে ও আমার পিতা বাগলায় উপদেশ দিতেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি পূর্বোক্ত প্রণালীতেই লিপিবদ্ধ ও পরে ‘ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস’ নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমি ইংলন্ড যাবার পর পিতৃদেবের বক্তৃতা তুলে নেবার কাজে হেমেন্দ্রনাথ আমার স্থান অধিকার করেন।

বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে কোন কোন সময় গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসংগীতের কতকগুলি আমাদের যত্নরচনা, কতক বা আমাদের নিজস্ব রচনা।

তা ছাড়া বড়দাদা অনেকগুলি ভাল ভাল হেম্মালি রচনা করেছিলেন। তার অনেক জুলে গিয়েছি; দৃ একটি যা মনে আছে তা এই :—

- ১। বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরস্বয়ে সবে যায় বাঁধা
শেষ দৃ অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা;
সবটাতে দৃই পারে—বেঁধা আর বাঁধা;
মুখে কি বলিতে পাবে পশ্চিমের ধাঁধা।—(রসিক)

- ২। বল দেখি দৃটি ফল,—
তার ভিতরে পাওয়া যায়
ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সকল।—(বেল-কুল)

- ৩। ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানায় আপত্তি,
সবতাতে ঘাড়নাড়ে বিষম বিপত্তি।
দৃ অক্ষরে ফল এ কি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে চাই।—(নোনা)

বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের অনেক ঘরাণ্ড কথা তাঁর কবিতার মধ্যে স্থান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে আমাদের ভাইদেব এইরূপ বর্ণনা করেছেন :—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।

নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে করি।

পশ্চিমত মহাশয়।

যখন উপর হতে প্রচণ্ড পশ্চিমত
ডাকিতে লাগিল হ'য়ে বিষম কুপিত,
হাসিখুঁসি ঘুরে গেল তখন সবার
দল সাথে স্নান মূখে চলেন সম্ভার।
পশ্চিমত মূহূর্ত পবে আইল সেখানে।
চসমা বাহিব ক'বে পরে সাবধানে॥
খসবার ভয়ে তাহা পরিণ কসিয়া,
তার পরে যত করে লইল বসিয়া।
শিষ্যদের আবশ্চিন্দল পরে শিক্ষা দিতে;
ভূত পালাইয়া যায় কথার ভঙ্গিতে।
“এস দেখি তোমাদের দেখি একবার।
তোমাদের সঙ্গে হ'ল পেরে ওঠা ভার।
অজ্ঞ কাল তোমাদের অনিয়ম ভারি,
বাবুকে না বলে আর থাকিতে না পারি॥”
“ভারি নাকি অনিয়ম” ছাত্র এক কয়।
পশ্চিমত হাসিয়া বলে “অনিয়ম নয়?
লজ্জা করে না তোমার বলিতে ওকথা?
পড়াশুনা ত্যাগ করি ছিলে সব কোথা?
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে ব্যালা?
ছি ছি ছি বিদ্যার প্রতি এত অবহেলা।
যাও প'ড়ে কাজ নাই, কর গিয়ে খ্যালা।”
এই বলে ঘাড় ধ'রে দিল এক ঠালা॥
কৈলাস মৃদুস্বরে ছিল ব'সে এক কোণে,
মৃচকি মৃচকি হাসি সব কথা শোনে।
একজন চুপে কহে “হাসিছ যে বড়?”
কৈলাস ইঙ্গিতে কহে “কর্তা খাপা বড়!”

তেতালায় দুপুর রাত্রি।

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে শ্রবপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুদুপানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চাব।
গাছপালা কোপে ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় পড়ি আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাই॥
কীটপতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,

পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির, শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই করে যা আছে জীবের লক্ষণ ॥

বরাহনগর উদ্যানে।

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
যা দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥
ম্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেলা
হুম্মা হুতে সুদরমা উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরুণরতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
সনমুখ দিয়া সিম্ধু পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দশা হায় হায়
কেবা তার দুঃস্থ দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিস্তম্ভ রক্ষাশু সমুদয়,
ব্যোপ ব্যাপে অশ্রুকার, নভস্থল পরিষ্কার
জতাপাতা হিমবিন্দুময় ॥
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্তলেখা,
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥
শাখা পত্র ঢুলাইয়া, জলপঙ্কজ ফুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে মনে মনে ম্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান ॥

শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতন, শান্ত সুশোভন,
সুভদ্র হরিত ক্ষেত্র শ্যামাকান্ত নিভৃত কানন।
বিমল শোভায়, সরোবর ভায়,
নভসীর বনশ্রীর স্বচ্ছ দরপণ ॥

আমি যে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদা তার কাছে পড়তেন না,—
তঁার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ' নাটক রচয়িতা। তাঁর
শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃতকাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত পদ্যে একটি
কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা। তার কয়েকটি শ্লোক আমার বা মনে
আছে তা এই:—

কলিকাতা।

ইংরাজ রাজরাজ্যে যৎ ত্রিলোকীতলবিপ্রদত্তং
রাজধানীং সদ্বিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্তি তৎ।
পন্নঃ পদ্রপ্রবাহিন্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পদুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা।
রথ্যা রম্যাঃ সদৃগম্যাশ্চ যত্র ভাস্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাতগলম্বারি-নিবারিতরজ্জশ্চয়া
শতঘ্রীশতযুক্তেন দূর্গেশ দূর্গহরিভিঃ
উদ্যৎ বিদ্যৎপ্রভাজ্জাল সৈন্যশস্ত্রাশ্চশোভিতা।

ত্রিলোক বিপ্রদত্ত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
সদ্বিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে।
পুণ্যকায় পুণ্যতেয়া জাহ্নবী বহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনীসম ভায়।
সদৃশ্য সদৃশ্য যথা শতপথ ব্যাপি রয়,
চর্মপাত্র গলম্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।
শত শত তোপযুক্ত দূর্গেই দূর্গ রক্ষিত,
উদ্যৎ বিদ্যৎপ্রভাসম সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসম্বিত ॥

বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি
নমুনা দিচ্ছিঃ—

প্রভাত বর্ণনা।

বৃক্ষগণ হেলিত সদৃশীতল সমীরণে,
পদ্প যত প্রস্ফুটিত পদ্পময় কাননে।
মস্ত মধুপায়িদল আইল ফরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

টস্কাদেবী।

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথের নাস্তি,
পারে শিক্রী মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি।
টস্কাদেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবৃদ্ধি কিছই কিছ না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।

মন্দাকান্তা

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা।

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গোড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছ, হয় না,
বিনা হ্যাট্টা কোট্টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা দ্রাতা নব শিশু অনাথা হুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কুস্তী বড় পরি,
সিগারে উঙ্গারে মদুর মদুর ধুমলহরী
সদৃশ স্বপ্নে আশ্রয় মল্লুকপতি মানে হরি হরি।

বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
 বিবাদে প্রাসাদে দৃষ্টিজন রহে জীবন ধরি।
 ফিমেল ফিমেল অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
 কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।৩
 ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে,
 গৃহে ঢোকে রোশে উলগতন দেখে বড় চটে,
 মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
 দুটা লাখে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।৪
 শিখরিণী

(রেখাকর বর্ণমালা হইতে)

বসন্ত

মধু ঝড়ু এল ধরণী মাঝে।
 হেলে দোলে লতা মোহন সাজে ॥
 অমৃত বরিষে মৃদু সমীর
 পরাণ লভয়ে মৃত শরীর ॥
 ঝড়ু ঝড়ু ঝড়ু বহিছে বায় ॥
 ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায় ॥
 মধু মালতীর ফুটিছে কলি—
 চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
 গদন গদনাগিছে নব রসিক।
 পহরে পহরে কুহরে পিক ॥
 ফুলের কে পায় কুল কিনারা
 অগগন যেন গগন তারা ॥
 তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
 শতেক ফুলের শতেক চঙ
 কেহ বা দোলে কেহ বা কোলে
 কেহ বা গন্ধে মাতায়ে তোলে ॥
 কদম ছড়ায় কনক রেণু
 রাখাল ষথায় বাজায় বেণু ॥
 রাশি রাশি ফুলে ভরিয়া সাজি।
 ঘরে ফিরি চল আর না আজি ॥

কৃষ্ণের বিরহে।

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে
 শঙ্কমুখ রাধিকার দৃষ্কে বদক ফাটে ॥
 আনন্দের বৃন্দাবন আজি অশ্রুকার,
 গুঞ্জরে না ভৃগুকুল কুঞ্জবনে আর ॥
 কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি,
 উপদ্রু হইয়া ডিগা পক্ষে আছে পড়ি ॥

২৫১৭৭

কালিদাসের কন্ডে বসে কাঁদে গোপনারী
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে,
সিঁদ্বি কাঠি ধরে গেছে বিম্বাইয়া বক্ষে ॥
এত বলি হাহ্ন করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা করে পোছে ॥

মুখ-হস্তের অতিয়তা।

মুখে হাতে ভেদ নাই সাক্ষী তার তিন।
ভূজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ ॥
ভূজঙ্গের মুখখানি (বরজিয়া দাঁত)
কি সুন্দর মনোহর সুকোমল হাত ॥
সাপড়ের তুমি যবে বাজে ঘুরি ঘুরি।
কেমন ঘুরায় হাত গোখুরা গোখুরী ॥
হাতের কায়দা দেখি সবে বলে “বা জ্বী!”
শেখ্যান্ড করিতে কিন্তু কেহ নহে রাজ্বী ॥
বিহঙ্গের চণ্ডহাত কম নহে বড়।
ছলা-কলা না জানুক কাজে খুব দড় ॥
কেউটে গোখুরা আদি মহা মহা ফলী,
সারসের চণ্ডহাতে ধোঁড়া যায় বনি।
হস্তীর হস্তটি এ যে মুখেরই লেজুড়,
জ্ঞানে না অবোধ লোকে তাই বলে শড় ॥
খগে নাগে সাক্ষী মানি লেখে তাই শাস্ত্রে—
ভেদ নাই মুখে হাতে, দশনে নথাস্ত্রে ॥

মনঃশাস্ত্র।

জাতিতে যদিও বনের টিয়ে
রতন মানিক মনঃশাস্ত্রি এ ॥
ছার কোয়েলিয়া ছার পাঁপিয়া।
মনঃশাস্ত্রি মোর লাখ রূপিয়া ॥
কেবা জ্ঞানে কুহু কে জ্ঞানে পিউ।
গাহে রসভরে চাহে যা জিউ ॥
কাণে যাহা শ্রুনে দৃ একবার,
মন থেকে তা নড়ে না আর ॥

পেন্সিল-প্রকরণ।

লেখনীর গুজিয়া কাণে পেন্সিল ধর।
এখন লেখ যা বলি—লেখ “হর হর” ॥
পেন্সিল করিতে হয় অত কি ছুঁচালো?
অতিসূক্ষ্ম কোন কাজ উত্তরে না ভাল ॥
সহজ মধ্যম সুরে বাঁধিবে সেতার।

সন্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার ॥
 বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জ্বিল।
 না সরু না মোটা করি কাটিবে পেন্সিল্ ॥
 রেখাঙ্কর হবে তবে আঙ্গার অধীন।
 চাপ দিলে মোটা হবে—চিল দিলে ক্ষীণ ॥
 পেন্সিল্ খণ্ড তোমার মাসেক দুমাস—
 নলপত করিয়া চলিবে যেন হাঁস ॥
 কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
 অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা ॥
 ঐ জন্তুটির মত মাস চারি খাটি
 নতুন পেন্সিল্ দণ্ড লবে যবে কাটি'
 তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
 ছুটিবে—পরায় ভয়ে যেমতি হরিণ ॥

সাধন পদ্ধতি।

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে;
 শিষ্য জুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কাপে ॥
 শিষ্যটিরে কাছে ডাকি সম্ভাষিয়া মিষ্ট
 সারস্বত যোগাসনে হুয়ে উপবিষ্ট—
 লেখনী করিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
 শিষ্যটি হইবে আর উত্তর সাধক ॥
 আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র।
 তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছ, ছত্র ॥
 ছিটা ফোটা দিবে না রেখাই যবে টানি।
 সংগ গুণে তারি যাবে অঙ্গহীন বাণী ॥
 রেখার পোকমাকড় কুমি বিটকাল,
 উচ্ছিড়ি ফড়িং পিপড়া পালে পাল,
 ক্রান্ত হোক রোসো আগে করি কিলিবিলা;
 ধীরে সুস্থে কোরো শেষে ফুটকুনি বিলা।
 এক মেটে করিয়া করিবে কাজ ফতে।
 দো মেটে করিবে শেষে অবকাশ-মতে ॥

সিদ্ধিলাভ।

প্রথমে প্রথম খণ্ড পাকাইবে হাত।
 দ্বিতীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাত ॥
 মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার।
 হস্তকে করিবে তার তুরদক সোমার ॥
 হইবে লেখনী ঘোড়-দোউড়ের ঘোড়া।
 আগে কিস্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া ॥

বড়দাদা গদ্যোক্ত প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন কিস্তু দৃষ্টের বিষয় এই যে, সে সমস্ত

একস্থানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাঁর গদ্য-লেখা সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সামাজিক। তাঁর সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ ‘তত্ত্ব-বিদ্যা’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে অনেককালের কথা, গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে ‘গীতাপাঠ’ নামক যে প্রবন্ধগুলি ‘প্রবাসী’ মাসিকপত্রিকায় আমরা ঔৎসুক্যসহকারে পাঠ করিছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব মৌলিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অবলম্ব্যে যখন বেরবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। ‘তত্ত্ব-বিদ্যা’ হ’তে আরম্ভ করে এই ‘গীতাপাঠ’ যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার লিখিত বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, যেমন “সারসত্তোর আলোচনা”, “বিদ্যা এবং জ্ঞান”, “হারামণির অন্তর্বেষণ”, “ঐশ্বর্যতত্ত্ববিদ্যা”, “বিবর্তিবাদ”, (evolution), “বৌদ্ধধর্মের ষাটপ্রতিঘাত” ইত্যাদি—এদের কতক ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কতক বা সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। উহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ—হয়ত কোন একটা বিষয়ের অবতারণা করে তার আদ্যোপান্ত লিখে শেষ করা হয়নি, কোনটা অস্বাভাবিক, কোনটা বিকলঙ্গ, ভ্রান্তবোধায় অর্মান পড়ে আছে—এ সকল ভাল করে দেখে শুনে গড়েপটে নেওয়া আবশ্যিক। দার্শনিক ছাড়া সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন সোনার কাটি রূপোর কাটি, আর্থামি ও সাহেবিয়ানা, একটি প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। বড়দার এই লেখাগুলি উদ্ধার-হয় আমাব অনেকদিনকার সাধ—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই রইল—তা পূর্ণ হবার কোন পন্থা দেখিছিনে। আসল কথা হচ্ছে—এ ভার নেয় কে? দুটি লোক আমার মনে হচ্ছে—তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ সুশীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ, এঁরাই এই ভারগ্রহণের অধিকারী এবং উপযুক্ত-পাত্র। উভয়েই সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যজগতে স্বনামখ্যাত,—উভয়েরই সময় আছে, সামর্থ্য আছে, এই কার্যে যা যা চাই সকলি আছে—এঁরা বড়দাদার লেখাগুলির সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ। এ অনুরোধ কি ইহারা রক্ষা করবেন না? সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বহুমূল্য রত্নগুলি প্রলয়সাগরে ডুবিতে দেওয়া কি লজ্জার কথা নহে?

পদাই বল, গদাই বল, বড়দাদার লেখার যে একটি মাদুর্য, প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিষ্কলম্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুবুহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জ্বলের ন্যায় প্রাজ্ঞলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁর লেখাসকল যে পর্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা বার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককে ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হ’তেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ডাকগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটি পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ্য করেছিল), আমরা সকলে তাকে ‘কাল’ দাই’ বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর ‘স্বনপ্রমাণ’ থেকে একটি কবিতা শোনাচ্ছিলেন; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আব থাকতে পারলে না।

বড়দাদার কাছ থেকে কার্যগতিকে অনেক দিন পৃথক হয়ে পড়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাব জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস, শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো সে দিনেব সে সব কথা কি কখন ভোলা যায়? ‘তে’ হি নো দিবসাগতাঃ—সত্য কিন্তু মনোবাক্যে সে সব দিন চিরদিনই

জ্বলন্ত রয়েছে। আমাদের সকালের দু'একটি ঘটনা মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটি ভূতা ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্ব্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্ছে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বজাটাও ঠিক হ'ল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হাতে তেমনি পদ্রস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালি গালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন দ্রুষ্কেপ না করে মনের সুখে কাজ কবে যাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোক বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার থেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বোচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেগে গেলে হীকাহীকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে কবে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জ্ঞানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পাঠ চাপড়ে তাকে সান্দ্রনা করলেন। বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা, যেমন 'সাধু' তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—চড়াই পাখী চাউল খাকী আয়না ঠোকরাণী' এই আদরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জ্বলম্ব করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড় কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হৃদয়স্থল বেধে গেল! সে কোথায় খোঁজ খোঁজ! খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হ'ল, তাবা দ্যাখে সে কাক কোন একটা দূরেব গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

বড়দাদার যা নিত্য নিয়মিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—তা চিরকালই সমান চলেছে—শীতে গ্রীষ্মে রোগে আরোগে তার আর বিরাম নাই। তাঁর জ্বর কি কোন অসুখ হ'লে সেই স্নান বন্ধ করবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা অনুন্নয় বিনয় করা যায় কিন্তু ভোরে উঠেই সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। ঠাণ্ডার বদলে গরম জল কোন কালেই তাঁর মনোনীত হয় না। বড়দাদাকে ব্যামোর সময় ঔষধ পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখায় মশন হয়ে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার নিয়ম ভুলে যান—এই বয়সে তাঁর শরীরে আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না। এখন শরীর সেবায বিশেষরূপে মনোবোগ দেবার সময় এসে পড়েছে। তিনি নিজেই তা বৃবতে পেরেছেন:—এক একবার বলেও থাকেন—আর না' কিন্তু কাজে এ কথার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা)

ও-বাড়ীর মেজদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর কোন প্রভেদ ছিল না, আমরা তাঁকে আমাদের সহোদর ভাইয়ের মতই দেখতুম। তিনি ছিলেন মেজদাদা।

আমি মেজদাদা বা মেজবাবু, আর বড়দাদা, এই তিন জনে সর্বদাই আমরা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা করতুম—আমরা এই trinity তিনে এক একে তিন। মেজদাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলাম। আমরা দু'টিতে তেতালার ছাতে বসে গান করতুম, গল্প করতুম, কোজাগর পূর্ণিমায় হেসে খেলে বাগানে বেড়িয়ে রাত কাটাতুম। মেজদাদা গান বাজনা বড় ভালবাসতেন—তিনি নিজেও অনেক সংগীত রচনা করেছেন—ব্রহ্মসংগীত, জাতীয় সংগীত, ইত্যাদি। “দীননাথ প্রেমসুধা দেহ হুদে চালিয়ে” এ তাঁর গান। তিনি সব দিকে চৌকষ ছিলেন—সামাজিকতা, লোকশৌকিকতা, বড়দাদার যে দিকটা অভাব ছিল, তিনি সেই সকল গুণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিলেন।

আমি বোম্বায়ে কার্যরম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক ‘স্বদেশী’ মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃন্দ সাধন হ’ল। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসেব প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতাাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ’ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সংগীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সংগীতের জন্মদাতা—

মিল্ল সব ভারত সন্তান

একতান মনপ্রাণ,

গাও ভারতেরি ধ্বনীগান।

এদিকে সংগীতাদি কল্যাণদায়ক যেমন তাঁর পারদর্শিতা ছিল, সে সময়কার সাহিত্যিকদের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর প্রণীত “বিক্রমোবশী” নাটকের একটি সূন্দর অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁর প্রাতুষ্পদ গগনেন্দ্রনাথ এইটি উল্লেখ করে সাহিত্য সমাজে প্রচার করেছেন দেখে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল—আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুঁথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন—মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে;—আক্ষেপের বিষয় যে এ সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, কোনই সম্ভান পাওয়া যায় না—কোন খানে লেশ, নাই অবশেষ, সেদিনের কোন চিহ্ন।

নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ইংলন্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলিকাতায় এসে দেখি তাঁদের বাড়ীতে ‘নবনাটক’ অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রংগমঞ্চে শবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরঞ্জব নামে অঙ্কিত—

ধ্বংসতির ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-

বে’তালভট্ট ঘটকপ’র কালিদাসাঃ

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়ঃ

রত্নানি বৈবরচিন’ব বিক্রমস্য।

নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, বহুবিবাহপ্রণায় পাবিবাহিক দুঃখজ্বালা অশান্তি প্রকটন সূত্রে লোকশিক্ষা দেওয়া ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীতে ছেলেবা আত্মীয় স্বজন বহু সেই নাটকের পাঠপাত্রী সেজেছিলেন। মেঘের পাট’ অবিশ্যি পূর্বুষেব নিতে হয়েছিল। আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগাম হ’তে মেজদাদাকে লিখছেন; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক ১৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭)।

“তোমাদের নাট্যশালার স্বার উন্মোচিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য স্ফারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিশ্ব রসের আশ্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্ত লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিভেছি, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।”

আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সাজেছিলেন—নাট্য অভিনয়ে সেই তার প্রথম উদ্যম; পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন—তাকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিঁধ হ’ত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

এই নবনাটক আর মানমসী নামক একটি গীতিনাট্য সর্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ আর ‘রাজা ও রাণী’ এই দুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পদ্রুখ সকলে মিলে গড়ে তোলা গিয়েছিল।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর সকলে আমরা একান্তপরিবারভুক্ত ছিলাম। ক্রমে আমরা পৃথক হয়ে পড়লাম। মেজদাদা ও আমাদের মধ্যে যখন বিভাগ হ’ল আমার মনে ভারি বেদনা লেগেছিল। আমরা তেতালার বাড়ীতে ছিলাম—দোতালার এসে পড়লাম। এই দোতালার বাড়ীই আমাদের আদিম বসবাস, তেতালার বাড়ী নির্মাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুকুরটা বন্ধ সাধারণ রইল। একদিন দেখি হাইকোর্টের একজন জজ এসে আমাদের বাড়ী তদন্ত তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জন্যে। এই ছাড়াছাড়ি আমি অনেককাল ভুলতে পারিনি। ইংলন্ড থেকে অনেক সময় দুঃখ করে মেজদাদাকে এই ধরণে পত্র লিখতুম। বাল্যকাল হ’তে আমরা একত্রে ছিলাম—তুমি ছিলে মেজদাদা আর এখনো পর্বন্ত আমার ছোটরা আমাকে মেজদাদা বলে ডাকে। আমাদের এক সঙ্গে ওঠাবসা, খালাধুলা, আমোদ প্রমোদ, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ মতান্তর উপস্থিত হবে। কত কুলোকে মল্লগায় এক এক সময় এইরূপ সুখের সংসার ছারখার হয়ে যায়। বাহারা পরিবারের ভিতরে এইরূপ অশান্তির বীজ ছড়াইবার চেষ্টা করে তাহাদের মত দুঃস্বপ্নিত আর কে আছে? এক একবার দময়ন্তীর মত অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হয়, যখন নলরাজা তাঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—

অপাপচেতসং পাপো য এবং কৃতবান্ নলং

তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবন্তসুখজীবিকাং।

“অপাপচিত্ত নলকে যে পাপাস্রা এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিল, সে তদধিক দুঃখতর জীবিকা পাইয়া জীবনধারণ করুক।”

বিলেত থেকে ফিরে এসে বোম্বাই যাবার পর মেজদাদার সঙ্গে বড় আমার দেখা শুনো হ’ত না কিন্তু আমাদের পত্র-ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। ইংলন্ড বোম্বাই আমি যেখানেই থাকি তাঁকে চিঠি লিখতুম আর তাঁর কাছ থেকেও স্নেহপূর্ণ পত্র পেতুম। ছুটিতে কলকাতায় এলে অবিশ্যি আমাদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হ’ত। একবার আমি বাজরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় বৎসরের ব্যামোর ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। সেই বাতে অনেক দিন শয্যাগত ছিলাম, তখন মেজদাদা সর্বদাই আমাকে দেখতে আসতেন, আদর যত্ন করতেন, গলপস্বপ্নে আমার মনোরঞ্জন করতেন। আমার একটি আন্ডারের চৌকি ছিল তার চারিদিকে

বন্ধুবান্ধবেরা ঘিরে বসতেন, ঠিক যেন একটি দরবার বসেছে। আমার মনে হ'ত ব্যামোর ভিতরেও যদি এত আরাম পাওয়া যায়, তাহলে ব্যামোয় পড়াতে তাপসিত কি?

O Pain ! where is thy sting ?

মেজদাদার অস্পষ্ট বয়সেই মৃত্যু হয়। যে তাঁকে ভাল করে জানত সেই তাঁর গুণে মৃদু হ'ত, তাঁর কেমন একটি আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। অনেকে তাঁর উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপিত করেছিলেন। ছোটকাকার তাঁর উপর কিরূপ স্নেহ মমতা ছিল তা আমরা তাঁর পরে দেখতে পাই। মেজদাদার বিদ্যাশিক্ষার পাছে কিছুমাত্র অবসর হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি একপাশে বলেছেন—“মানুষের মন রত্নখনি বিশেষ। সেই রত্নটিকে নিয়ে মেজে ঘসে উজ্জ্বল করলে তবে তা মূল্যবান হয়—মনের উপর শিক্ষার কার্যও ঐরূপ।” ভবিষ্যতে গণেন্দ্রনাথ আমাদের গৃহস্বামী হলে পরিবারের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকবেন এই আশায় তিনি আশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু হয়! তাঁর সে আশা পূর্ণ হ'ল না। যারা ভাল লোক দেবতার শীলই তাঁদের আপনাদের কাছে ডেকে নিয়ে যান, তাই তাঁর পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তিনিও অকস্মাৎ আমাদের সকলকে ছেড়ে পূর্ণলোকে চলে গেলেন।

Requiescat in pace !

তাঁর আত্মার শান্তি হোক!

নবগোপাল মিত্র

উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্মী হ'লেন; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল। তিনি সর্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারি চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus. তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম। 'Indian Mirror' পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হ'তে হস্তান্তর হ'ল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মবিবাহ' আইন যখন বিধিবশ্ব হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যারা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করার জন্য সিমুলার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু তাদের মুখপাত্র ছিলেন। আদি সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে দাঁড়াল এই যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের বাইরে না গেলে আর রেজিস্ট্রী বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা এই আইনের শরণাপন্ন হ'তে চান তাঁরা আপনাদের অহিন্দু বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে বাধ্য। এই আবর্তের মধ্যে পড়ে এখন আমরাই আত'নাদ ছাড়ছি—এই অহিন্দু Declaration উঠিয়ে দিবে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হবোঁ। কিন্তু এখন আমাদের হাজ্রাব চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না।

বোম্বাই থেকে আমি একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে বোম্বাই প্রদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মসম্প্রদায়, ভীষণস্থান—ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলাম—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় আমি কথায় কথায় বলেছিলাম বাঙালীদের যেমন প্রধান আহাৰ ভাত ওদেশে সরুপ নয়, ভাতের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ রুটিই প্রচলিত, কোথাও বজরী (বজরা), কোথাও জোয়ারী বা গমের হাত-গড়া রুটি। ভাতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্য ওদেশে

তেমনি রুটি। এই ভাতখোর ও রুটিখোর, দুই জাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন জাতি? এই প্রশ্ন উঠল। আমি বলেছিলাম ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় বাঙালী দুর্বল। আবহাওয়ার গুণাগুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হ'তে পারে, আহারের তারতম্যও আর আর কারণের মধ্যে ধরা অসঙ্গত হয় না। যব ও গমের মত ভাত পুষ্টিগুণে খাদ্য নয়, সুতরাং ভাতখোর বাঙালী যে দুর্বল তাতে আর বিচির কি? এই কথা শুনে নবগোপাল বাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে আপনার অমত প্রকাশ করে বলেন, “তা কখনই হ'তে পারে না। তোমরা যাই বল, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব।” এ তর্কের আর কোন উত্তর নেই। “সভা হল নিম্নজঙ্গল।”

তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না, শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে এভাবে যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে শাস্বতকাল স্থায়ী হয়, তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।

পূর্বে বলেছি যে, পূর্বে আমরা দুই কাকার সঙ্গে একান্তবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলাম। তখন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথেষ্ট সম্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ছেলেরা আমাদের বাড়ীর দালানে গুরুদশায়ের কাছে ক খ শিখতে আসত। গুরুদশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় হাতে খড়ি। সেই উগ্রচন্ডা গুরুদশায় বেহুস্তে শেখাতে বসেছেন, কখনো বা সে বেত তাঁর কোন ছাত্রপুষ্ঠে চালিত হচ্ছে—সে চিত্র মন থেকে কখনো যাবে না। আমরা গুরুদশায়কে কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মনে করতুম—ঠিক যেন Goldsmith-এর সেই গ্রাম্য গুরুদশায়—

And still they gazed and still
The wonder grew
That one small head could
Carry all he knew.

অবাক হইয়া দেখে, না জানি কি ক'রে
অত বিদ্যা ওই ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে।

আমরা গুরুদশায়ের কাছে ক খ বানান নামতা, কড়াঙ্কে, ষটকে—এই সব শিখতুম, তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস করতুম। যত শুচা ফালা, জিনিস মোড়বার মত ব্রাউন কাগজ আনা হত,—শ্রীরামপুরের সাদা কাগজ যেদিন আসত খুব ভাগ্য মনে করতুম। এই কাগজের উপর বাঙলা কলম দিয়ে আঁচড়কাটা—সেই আমাদের পয়লেখা। যতদূর মনে আছে পত্রের দুই পাঠ ছিল—সেবক শ্রী' আর 'আজ্ঞাকারী শ্রী'—দিনের পর দিন বদলে বদলে এই দুই পাঠ লেখা হচ্ছে। এখন দেখতে পাই বাঙলা চিঠিতে পাঠ লেখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন, স্নেহের সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ, ছোট বড় আত্মীয় স্বজন বন্ধু, অপরিচিত দূরের লোক, formal informal!—বাংলায় কাকে কি পাঠ, ও কোন সুগম কি পাঠ লিখতে হয় সে এক বিবম সমস্যা। গুরুদশায় এই বিষয় আমাদের মনোযোগ দিয়ে শেখালে ভবিষ্যতে অনেক কাজ দেখত। তবে ওরূপ মূর্খ পণ্ডিতের কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অনায়াস, আমরা ঐ গুরুদশায়ের কাছে লেখাপড়া বেশী দূর না এগিয়ে থাকি—নিদেন গোড়া পত্তন সেই।

উপনয়ন

নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, ঘটনাটি বেশ মনে পড়ে। কণ্ঠভেদ শিরোমুদ্রণ

এগুলি যদিও ভাল লাগেনি কিন্তু নাপিতের উপর বিদ্রোহাচরণ করেছিলুম বলে মনে হয় না। হবিষ্যাম ভোজনে বেশ তৃপ্ত লাভ করতুম, ভালই হোক মন্দই হোক রোজকার ডাল-ভাতের চেয়ে রুচিকর। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করে ‘ভবতি ভিক্ষাং দোহি’ বলে উপবীতধারী ব্রহ্মচারী সাজা, তিন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা—পাছে শূদ্রের মদ্য দেখে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়, এই চিরন্তন হিন্দুপ্রথা আমাদের পছন্দ হত না। কারাবাস হতে মৃত্যুর পর ন্যাড়া মাথায় বাড়ীময় ঘরে বেড়ানো আর সকলের কাছ থেকে ব্রহ্মচারী বলে অভিবাদন পাওয়া—মনে মনে কত গর্ব হচ্ছে—যেন আমি কি একটা ধনুর্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্মচর্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা করে আমাদের পুরুষতাকুর কোন উপদেশ দেন নাই। কেহ আমাদের বলে নাই, ‘আচার্য্যধীনো বেদমধীশ্ব’—আচার্য্যধীন হইয়া বেদাধ্যয়ন কর,—অথবা ‘অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে’—আমার নিকট গায়ত্রী শিক্ষা কর। ‘মা দিবা স্বাস্পসীঃ’—দিবানিদ্রা যেয়ো না বলে আমাদের কেহ সাবধান করে দেননি, আর আমরা ও আরামের জিনিসটা অনেকদিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলুম। তিন দিন ঘরে বন্ধ থাকা যে শ্বাদশ বৎসর গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করা—তা আমরা বুঝি নাই—ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য (বৈদিককালে যেমন আর্য আর দস্যুর মধ্যে) সেই ভেদবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা যদি ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য হয়, সেটা সিম্ব হয়েছিল বলতে হবে। কতকগুলি সম্ম্যার মন্ত্র আবৃত্তি করতে শিখেছিলুম তার মানে না বুঝে। এখন দেখছি যে শব্দগুলি আওড়াতুম তার অর্থ—বারিবন্দনা।

ও শম্ম আপো ধম্বন্যাঃ শম্ননঃ সম্ভু কপ্যাঃ শম্নঃ সমুদ্ররা,—কুয়ার জল আমাদের মঙ্গল করুক, সমুদ্রের জল মঙ্গল করুক ইত্যাদি। কপোদককে কথা শোনানো সহজ, সে জল পরিষ্কার রাখা আমাদেরই হাতে; কিন্তু সমুদ্র সকল সময়ে রাস মানেন না, টাইটানিক জাহাজ-ডুবাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ! এই সম্ম্য দ্বার আবৃত্তি করবার নিয়ম; কিন্তু ঐ নিয়ম বেশীদিন পালন করেছিলুম বলে বোধ হয় না। পরে আমরা মহর্ষির উপদেশে জানলুম যে, উপবীত গ্রহণের মদ্য তাৎপৰ্য—গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা।—তা হতেই আমাদের নূতন জন্ম—তখন থেকে আমরা শ্বিজ। ব্রহ্মসাধনের অঙ্গরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপর পিতৃদেবের কতটা আস্থা ছিল তা তাঁর আশ্চর্য্যের দৃষ্টান্তে দেখতে পাই। তিনি বলছেন—

“পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। যদিও আমি বুদ্ধিলাভ যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। গায়ত্রীর গুঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ‘যিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ’ আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবন্ধ হইল।” ৪৫-৪৬ পৃঃ।

আমাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা সাধারণত যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া সংক্ষেপে সারিরা ফেলা—ঐ ক্রিয়ার সারভাগ পরিত্যাগ করে যেন শূদ্র খোলসটা রাখা হয়েছে। পিতৃদেব যে ভাবে উপনয়নকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে প্রাচীন প্রথার কাছাকাছি যতটা রাখা যেতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপনয়ন-ভাগ দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়।

এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হবে। সেই উপদেশের সারমর্ম এইঃ—

“গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের ইহকালের অবলম্বন, পরকালের সম্বল। সেই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁর জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে। ঐ বলিয়া ব্রহ্মকে অমৃতের জ্ঞানিবে এবং ভূভূবঃ স্বঃ বলিয়া স্বর্গমর্ত্য অমৃতরীক্ষ বহির্জগতে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে। তিনি এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়া আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই—তিনি আমাদের অমৃতের থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শৃঙ্খলবদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন—‘যিয়েয়োনোনঃ প্রচো-দয়ন্তঃ’।” গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ এই।

পূজা

আমাদের বাড়ী দুর্গা ও জগন্নাথী—এই দুই পূজা হত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকতো না। সেই তিন দিন আমরা যেন কল্পনাপ্রসূত এক নতুন রাজ্যে বাস করতুম—নতুন দেশ, নতুন ঋতু, আলো বাতাস সব নতুন। প্রথমে যখন প্রতিমার কাঠাম নিৰ্মাণ আরম্ভ হত তখন থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদায় নিৰ্মাণ-কার্য আমরা কৌতূহলের সহিত পর্যবেক্ষণ করতুম। আমাদের চোখের সামনে যেন ছোটখাট একটি সৃষ্টি কার্য চলেছে। প্রথমে খড়ের কাঠাম তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ তার উপর রং, ক্রমে চিত্র বিচিত্র ধূঁটি নাটি আর আর সমস্ত কার্য, সবশেষে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্ঘাটিত হত। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কৃষ্ণলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৈলাসে হর-পার্বতী, নন্দী ভৃগু, হনুমান ও গম্ভাদন, বীণাহস্তে নারদ মুনি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা, নৃসিংহ অবতার, কিম্বদন্তি-মিলিত ইন্দ্রসভা, গীতার একাদশ সর্গে যেমন বিশ্বলোকের বর্ণনা আছে, আমাদের এই চর্ম চক্ষে সেই বিশ্ব-লোক আবিষ্কৃত হত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের দেহমণ্ডন, বসন ভূষণ সাজসজ্জা প্রস্তুত হত, আমাদের দেখতে বড়ই কৌতূহল হত। লক্ষ্মী সরস্বতীর চমৎকার বেশভূষা। লম্বোদর গজানন, গণেশ ঠাকুরের মুখিক তাঁর স্থূল দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকত; কিন্তু কার্তিকের প্যাখম-ধরা মম্বুরের যে বাহার তা আর কহতব্য নয়। কার্তিক ঠাকুরের অপূর্ব সাজসজ্জা, তাঁর গদুম্বজোড়া, আকৃতি, বেশভূষা, ফিনফিনে শালিতপুড়ে ধূতি—দেখে মনে হত যেন একজন বাঙ্গালী বাবু মম্বুরের উপর এসে অধিষ্ঠান করেছেন। মহিষাসুর বৈচারার অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহের কামড়ে তার দক্ষিণ হস্ত অসাড়, এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভুজার বর্শাবিধ হওয়ায় তার আর নড়ন চড়ন নেই, এ সত্ত্বেও তার মূখে Milton-এর সয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে বেরছে।

পূজার সময় যাত্রা হত। কত রকম যাত্রার দল এসে মহল্লা দিত, তাদের মধ্যে যা সেরা তাই বেছে নেওয়া হত। যাত্রার বহুলোকসমাগম হত, উঠানটা লোকে লোকারণ্য। আমরা আদ্যোপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না, কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেরা প্রহ্লাদ সাজত তার বড় মিষ্টি গলা, তার গানে সকলে মোহিত হয়ে যেত। প্রহ্লাদ কত প্রকার উৎপাদন সহ্য করেছে, আমরা তার দৃষ্টে অশ্রুপাত করতুম। এত উৎপাদনেও তার ভক্তির স্থলন নেই। সে আপনাকে শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তার চিবকালের অভ্যাস কোথায় যাবে?

কালী কালী বলে ডাকি সদা এই বাসনা

অভ্যাস দোষেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা।

কিন্তু যাত্রার গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হত। রামায়ণের পালাতে সঙ্গের আসল ঘটনা—এদিকে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের দল, ওদিকে আবার রামের বানর সৈন্য,—সবই সংগীন ব্যাপার। আমরা সারারাত কিছু সভায় থাকতুম না, রাত্রিশেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে অনা হত। কোন ভাল অদ্ভুত রকম সং আসছে তাই দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম। দেখতে দেখতে তিন দিন চলে গেল—বিজয়া এসে, প্রতিমা ভাসান দিতে নিলে যাবে—কি আপশোষ! দুর্গা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিলে চলে, মনে হত সত্যিই দেবীর চক্ষে জল এসেছে। বিজয়ার দিন প্রত্যুষে আমাদের গৃহ-গায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি Classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনলে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুব একটি আগমনী গান আমাব এখনো মনে আছে—

আজ্ঞা পবমানন্দ আনন্দ! মম গৃহে আলো।

যাও যাও সহচরী,

আন ডেকে পূরনারী

বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল।

এস উমা করি কোলে,

মাকে মা কি ভুলে ছিলে,

এত দিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল।

মা হয়ে মমতা মার,

জাননা গো উমা আমার

পাষণ্ড স্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল॥

তখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিকতা কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সম্ভার আরতি দেখতে যেতুম, তাতে ধূপধূনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস। আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কি ভাগ্য পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা—পশুর বদলে কুমড়া বলি হয় এই শুনতুম। আধ্যাত্মিক ভাবের আর যা কিছু দেখা যেত সে বিজয়া দশমীর বিসর্জন উপলক্ষে। বিজয়ার রাত্রে শাস্তিঙ্গল সিগুন ও ছোট-বড় সকলের মধ্যে সম্ভাবে কোলাকুলি। এই অনুষ্ঠানটি বার্ষিক হৃদয়গ্রাহী মনে হত,—‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ এই বাক্য যেন ঠিক ফলেছে।

এই পৌত্তলিক উপাসনার মধ্য হতে আস্তে আস্তে অলঙ্কিত ভাবে আমাদের পরিবারে অমৃতের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হল। অল্প বয়স থেকেই মূর্তি-পূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল—যাকে ইংরাজীতে বলে ‘Iconoclast’ আমি তাই ছিলাম—তার কারণ পৈত্রিক সংস্কারই বল—আর যাই বল। এক সময়ে আমাদের বাড়ী সরস্বতী পূজা হত। মনে আছে এক-বার সরস্বতী প্রতিমা অর্চনায় গিয়েছি—শেষে ফিরে আসবার সময় আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর উপবে সজোবে নিক্ষেপ করে দে ছুট! তাতে দেবীর মূকুট ভেঙে পড়ল। এই অপরাধে তখন কোন শাস্তি পেয়েছিলাম কি না মনে নাই, কিন্তু হাতে হাতে সাজা না পেয়ে থাকি তার ফলভোগ এখন বৃদ্ধিতে পারছি। বাঁশীতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। আমার বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্মৃতিভ্রংশ হতে আরম্ভ হয়েছে। আমি যে আমার সর্বিসের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারিনি সেও ঐ কারণে। সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাই-কোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পাবতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হল না।

ব্যাখ্যা

ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়াম চর্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে ঘোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে আসতুম। সেই আমাদের Morning Walk—তাছাড়া ঘোড়ার চড়া, Cricket, সাঁতার দেওয়া এ সব ছিল। আমাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল, তাতে আমরা অনেক সময় সাঁতার দিতে যেতুম। বাজী রেখে সাঁতার দেওয়া আমাদের এক রকম খেলা ছিল। আমরা তিন ভায়ে মিলে যেতুম—কলার গাছ আমাদের ভেলা। সেই ভেলায় চড়ে মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে দেখা যেত কে কাকে সিংহাসন-চ্যুত করতে পারে। সেই কলার বাহন কেড়ে নেওয়া চাই—আরোহণী সাধামত চেষ্টা করছে আততায়ীকে হটিয়ে দিতে—চোখে জল ছিটিয়ে হোক আর যে কোন উপায়েই হোক তার আক্রমণ হতে আপনাকে রক্ষা করতে হবে।—বলপূর্বক সেই কলাবাহন যে দখল করতে পারবে তারই জিৎ। এই রকম সাঁতারে আমরা খুব পরিপক্ব হয়ে উঠেছিলাম। বাবামশায়ের সঙ্গে যখন গঙ্গায় ব্যাড়াতে যেতুম তখন সাঁতার দিয়ে স্নান আমার বিশেষ আমোদ হত। আমি সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতুম, বাবামশায় তাতে কোন আপত্তি করতেন না, বোধ করি যদিও এক একবার তাঁর মনটা অস্থির হয়ে উঠত।

বড়দাদা সাঁতারে সর্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাঁর রৈখাকরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত রকম কারদানী করতেন তার ঠিক নেই। যখন গঙ্গায় ধরার বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়ে গঙ্গাই পার হতেন; আর সকলে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত।

হীরাসিং বলে এক পালওয়ানের কাছে আমরা কুস্তী শিখতুম, তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। জনের পর জন বড় বড় মৃগুর ভাঁজা—আর কত রকম কুস্তীর দাঁও, মার পেঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলাম। কেউ আমার সঙ্গে সহজে পেরে উঠত না। হীরাসিংহের চালাদের মধ্যে অনেকে আমার সমবয়স্ক ছিল। তাদের সঙ্গে আমার কুস্তি হত—তাদের মধ্যে যারা বড় তাদেরও আমার কাছে হার মানতে হত; সহজে কেউ আমাকে ধরাশায়ী করতে পারত না। অথচ আমার বল যে বেশী তা নয়—এই কুস্তীতে শূন্য বলীর জয় তা নয়, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারলেই জিৎ। একদিন কুস্তী করতে করতে বেকায়দায় পড়ে আমার হাত মৃচকে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা গেল। আমার ওস্তাদের টোটকা শুধু সে যে রাখে এই ভেবে ছোলা ভিজিয়ে হাত বেঁধে রাখলুম; কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শেষে ডাক্তার সাহেবের রীতিমত চিকিৎসায় তবে আরাম হল। তখন থেকে সেবারকাব মত আমার কুস্তী বন্ধ। এই সব বিষয়ে আমি অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকতুম না, সবাই বলত “যা করবে সব তাতেই বাড়াবাড়ি—এ তোমার কেমন স্বভাব।” তার ফল ভোগও করতে হত—হাত পা ভাঙ্গা, মাথা ভাঙ্গা, কত বিপত্তি যে আমার উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই। অথচ এখনো পর্যন্ত ত বেঁচে আছি। এত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে শিশুজীবন যে কি করে রক্ষা পায়, বিধাতার এ এক আশ্চর্য বিধান। সে যাহা হোক, ঐকথা বলা যেতে পারে ‘কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়’—এটা বড় ঠিক কথা। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তিই হয়। তার সাক্ষী আমাদের ওস্তাদ হীরাসিং। তার কুস্তীর বিরাম নেই, যখনই দেখি কোন না কোন কঠোর ব্যায়ামে নিযুক্ত; কিন্তু তার শরীর বেশী দিন টিকল না। শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। শুনছি এঁই সব পালওয়ানের দীর্ঘজীবী হয় না। শরীর রক্ষা করতে হলে আহার বিহার ব্যায়াম এ সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্যিক। গীতানির্দিষ্ট মধ্যপথই প্রশস্ত—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু

যুক্ত স্বনাববোধস্য যোগো ভবতি দঃখহা।

নিয়মিত আহার বিহার, নিয়মিত কর্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—ইহাতেই দঃখহারী যোগ সাধন হয়।

শিক্ষা

আমি ইতিপূর্বে পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে আমার প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছি, তার পরের ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। পিতৃদেব যে চারজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্যে কাশীতে পাঠান—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তার মধ্যে একজন। ইনিই আমার সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমার শিক্ষক, কিন্তু এ’র উপাধির উপ-যুক্ত পণ্ডিতের যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হবে। এ’র শিক্ষা-গুণে সংস্কৃতশাস্ত্রে আমার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল তা বলতে পারি না। মূম্ব্বোধ ব্যাকরণের ‘সহর্ষে’ ‘চপেদিতা কানিতার্ণঃ’ প্রকৃতি সূত্র ও তস্য বৃন্তিগুণি কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করতেই সব সময় যেত। তিনি বলতেন—

‘আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণং বোধাদপি গরীয়সী।’

অর্থাৎ আবৃত্তিই সর্বশাস্ত্রের সার, বোঝা আর না বোঝা তাতে কিছু যায় আসে না। কবো’র মধ্যে রঘুবংশের কয়েক সর্গ বই আর বেশীদূর এগোয়নি। আমি যতদিন বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলাম, ততদিন যদি আর একজন ভাল পণ্ডিতের কাছে,—ওকথা থাক আর গুরুদান্দা করব না। তাঁর নিকট শিক্ষায় আমার একটা লাভ হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এক প্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলে আর কিছু না হোক তাঁর ঐটুকু পণ্ডিত্য—ঐ উচ্চারণ শূন্যটুকু উপার্জিত হয়েছিল, আর তাঁর ছাত্রও অল্পবিস্তর তার ফলভাগী হয়েছিল। বাংলা দেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যে কি বিকৃত তা সকলেরই জ্ঞান আছে, সে উচ্চারণ ত আমার কাণে ভারি অশ্রাব্য ঠাণ্ডে। আমাদের বড় বড় দিগ্গজ পণ্ডিতদেরও উচ্চারণ শুনলে মাথা হেঁট করতে হয়। আমাদের যেমন একপ্রকার ‘বাবু’ ইংরিজি আছে বা নিয়ে ইংরাজেরা বিদ্ভূত করে, তেমনি ‘বাবু’ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনলে না জানি তৈলগাণী বা মহারাজার পণ্ডিতেরা কি মনে করেন! সংস্কৃত কালেজের একজন ছাত্রপূর্ব অধ্যক্ষের সহিত আমার এই বিষয়ে কথা হয়। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলাম যে, কালেজের বিদ্যার্থীদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শেখাবার একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন। তিনি আমায় একথা হুট করে উড়িয়ে দিলেন। বঙ্গেন, “এদেশে যে উচ্চারণ চলিত তাই ঠিক—মেড়ুয়াবাদীদের কাছে আমরা আবার উচ্চারণ কি শিখব? আর কোন্ প্রদেশকেই বা উচ্চারণের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?”

কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা গাযের জোবে হয় না। সংস্কৃতের কোন্ বর্ণের কি উচ্চারণ তা পরীক্ষা করবার অনেক উপায় আছে, আর সে পরীক্ষায় বাংলা-সংস্কৃত উচ্চারণের ভ্যাক্সাল ধরা পড়বেই। “ভাষা বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুণি উচ্চারণ ঠিক ততগুণি বর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালার স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটিমাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ।” কিন্তু এদেশে আমরা কি সংস্কৃত বর্ণের যথানির্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করি? তা ত নয়। আমরা বর্ণীয় জ, অন্তস্থ্য ষ, দুই ব, মূম্ব্ব্য ণ, দন্ত্য ন, তালব্য মূম্ব্ব্য ও দন্ত্য স এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে কোন প্রভেদ মানি না। যুক্তাক্ষরে প্রতি বর্ণের পৃথক উচ্চারণ না করে বাঙলা ধরণে এক বিকৃত উচ্চারণ করে থাকি; যথা—

কৃষ্ণ (ক্ ণ)=কিষ্ণ। আত্ম=আত্ম।

স্নান=স্নান। ক্ষীর (ক্ ষীর)=ক্ষীর ইত্যাদি।

অন্ত্যস্ব 'ষ'র পৃথক উচ্চারণ বাঙালার আদৌ নাই, যুক্তাক্ষরেও নহে। সংযুক্তবর্ণে 'ষ'কারের উচ্চারণ হয় না—যে অক্ষরে সংযুক্ত থাকে তার স্বরদ্বিত্বের মত উচ্চারণ হয়, যেমন—
সত্য=সন্ত। বাদ্য=বাদ্দ ইত্যাদি।

বাঙালার অনেক স্থলে 'অ'কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হ্রস্ব 'ও'কারের মত, যথা—অরি অসি ইত্যাদি। সংস্কৃত উচ্চারণের বেলাতেও আমরা এই নিয়ম অনুসরণ করি। বাঙালী উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণে আরোপিত হয় বলে এখানে সংস্কৃতের উচ্চারণ এরূপ দূষিত হয়েছে। তাই হয়েছে। তাই বলছি সংস্কৃতের মত ঠিক উচ্চারণ করতে হ'লে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতা কোন কোন অংশে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে বাঙালী দেশের কাছে আর সকলকেই হার মানতে হয়। এদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যেসকল বিকৃতি ধারণ করেছে এমন আর কোথাও দেখি নাই। বারাগসী বল, দাক্ষিণাত্য বল, এসকল স্থানের যে কোন পণ্ডিত হোন তাঁদের উচ্চারণ যে আমাদের তুলনায় বিশুদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দু'একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে; যেমন মহারামেশ্বর দেখেছি 'দ'এ 'ন'এ 'জ'র উচ্চারণ হয়; কিন্তু সেগুলি খতব্যের মধ্যে নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ওসকল স্থানের সংস্কৃতজ্ঞদের গুরুস্থানীয় বলে মনে নিতে পারি। সে যা হোক, আমার মনে হয় বঙ্গদেশে সংস্কৃতের উচ্চারণ-সংস্কার নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সংস্কৃতানুরাগী বিশ্বম্ভন্দলী এবিষয়ে মনোযোগ করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার যা কিছু জ্ঞানলাভ হয়, সিবিলা সার্ভিস পরীক্ষায় সেই বিদ্যাটুকু আমার বিলক্ষণ কাজে এসেছিল। আমার সময়ে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় ৫০০ মার্ক পূর্ণমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এই ৫০০ মার্কের মধ্যে আমি সংস্কৃতে ৩৫০-এরও উপর পেয়েছিলাম। আমার পরীক্ষক ছিলেন ভট্ট মোক্ষমূলর। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। বোধ করি আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার কাগজটার উপরে একটু সদয়ভাবে চোখ বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চ সংখ্যা পাবার আমার আশা ছিল না। আমি সিবিলা সার্ভিস পরীক্ষায় ল্যাটিন গ্রীকের পরিবর্তে আমাদের দুই Classic—সংস্কৃত ও আরব্য নিয়েছিলাম। ওখানকার ছাত্রদের নিজের ভাষায় অথবা ওদের চিরাভ্যস্ত ল্যাটিন গ্রীক ভাষায় যদি আমাকে পরীক্ষা দিতে হ'ত, আর আমাদের ক্লাসিকস্বরূপে তালবেতালরূপে যদি আমার সহায় না থাকত তাহলে ঐ পরীক্ষায় আমার জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী

Oriental Seminaryর হেড মাস্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন।—ধীর শান্তপ্রকৃতি, স্দুবিম্বান—তাঁর কি এক মোহিনী শক্তি ছিল আমরা সহজেই তাঁকে মনে চলতুম, আমাদের উপর তাঁর কোন জোর জ্বরদস্তী করতে হ'ত না। আমাদের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল কেবলমাত্র “Sir”—“Sir” এসেছেন শুনলেই আমরা গিয়ে হাজির। বিদ্যালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল তা ছাড়াও তিনি আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Gibbon's Decline and Fall—রোম রাজ্যের অবনতি ও পতন' যার পরে পরে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিস্প্লব, রোম সম্রাটের অমানুষিক কাণ্ড-কার-খানা—গিবনের মঙ্গগম্ভীর ভাষায় পড়ে স্তম্ভিত হতে হত। এতিন্ভিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধাদি

লেখা, বক্তৃতাাদি লেখা, বক্তৃতাাদি অভ্যাস করা, এ সকলের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিতেন। যাতে আমাদের ইংরাজি ভাল বলবার ক্ষমতা জন্মে সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের জন্য এক বক্তৃতা-সমিতি স্থাপন করেছিলেন; প্রতি সপ্তাহে তার অধিবেশন হ'ত এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা—নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহা মহা বীরদের বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন করে আমরা বড় বড় তর্কবাগীশ একত্র হয়ে বাগ্মিতা ফলাবার চেষ্টা করতুম। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় আমাদের তর্কবিতর্কের সুন্দর মীমাংসা করে দিতেন। এই সভার কার্য অনেক দিন বেশ নিয়মপূর্বক চলেছিল। মাস্টারমশায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা ছিল, তিনিও পিতার ন্যায় আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুণে আমি ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন এক সভায় “প্রাচীন ভারতের রণনীতি” বিষয়ক একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করি—কেশবচন্দ্র সেন সেই অধিবেশনে একজন প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হই। তখন তার নাম ছিল ‘হিন্দু কলেজ।’ প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—স্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe—বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। দুবৎসর পরে বনমালী বাবুর ক্লাসে উঠি। তিনি একজন অতি কঠোর প্রকৃতির মাস্টার ছিলেন। ছেলেদের উপর বড়ই উৎপীড়ন করতেন, সব চেয়ে যে সুশীল বালক সেও তাঁর প্রচণ্ড চপেটাঘাত এড়াতে পারত না। বন্ধুবর তারকনাথ পালিত তাঁর চপেটাঘাতে একবার ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে ঘরের ন্যায় ভয় করে চলতুম—যমদূতের মত তাঁর সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্তি মনে করলে এখনো ভয় হয়।

তারকনাথ পালিত

বনমালী বাবুর ক্লাসে আমার পড়াশুনা কেমন হত মনে নাই কিন্তু একটি জিনিসের জন্যে সে বৎসরটি আমার চিরস্মরণীয় থাকবে—সে কি না বন্ধুগোষ্ঠ। আমার সহাধ্যায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি যে একটি বন্ধুর সঙ্গে পেরেছিলুম তিনি আমার চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে রইলেন। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে ভাল-ভাল পায়রা—লঙ্কা মন্সী লোটন গলাফোলা এনে দিয়ে কত রকমে আমাকে সুখী করবার চেষ্টা করতেন, স্কুলে ও বাড়ীতে সর্বদাই আমরা মাণিক জোড়ের মত এক সঙ্গে থাকতুম। আমার ছেলেবেলাতেই একবার এমন बात হয়েছিল যে, চলতে কষ্ট হ'ত—তখন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলতুম। বড় হয়ে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম তখনো আমরা বন্ধুত্ব-সুদ্রে বাঁধা। আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, বয়স তখন ১৯; বিলাতে থাকতে আমাদের পত্র ব্যবহারে কোনদিন দ্রুতি হয়নি। যখন আমি বোম্বায়ে কান্স আরম্ভ করি তখনও তারক বিলাত যাননি। তিনি বিলাত যান—আমি বিলাত থেকে ফিরে আসার বছর দুই পরে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসতে আসতেই প্রায় তিনি ব্যাবিস্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি যখন বিদেশে কর্মস্থলে তখন তিনি এখানে থেকে আমাদের বিষয়-কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় পবামর্শদাতা ও সর্বতোভাবে হিতচিন্তক ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাইকে আপনার মত কবেই দেখতেন। তাঁর ভালবাসার চিহ্নসকল আমার জীবনময় ছড়ানো রয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যে সকল উপকার পেরেছি তার জন্য আমি তাঁর নিকটে চিরঋণী। আমার জীবনের উপর দিয়ে কতগুলি ঘটনা গিয়েছে, অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হয়েছে যাঁদের

নাম স্মৃতি মাত্রই রয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে বন্ধুতার কথা বলছি এ.এখনো পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আমি যার কথাগুলি এই লিখছি আমার সেই প্রিয়সুহৃৎ এ সময়ে রোগশয্যা শয়ান। ৫, ৬ বৎসর ধরে তিনি উৎকট পীড়ার কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁর স্বাভাবিক স্ফুর্তি কখনো ম্লান হ'তে দেখিনি। কোন দিন একটু ভাল কোন দিন মন্দ, এই উত্থান-পতনের মধ্যে তিনি ধীরভাবে দিনযাপন করছেন। এই দুঃখ কষ্টে তাঁর ধৈর্য অসীম, তাঁর বীর্ষ ও সাহসের হ্রাস নাই। তাঁর কি রোগ, চিকিৎসায় কি কি প্রয়োজন, তিনি এ সকল তন্ন তন্ন করে জেনেছেন আর ডাক্তারেরা ঔষধ পথ্য যা কিছু ব্যবস্থা করেন, যাতে তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হয় তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। বলতে গেলে তিনি আপনিই আপনার চিকিৎসক, আপনিই আপনার ধাত্রী। আমার একজন ইংলণ্ডপ্রবাসী বন্ধু এদেশে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে বলছিলেন, “তারক যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন”,—সত্যই করছেন—যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তিনি এতদিন পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন।

ডাক্তার Lukis বলতেন, “পালিত কেবল তাঁর Will-power-এর জোরে বেঁচে আছেন—আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের সবই যেন উল্টে দিয়েছেন।”

মৃত্যু আসুক তাতে তাঁর কোন ভয় নাই, কেবল ভয় এই যে, যে মহৎকার্য সমাধা করতে তিনি উৎসুক, পাছে মৃত্যুতে সে কাজের কোন ব্যাঘাত হয়। তিনি তাঁর স্বোপার্জিত প্রভূত ঐশ্বর্য দেশের কল্যাণরতে উৎসর্গ করেছেন, তা কারো অবিদিত নাই। আমাদের দেশে যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার হয়, বিজ্ঞান-বলে যাতে কৃষিশিল্পের উন্নতি এবং ঐ সঙ্গে দেশীয় লোকের অর্থোপার্জনের সহস্র ম্ভার উন্মুক্ত হয়, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি প্রথমে তাঁর ধনবল একত্র করে জাতীয় শিক্ষাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, পরে যখন সেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত হ'ল না, তার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দেহান হলেন তখন সেখানকার দান উঠিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশে নতুন দান ব্যবস্থা করলেন—সামান্য দান নয় স্থাবর সম্পত্তি মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকারও উপর। দানপত্রের ব্যবস্থা দু'কথায় এই যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-কলেজে—পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা এই দুই বিদ্যায় দুইটি আসন প্রতিষ্ঠিত হবে—এই প্রথম। দ্বিতীয়, ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাকার্যে দেশীয় লোকেরাই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবেন। যদি তাঁদের যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্ত বিদেশে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক হয় তাহলে এই ব্যবস্থাপত্রের কতৃপক্ষদের বিবেচনায় যাহা ধার্য হয় সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হবে। কিছুদিন পূর্বে এই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ ও দানপত্র গঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত হয়েছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় আরও আট লক্ষ টাকার বিষয় তিনি লেখাপড়া করে সেনেটের হাতে সমর্পণ করেছেন। এই শ্রুত কার্য সূসম্পন্ন করে এখন তিনি নিরুদ্বেশ মনে তাঁর শেষ দিন প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, ভূত্য যেমন মাসের শেষে আপনার বেতন প্রতীক্ষা করে থাকে—“কালমেব প্রতীক্ষিত নির্দেশং ভূতকো যথা।”

এই বিরাট দান উপলক্ষে মুনবারিসিটির Vice-Chancellor মহোদয় বলেছেন :—
“প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, প্রমথকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, ম্ভারবজ্রাধিরাজ প্রভৃতি মহাস্বাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখো লাখো টাকা দান করিয়া আমাদের গৌরবের পাথ হইয়াছেন সত্য কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাশয় তাঁর এই অসামান্য বদান্যতাগুণে আর সকলকে পরাস্ত করিয়া এই দাতৃমন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিলেন।”

ছেলেবেলা থেকেই তারকনাথ পালিত তেজস্বী, এইখানে তাঁর বালাকালের তেজস্বিতার একটি পরিচয় প্রদান করি। আমরা দুই বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মেডিকেল কলেজে

কেমেন্টারী লেকচার শুনতে যেতুম। একদিন প্রোফেসর আসার আগে আমরা দুজনে একটু চোঁচিয়ে কথা ক'চ্ছিলুম। মেডিকেল কলেজের একজন ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা তাইতে রুদ্রস্বরে বজ্জে—“This is not a Bazar, Don't make such a row”—তারক তাই শূনে ভারী রেগে উঠলেন আর বেশ দু'কথা শুনিয়েও দিলেন। তখনই প্রোফেসর আসার তখনকার মত বিবাদটা এখানেই থেমে গেল, কিন্তু লেকচার হয়ে যাবার পর ৫।৬ জন ফিরিঙ্গীপুঙ্গব দল বেধে তাঁকে আক্রমণ করতে এল, তিনি তহত ভয় না পেয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে সর্বাগ্রে দলপাতিকে এক ঘুঁসি বাঁসিয়ে দিলেন। তখন চেলাগণ হাঁ হাঁ করে তাঁর উপর এসে পড়লো, ৪।৫ জনে মিলে তাঁকে কিল চড় বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু আমার বন্ধুটি ত কিছুতে দমবার পাত্র নন, তাহলে তিনি আজ এই দেশপুঞ্জ্য তারকনাথ পালিত হ'তে পারতেন না। তিনি দুই হাতে শত হস্তের বল ধরে তাদের উপর ঘুঁসি চড় কিল বর্ষণ করতে ছাড়লেন না। খুব মার খেলেন সত্য—কিন্তু মারতেও কিছুমাত্র কসদর করেন নি। আসলে যে তাঁরই জয়লাভ হল একথা মৃত্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার পরদিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা এই খবরে ভারী রেগে গেল। রমানাথ নন্দী বলে একজন ছোকরা আমাদের দলের চাঁই হস্বে দাঁড়িয়ে Awake, arise or be for ever fallen—এই লাইনটা কাগজে লিখে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। পর দিন দল বেধে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। তারক প্রথমটা এতে অমত করলেন, বজ্জন, কার্ষক্রে তারাও মেরেছে আমিও মেরেছি, শোধবোধ হয়ে গেছে—আবার সেজেগুজে মারামারি করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সকলে যখন স্থির করলে যে, না, মারতেই হবে, তখন তিনিও আগ্রহান হয়ে দাঁড়ালেন। তার পর যখন দেখা গেল ফিরিঙ্গি অনেক তখন সর্বাগ্রে আমাদের উত্তেজক মহাশয় রণে ভগ্ন দিলেন; অনেকেই তার অনুসরণ করলে, আমরা যে দু'তিন জন শেষ পর্যন্ত অটল ছিলুম তার মধ্যে ঠৈরব বাঁড়ুয্যে একজন। তিনি আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আসলে হার হল আমাদের এই ম্বেতীয় দিনে, এদিনে তারক খুবই মার খেয়েছিলেন। তবুও ফিরিঙ্গীরা তাঁকে apology করতে পারেনি। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, “আমি মরে যাব তবু apology করব না।”

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন ছিলেন সাট্রিফ সাহেব, তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইটুয়েল তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, আমরা দল বেধে মেডিকেল কলেজের ছোকরাদের মারতে গিয়েছিলুম। প্রিন্সিপ্যালের কৈফিয়ৎ তলবে তারক তখন সমস্ত খুলে বজ্জন। সেই ফিরিঙ্গী কি রকম রুঢ় ব্যবহার করেছিল—যা থেকে এই মারামারির উৎপত্তি—একলা তাঁকে তারা ৪।৫ জন মিলে কি রকম আক্রমণ করেছিল—সব শূনে সাট্রিফ সাহেব নেপথ্যে বজ্জন—Served him right—; যাহোক প্রকাশ্যে দু'জনেরই জরিমানা হয়ে মামলা মিটমাট হয়ে গেল।

আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দু স্কুল থেকে কিছুকালের জন্যে St. pauls' School-এ গিয়ে ভর্তী হই। সেখানে ইংরাজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল; তাদের সঙ্গে যে, সকল সময়ে মিলে মিশে সম্ভাবে থাকতুম তা বলতে পারি না, কখন কখন টকরাটকারি ঘুঁসোঘুঁসিও হত। এই রকম একটা ম্বেত্ববৃদ্ধির কথা আমার মনে আছে। একটি ছেলের সঙ্গে আমার হাতাহাতি ব্যাপারের কথা আমাদের Rector-এর কাণে গিয়েছিল। কার দোষ সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই বোধ করি আমাকেই প্রথমটা তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত করে থাকবেন। কেননা আমাদের কিছু আগে একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল

তাতে আমার যে প্রাইজ পাবার কথা ছিল তা বন্ধ করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ কোন শাস্তি হয় নাই। আমি ইংরাজি সাহিত্যে বেশ ভাল রকমই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। Goldsmith-এর একটি সেট বই তাতে প্রাইজ পাই। আমার ক্লাসের ছেলেদের সম্মুখ করবার এক সহজ উপায় ছিল—তাদের মসলা বিতরণ করা। আমার পকেটে সুপারি এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা থাকত, তাই খেতে তারা খুব ভালবাসত, কাজেই আমার সঙ্গে তাদের ভাব রাখতে হত। মাষ্টারেরাও আমাকে ভালবাসতেন—Pridham সাহেব আমাকে বড় অনুগ্রহ করতেন—তার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছবি দেখাতেন আর তিনি নিজে যখন ছবি আঁকতেন তখন আমি বসে বসে দেখতুম। অন্যান্য ছেলেদের মত মাষ্টারদের কাছ থেকে আমাকে বেচারাঘাত সহ্যেতে হত না। এক একটা মাষ্টার ভয়ানক গোঁয়ার ছিল—ছেলেরা তাঁর বেচারাঘাতের ভয়ে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকত। আর দুই একটি ছেলের প্রতি তাঁর বিশেষ ক্রোধকটাক্ষ দেখতুম, তাদের প্রতি অকারণ অত্যাচার দেখে আমার ভারি কষ্ট হত। বেচারাদের পিঠের চামড়া বোধ করি কোনখানে অক্ষত ছিল না।

সেন্টপল ছেড়ে পুনর্বীর হিন্দু স্কুল। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি।

রামচন্দ্র মিত্র

কলেজে আমাদের যে সব শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে আমরা শ্যামাচরণ সরকারের বাংলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য বাংলা বই পড়তুম। তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে; অনেকগুলি অশ্লীল অশ্লীল ঘটনাও আমাদের স্মরণে দেখা;—তাঁর চেহারা ধরণ ধারণ সকলি কৌতুক্যবহ। কোন বড় লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হলে পায়ে পা ঠেকিয়ে ‘I beg your pardon’ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করা হত; সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্লাসের ছেলেরা দুষ্টমি করে অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করত কিন্তু কোন ছেলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে—কোথায় নরম কোথায় বা গরম—তা তাঁর পাকা জ্ঞান ছিল। পাড়াগেয়ে ছেলেদের উপর তাঁর ভারি আকোশ, কেননা তিনি বেশ জানতেন তারা মূখের উপর কোন জবাব করতে সাহসী হবে না। অথচ অন্য অবাধ্য দুষ্ট ছেলে যাদের এক কথা বললে মূখের উপর দৃষ্টি শূন্যে দেবে তাদের প্রতি অতি নম্র ব্যবহার। ‘শক্তির ভক্ত নরমের গরম’ তাঁর সম্বন্ধে অবিকল খাটত।

একদিন আমাদের ক্লাসের একজন পাড়াগেয়ে ছেলে পাঠ্য বই আনেনি এই নিয়ে তিনি তার প্রতি মহা খাম্পা হয়ে কটুবাক্য বর্ষণ করছেন দেখে তারক বলেন, “ওকে ও রকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? ও কি করেছে? জানেন আমরা ফাস্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি।”

তখনই তিনি নরম হয়ে অতি মৃদুস্বরে বলেন—“ও বই আনেনি তাই শাসন করলাম।” তারক উত্তর করলেন, “আমিও ত বই আনিনি আমাকেও কি ঐ রকম করে শাসন করবেন?” রাম মিত্র বলেন (মৃদুস্বরে) “ওঃ তুমি বই আনিনি—তা পাশের ছোকরার বই দেখে পড়ি।”

ছেলেরা যখন ভারি গোল করছে কিছুতেই বাগ মানেন না তখন তিনি তাদের ধামাঝার একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেন। নানা রকম মৃদুভাষা করে কেদারা থেকে উঠে বোর্ডে খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখতেন Silence! Silence! Silence! চুপ চুপ চুপ! তার পর চোঁকিতে বসে বলতেন, “এখন কে গোল করবে করুক দেখি!”

আমরা বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক রকম শুনতে পাই, ওবিষয়ে নানা মতের নানা মত—কিন্তু রামমিত্রের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ নতুন, আর কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না। দৃষ্ট-একটি নমুনা দিচ্ছি :—

পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয়? রসগোল্লা খেতে খেতে তার গোলাকার ধ্যান করা।

গোল শেখার সহজ উপায় কি? স্ট্রায়টের জিওগ্রাফিখানি ২০ আনা মৃদুস্থ করা—লেখার সময় চার আনা ভুলে গেলেও—১৬ আনা মনে থাকবে।

Composition ভাল লিখতে হয় কি করে? ভাল ভাষায় প্রকৃতি বর্ণনা করতে গেলে সুশীতল সমীরণ এই দুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধুভাষা মনে না আসে সেখানে ‘ঠান্ডা বাতাস’ বসিয়ে দেবে। কলসের স-টা কোন্-স যদি মনে না থাকে তাহলে সেখানে ‘ঘট’ শব্দটা ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার পরীক্ষা দেবার সময় কোন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মশায় এই বইটার কোন্ কোন্ অংশ ভাল করে দেখে রাখা চাই, আমাকে বলে দিন।

উত্তর—(খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া)

Mark the first page ! Mark the second page !!

বলতে বলতে বইটার কোন ভাগই বাদ গেল না, সে বেচারী ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’ বলে প্রস্থান করলে।

রামমিত্রের নামে অনেক গল্প আছে, আর কত বলব। কেশবচন্দ্র তাঁর নকল করতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। কেশববাবু রামমিত্রের সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন, সেটি হচ্ছে এইঃ—

একদিন রামমিত্র ছেলেদের বটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বাগানের মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ করেছেন—অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রক্ষ্ম মৈজাজের ইংরাজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ করলে—

“Who the devil are you ?”

তিনি ভীত হয়ে বজ্রেন—

“Professor Ramchandra Mitra, Professor Presidency College.”

উত্তর হল—“D—your Professor” তখন তিনি ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বজ্রেন—

“Let us forget and forgive, let us exercise the Christian virtue of forgiveness.”

আমরা সকলে একবার সিংহলে ব্যাড়াতে গিয়েছিলাম। স্ট্রীমারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেশববাবু আর কালিকমল গাঙ্গুলী বলে একটি আমদে মজলিসী লোক,—‘কোলাই কোমল গাম্বুলাই’ বলে আপনার পরিচয় দিতেন। সমুদ্রের উপরে রামমিত্রের গল্প আমাদের এক প্রধান খোরাক ছিল। সে সব কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের নাড়ী ঝঁড়ু যেত।

‘কোলাই কোমল’ শেষে আমাদের ভারি মৃদুসিক্তে ফেলেছিলেন। দেশে ফেরবার সময় তিনি কি একটা কাজের ছুতো করে বোটে উঠে ডাঙ্গায় নেমে গেলেন। এই আসছি বলে কোথায় যে অন্তর্ধান হলেন তার আর কোন সম্ভান পাওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে স্ট্রীমার চলে গেল। তার দু-এক সপ্তাহ পরে তবে কলকাতায় আবার তাঁর দেখা পাই।

বিলাত যাত্রা

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমার বিলাত যাত্রা। আমি কখনও স্বপ্নেও যা ভাবি নাই

আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যায়—দৈবের কি বিচিত্র গতি। এক একটা অদৃষ্টপূর্ব আকস্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের জীবনস্রোতকে কোন্ এক অজ্ঞাত নতুন পথে যেন বলপূর্বক টেনে নিয়ে যায়—যার পূর্বাভাস কিছই পাওয়া যায় নাই। আমার জীবনে এ কথা সপ্রমাণ দেখতে পাই। আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হচ্ছিল, দৈবঘটনার কোন এক বন্ধু-মিলনে সে সমস্তই উল্টে গেল, আমার জীবন-প্রবাহ অন্য দিকে বিবর্তিত হ'ল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশযাত্রা, ইংলণ্ডে গিয়ে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাণ্ডে আমার পূর্ব-নির্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

বাল্যকাল হ'তে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু মৃদু গতিতে চলছিল যে, তার প্রভাব বিশেষ অনুভব করতে পারিনি। আমার পিতা সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর এমন এক ঘটনা উপস্থিত হল যাতে সেই সমাজের ইতিহাসে এক নতুন পৃষ্ঠা উন্মোচিত হল। সেই ঘটনা হচ্ছে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলন। কেশবের আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হ'ল। তিনি কোন্ সূত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন—আমি তাঁকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। পিতার সহিত তিনি এই বিষয় পরামর্শ করতে আসেন। পরামর্শে স্থির হল যে, এই মন্ত্রে যখন তাঁর বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। মন্ত্র গ্রহণ না করাই তিনি স্থির করলেন। সেই অবধি তাঁর উপর তাঁর বাড়ীর লোকদের অত্যাচার আরম্ভ হল পরিশেষে তিনি সব ছেড়েছুড়ে সম্পূর্ণ আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—পিতাও তাঁকে স্নেহপূর্বক আপনার পুত্ররূপে বরণ করে নিলেন। সেই সময় থেকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর পত্নী আমাদের পরিবারভূক্ত হয়ে আমাদের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই মধ্যাহ্নকাল;—কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নতুন মূর্তি ধারণ করলে। আমিও সেই উৎসাহ-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলাম। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে পিতার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ, আর আমাদের রচিত নব নব ব্রহ্মসংগীত মিলে সমাজে সাম্প্রতিক উপাসনার মধ্যে এক নতুন শ্রী, নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। আমি এই সব নিয়ে মৈত্রেয় আছি এমন সময় মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ী অতিথি হয়ে থাকতে এলেন। যেন একটা বোমা আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেল।

মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ। তাঁর পিতা রামলোচন ঘোষ আমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন, ঐ বন্ধুতা সূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বন্ধুতা জন্মেছিল। একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন, তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, “An old head on young shoulders”—যুববার ধড়ে বুড়ার মাথা। বাস্তবিকও তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তাঁর বয়স তখন ১৭ হ'বে অথচ Indian Mirror সাম্প্রতিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি অকাতরে স্ব্বে নিলেন। ঐ বয়সে তাঁর মাথায় Civil Service পরীক্ষার কল্পনা খেলছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর মনের সাথ পূর্ণ হ'ল না। তিনি স্বেচ্ছাছিলেন এক, বলবন্তর দৈব তাঁকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। আমার জীবনক্ষেত্র বোম্বাই, তাঁর হ'ল বাঙ্গলা দেশ; আমার কর্ম গবর্ণ-মেন্টের চাকরী, তাঁর স্বাধীন আইন ব্যবসা; তিনি যে ক্ষেত্রে জয়লাভ করলেন সেই তাঁর

উপযুক্ত ক্ষেত্র, আমিও আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পেলাম। কেবল দুঃখ রইল আমাদের একঘাটার পৃথক ফললাভ ঘটল।

আমাদের বিলাত যাওয়া একরকম ঠিক হয়েছে এমন সময় আমরা একদিন Botanical Garden-এ বেড়াতে যাই। পার হবার সময় একটা স্ট্রিমারের ধাক্কায় আমাদের নৌকা উল্টে গেল। আমি সাঁতার জানতুম, নৌকার একভাগ কোনরকম কর্বে আঁকড়ে ধরে রইলাম কিন্তু মনোমোহন নৌকার তল্লাস পড়ে স্বাবদ্ভব খেতে লাগলেন, তাঁর আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেকে ডাকাডাকির পর এক পান্‌সীর মাঝি তাঁকে টেনে ওঠালে। আমরা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গম্য স্থানে চলে গেলুম—সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে চেঁড়িয়ে ষাণ্ময়ে বাড়ী ফিরলাম। এই বৃত্তান্ত বাবামশায়ের কণ্ঠগোচর হওয়াতে আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বলেন, “তোমরা এখানেই আপনাদের আপনারা সামলাতে পার না তোমাদের ঐ দূরদেশে পাঠান যায় কি করে? তোমাদের কেউ সঙ্গী নেই, রক্ষক নেই, আপনার উপরে নির্ভর করেই যেতে হবে, তোমরা তা পেরে উঠবে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।” বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা অসমসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম বলতে হবে। আমরা দু’টি তরুণবয়স্ক বালক আর তখন ইংলন্ডে যাওয়া এখনকার মত এপাড়া ওপাড়া নয়। Suez Canal তখন প্রস্তুত হয় নাই। Suez থেকে Alexandria পর্যন্ত রেলপথ। এই পথে সমুদায় বিঘ্নাবাধা অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের মত বালকের পক্ষে সহজ ছিল না। তখনকার কালে লোকে ‘কলাপাণি’ পার হওয়া এক অসাধ্যসাধন মনে করত—অকারণে নহে; কেননা আমাদের মধ্যে প্রথম যে দুইজন বাবু যান, রামমোহন রায় ও স্মারকানাথ ঠাকুর, তাঁদের আর দেশে ফিরে আসতে হয় নাই। কাজেই লোকের ধারণা ছিল যে ও-দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না—

“The land from whose bourn
no traveller returns”

যা হোক শেষে আমাদের যাওয়াই সাবাস্ত হ’ল। আমি ত আমার প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অকূল পাথারে ভেসে পড়লাম। আমার সে সময়কার একটি বিদায়ের গান এই—

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন
কোন প্রাণে চলে যাব বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন॥
শরীর যদিও যাবে, মন সদা হৈথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুরক্ত।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত,
কছু না ছাড়য়ে তবু পাদপ-বন্দন॥

আমরা পথের সমুদায় বিঘ্নাবাধা অতিক্রম করে ভালয় ভালয় আমাদের গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছিলাম, আমাদের জাহাজ Southampton বন্দরে নোঙর করবামাত্র আমরা আশ্বীষ স্তানেন্দ্রমোহন ঠাকুর* আমাদের নিতে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠলাম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও দুই কন্যা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিলেন। তাঁদের অতিথি হয়ে কিছুকাল সুখে কাটান গেল। তাঁদের বাড়ী খৃষ্টমিসনারিদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুবিধা পেলাম। সেখানে Hodgson Pratt নামক একটি ভারতাহঁতবী মহাস্থায় সঙ্গে আমাদের

* ইনিই প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিস্টার, অনেকে হয়ত তা জানেন না।

পরিচয় হ'ল, তিনি অভিভাবকের ন্যায় আমাদের অত্যন্ত যত্ন করতেন। তাঁরই পরামর্শে আমরা মাসকতক পরে Windsor-এর নিকটবর্তী একটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরীক্ষার উপযোগী পাঠ্যভ্যাসে নিযুক্ত রইলুম। গৃহটি ছাত্রাবাস ধরণের স্থান, আমরা ছাড়া আরো কয়েকজন ছাত্র ছিল। যিনি গৃহস্বামী তিনি আমাদের ইংরাজী শিক্ষক; সংস্কৃত, আরব্য, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অন্য বিষয়ের জন্য অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। Dr. G. একজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সেইরূপ মদুখরা। বড় বড়ীর মধ্যে যে খুব বনিবনাও ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই খিটখিট চলত। তাঁদের কন্যার—একটি প্রাতঃবসুন্ধা কুমারী গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, তিনি অনেক পরিমাণে এই অশান্তির প্রতিবিধান করতেন। আমাদের পড়ার মাঝে বা কিছু সময় থাকত তাঁরই সংসর্গে কাটাতুম। কাছে একটি ছোট নদী ছিল, তাতে আমরা কেহ কেহ বোটে করে ব্যাড়াতে বেরতুম। মনে আছে একবার আমি কৌতুকক্রমে তাঁর মনে ভারি আঘাত দিয়েছিলুম। তিনি আমাকে একটি ফুল উপহার দেন—সবসঙ্গে আমার বৃকের উপর কোটে পরিয়ে দিয়েছিলেন। দর্ভাগ্যক্রমে ফুলটি শীঘ্র শুকিয়ে গেল। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—“এর মধ্যে ফুল শুকিয়ে গেল—এর কারণ কি?” আমি উত্তর দিলুম, “ভিতর থেকে রস পালনি বলে বেচারী অত শীঘ্র মুষড়ে পড়েছে।” Miss G. মনে করলেন আমি তাঁর উপর কটাক্ষ করে এ কথা বললুম—যদিও আমি কেবল কথার কথামাত্র বলেছিলুম, কোনই গঢ় অভিপ্রায় ছিল না। যা হোক আমার এই অনবধানের উত্তির দরুণ আমি তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলুম—কত সাধ্য সাধনার পর তাঁর মানভঞ্জন হল। এই ছাত্রাবাসে থেকে পাঠ্যভ্যাসে আমাদের বিস্তর খাটতে হ'ত; মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা সকাল পর্যন্ত নিয়মিত পরিশ্রম করতে হ'ত; এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য। এই পরিশ্রমের কুফল হওয়া দূরে থাকুক সদাই সফল ফললো। ১৮৬২ সালে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম। যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় তখন আমি মনোমোহনের সঙ্গে যুরোপে ভ্রমণে বেরিয়েছি—প্যারী নগরীতে ‘পাস’ হওয়ার সংবাদ আমার হাতে এল। আমি ‘পাস’ মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম বৎসরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হ'তে পারব এরূপ আশা করি নাই। আমার আশাতীত ফল লাভ হ'ল তাতে আমার আনন্দ কিন্তু আমার বন্ধুর নৈরাশ্য সংবাদে সে এক রকম ‘হিরণ্যে বিষাদ’ বোধ করলুম। সে যাই হোক আমাদের মনের কথা মনেই রইল। তখন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি—আমাদের রাত উদ্‌যাপন করা প্রথম কাজ। প্যারী হ'তে আমরা Switzerlandএ প্রবেশ করলুম। ‘প্যারী’ এই নামের সঙ্গে কি মধুর স্মৃতি জড়িত আছে। নগরটি কি সুন্দর! দুই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ গিয়েছে—(Boulevards), বিপণিগদূলি কি সুসজ্জিত, কি লোভনীয়! প্রাসাদ চিত্রশালা সকলি মনোরম, প্যারীর কি এক সম্মোহন মন্ত আছে বিদেশীর মন লন্ডন অপেক্ষা সহজে আকর্ষণ করে। লন্ডন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, তার ভিতরে অনেক দেখবার জিনিষ, অনেক শেখবার বিষয় আছে—তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিস্তর সম্মুখসাপেক্ষ; কিন্তু প্যারীর সৌন্দর্য প্রথম দর্শনেই নয়নমন হরণ করে। প্যারী হ'তে Swiss দেশে গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখে নিলুম। সরোবরের ক্রোড়লীন জেনেবা নগরী; Lausanne যেখানে গিবন তাঁর রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস সমাপন করেন; Chillon দুর্গ যার বন্দী কাহিনী বাইরণেব কবিতায় বর্ণিত,—গিরির পাহাড় যার উপর থেকে সূর্যের উদয়ান্ত শোভা দেখবার জন্যে যাত্রীরা দলে দলে সমাগত হয়। তখন পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় নাই। পদব্রজে ওঠানামা শ্রান্তিজনক কিন্তু উপরে গিয়ে সূর্যাস্তের চমৎকার শোভা দর্শনের ফলে সকল শ্রান্তি দূর হয়। Switzerland এর পার্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর। গিরি সরোবর

সম্মিলিত চমৎকার শোভা। সেখানকার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট মূর্তি নয়—তারা অশ্রুভেদী দেব-আত্মা ভীষণ দর্শন নহে—সে গিরিশ্রী অনারূপ, যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত আয়তনের ভিতর—ঘরের জিনিস। ও-দেশের ধ্বলাগিরি হচ্ছে Mont Blanc সেও ‘সত্যত ধ্বলাকৃতি বিশাল অটল।’ তার অধিত্যকায় শামুনি গ্রামে আমরা কয়েকদিন বাস করি—সেই গ্রাম হ’তে পর্বতের তুষারমাণ্ডিত গাঠ দিয়ে ওঠানামা করে মনের সাথে বেড়িয়ে বেড়াই।

শামুনি হ’তে সেই গিরিরাজের সম্মুখীন হয়ে কবি কোলরিজের স্তব মনে পড়ত—

“O dread and silent Mont !
I gazed upon thee
Till thou still present to the
Bodily sense
Did’st vanish from my thought
Entranced in prayer
I worshipped the Invisible alone !”

হে গিরিরাজ, তোমাকে ভুলিয়া সেই অমর্তের ধ্যানে মগ্ন হইলাম

শেষে স্মিটারে করে Lucerne সরোবরের উপর পরিভ্রমণে আমাদের ভ্রমণের পালা লাগে হ’ল। রুরোপের মস্তক্ষেত্র হ’তে আবার আমরা ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্তন করলুম। বাড়ী গিয়ে আমার এই জয়বার্তা ঘোষণা করবার জন্য মন ছটফট করছে কিন্তু এই গেল প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য আর এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। সে বৎসর লন্ডনে University Hall-এ সেই পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনার সময় কেটে গেল। সেও এক ছাত্রাবাস কিন্তু প্রথমোক্ত পঞ্জীতে আমরা যে-ভাবে ছিলাম এখানে তা হ’তে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব। যিনি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি নিলিপ্তভাবে দূরে দূরে থাকতেন—তার সঙ্গে খাবার টেবিলে যা আমাদের দেখা হ’ত। আমাদের সব নিজের নিজের গোছগাছ করে নিতে হ’ত। দু’একটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখন কেবল একটির নাম (Schwanne) দেখতে পাই, যিনি এক্ষণে প্যারিসের মেম্বর। দ্বিতীয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমার দেশে ফেরবার সময় এল। তখন আমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির আশীর্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম। মনোমোহন ‘মস্তের সাধন কিম্বা শরীর পতন’ পণে সে দেশেই পড়ে রইলেন। কবির আশীর্বাদ—

সুরপুরে সশরীরে, শূরকুলপতি
অজর্ন, স্বকাজ যথা সাধি পূণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমনি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী।
ধন্য ভাগ্য, হে সুভাগ, তব ভবতলে !
যাও দ্রুতে, তরি
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গ যাবেন সুন্দরী
বংগলক্ষ্মী। যাও, কবি আশীর্বাদ করে !*

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের কাছে আমরা অল্প সময়ই থাকতুম। একালে যেমন পিতাপুত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে মেলামেশা দেখি, তখনকার কালে

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত—চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

তেমনটি ছিল না, ছোটরা বড়দের অন্ত্যস্ত সমীহ করে চলতো। আমাদের যা কিছু আমোদ আহ্লাদ মেলামেশা সে পিতার পারিষদবর্গের সহিত, তাঁদের কাছেই মনখুলে কথা কবার সুযোগ হ'ত।

দেবেন্দ্রসভা

দেবেন্দ্রসভার নানা লোকের সমাগম ছিল, তার মধ্যে কতকজন খাস-দরবারের লোক। আম-দরবারে যে সব লোক যাওয়া আসা করত তাদের কথা পাড়বার আবশ্যক নেই। একমাঠ বলে রাখি যে, এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবণিক শ্রেণীর লোক। এখন আর সে দলের লোক দেখতে পাই না— এমন হ'তে পারে যে, এক্ষণে কাণ্ডন-দেবতার আরাধনায় মগ্ন থেকে তাঁরা আর উচ্চতর সাধনার সময় পান না। যে সকল লোক এক সময়ে দেবেন্দ্রসভার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের দূর চারুকনের কথা বস্ত্রেই যথেষ্ট হবে।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত—ছোট মানুষটি কিন্তু তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর মাথায় কতরকম 'speculation' খেলত কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারতেন না। আজ চায়ের ব্যবসা, কাল বই, পরশু কাপড়—তাঁর কথা শুনলে মনে হ'ত এবার বুদ্ধি সোনার কাটি হাতে পেয়েছেন—যাতে ছোঁয়াবেন সোনা ফলবে। শেষে দেখা যেতো কোনটাতেই তাঁর মনোমত ফললাভ হ'ল না।

আর এক ছিলেন রাজা কালীকুমার; জাতিতে স্বর্ণবণিক, হুটপট্ট, শূচিবাইগ্লস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধূয়ে খেতেন। তিনি পারস্য সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন—তাঁর সহচর একটি মদসজ্জমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তাঁর ফারসী বয়েৎ আওড়ানো মনে পড়ে— একটি স্তোত্র মনে আছে, তা এইঃ—

তু জ্ঞান পাক-অব সর্বসর্ বে আব খাক, অয়ি নাজ্জনি
(তুমি প্রাণ, পবিত্র সর্বশঃ না আপ মাটি, হে প্রিয়তম)

বল্লা জ-জী হম্ পাকতর রুহে ফদাক- অয়ি নাজ্জনি
(ও আল্লা প্রাণ হ'তেও পবিত্র আত্মায় লীন হে প্রিয়তম)

তুমি প্রাণ, তুমি ওহে পূর্ণ পদ্যময়,
প্রপঞ্চ অতীত তুমি, ওহে প্রিয়তম।
প্রাণ হ'ত পদ্যতর তুমি হে মহেশ,
একাত্মা তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম॥

বড়দাদা রাজার নাম রেখেছিলেন 'সম্ভাগ বিলাস'।

সম্ভাগ বিলাস নামে মাংসের টিবি
মধ্যে শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি জীবী।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনবাবু ছিলেন দেবেন্দ্রসভার বিদূষক। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাস্য পরিহাস করতেন। আমাকে ডাকতেন 'পক্ষী' বলে। তিনি কখনো কখনো আমাদের কোন মিষ্টাশয়ের ভাগ দিচ্ছে বলতেন—

অর্থ রুটি যদি খায় ঈশ্বরের জন
তাহার অর্থেক করে অন্যে বিতরণ।

কত পাগলামী ছড়া আওড়াতে সব মনে নেই। দু-একটা বলি—

অজসা গরসা

দুই সাপ—এই কালীদমনের দুই সদাঁর রাম ও শ্যাম—

ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোমাদের কার্য
তোমাদের কার্য সকলের অনিবার্য

যখন তোমরা গিয়া চড় যার ঘাড়ে

অঙ্গসা গরসা আদি সব তারে ছাড়ে।

অঙ্গসা গরসা যেন ছাড়ল, এখন রামশ্যামের হাত থেকে রক্ষা করে কে?

সাপ ও বেঙের কথোপকথন

সাপ—“জিহ্বা লিড়ি বিড়ি সিড়ি কিচিড়ি মিচিড়ি করি কুপ—”

(আমি যদি কুপ করে তোকে খেয়ে ফেলি?)

বাঙ—“হম্ যদি পানিমে ডুব গয়া ভুসম ভুসড়ি খায়া গুজাড়ি মুজাড়ি করি গুপ—”

(আমি যদি গুপ করে জলে ডুবে যাই?)

নবীনবাবু চার রকম ভিন্ন প্রকৃতি লোকের কথা বলতেন—

বেগবেগা, বেগচেরা, চেরবেগা, চেরচেরা। স্মরণশক্তির তারতম্যে এই চার রকম লোক হয়।

বেগবেগা,—যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায়;

বেগচেরা,—যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে;

চেরবেগা,—যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায়;

চেরচেরা,—যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে।

এর মধ্যে অবশ্য বেগচেরা হওয়াই প্রার্থনীয়। তার নীচে চেরচেরা। চেরবেগাই অধম।

উপরে নবীনবাবুকে বিদ্যুৎকল্পেই চিত্রিত করে দেখান গেল, কেননা তাঁর ঐ দিক্‌টাই আমাদের চোখের সামনে থাকত; কিন্তু তা ছাড়া আর আর দিকেও তিনি ব্যাখ্যানযোগ্য। সাহিত্য-সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। কেবল আমাদের ঐ বয়সে তাঁর বিদ্যা-সাধ্যের সর্বাঙ্গীণ মর্যাদা আমরা বুঝতে পারতুম না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভাব গ্রহণ করেন ও দক্ষতাসহকারে কয়েক বৎসর সেই কার্য সম্পাদন করেন। তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন তখনকার অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হ'ত। ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীতে তাঁর বিশেষ ব্যাপ্তি ছিল এবং বিশ্বকোষের পাতা উল্টে দেখলে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেকগুলি লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, সেই সময় থেকে আমাদের বড়ী তাঁর যাওয়া আসা। এই কার্যে নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ আমার পিতার আত্মচরিতে যা লেখা আছে তা এই:—

“আমি ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যিক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বিহঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন কবিতো পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়-বাবুকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন বচনার সৌন্দর্য তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোক-হিতকর স্ত্যানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্বপ্রথমে সে অভাব পূরণ করে।”

অক্ষয়বাবুর একটা উঁচু standing desk ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন—“ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাশ্য ব্যাপার।”

তখনকার কালে অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন। যখন তাঁরা সেই ভাষা গড়ে তুললেন তখন তা সংস্কৃতবহুল হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু “উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তাঁরা বাঙ্গলাকে যে পরিচ্ছদ পরালেন তা সংস্কৃতের অলংকারে পরিপূর্ণ হ’ল। অক্ষয়বাবুর লেখার এক নমুনা আরম্ভে দিয়েছি, আর একটি নমুনা এখানে দিচ্ছি, তা হ’তেই এ কথার যথার্থ্য সপ্রমাণ হবে।

সুদর্শোদয়ের বর্ণনা

“অনন্তর বিশ্বলোচন তিমিরমোচন তরুণ বিভাকর, যবাকুসুম-সদৃশী আশ্চর্যময়ী মহীয়সী মূর্তি ধারণপূর্বক, পূর্বদিকস্থিত সুরাগ-রঞ্জিত প্রবাল-মণ্ডিত সুদৃশ্য প্রাসাদ হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজাল বিকীর্ণপূর্বক, নব-পল্লব-পরিবেষ্টিত সমুদ্রতট তরুণীশাখা সকল অতি মনোহর হিরণ্ময় মৃকুটে ভূষিত করিতেছে এই আশ্চর্য দর্শন দর্শন করিয়া ইত্যাদি।”

“১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত অক্ষয়বাবু সুদক্ষতাসহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে অর্থোপার্জনের কত উপায় তাঁর হস্তের নিকট এসেছে, তিনি তাহার প্রতি দৃকপাতও করেন নাই। এই কার্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক একদিন স্কানালোচনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিতেন না।”

“অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমাগের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারি প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অদ্রাস্ততায় বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারি প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তা ও শাস্ত্রানু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের অদ্রাস্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।”*

বেদোপনিষদ্ ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি হয় মহর্ষির ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অদ্রাস্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহুপ্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিতার আশ্রয়িত্যে এই বিষয়ে তাঁর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—“প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না, তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ্ ধরিলাম, কি দুর্তীর্ণ! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আশ্রয়প্রত্যয়-সিদ্ধ স্ত্রানোদ্ধলিত বিশুদ্ধ হৃদয়েই তাহার পত্তন ভূমি।” * * * “উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্যের নহে, যেহেতু সমস্ত খনিতে কিছু স্বর্ণ হয় না।

* রামতনু লাহিড়ী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নিগত করিয়া লইতে হয়।”

অক্ষয়বাবুর শেষ জীবনের কথা শাস্ত্রীমশায়ের বই থেকে এইখানে বলে এ ভাগ শেষ করি—

“ইহার পরেও অক্ষয়বাবু কয়েক বৎসর কার্ষক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধ্যে নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংগ্রহ একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময়ে মস্তিষ্কে একপ্রকার অভূত-পূর্ব জ্বালা হইয়া লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। তদবধি সে লেখনী অর ধারণ করিতে পারেন নাই।”

“ইহার পরে একপ্রকার জীবনমৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি, তাহার ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সঙ্কলিত। তাহার মূখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে সুস্থিতি সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মূখে মূখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া যাইত; এইরূপ করিয়া এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।”

ধন্য তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়। এই গ্রন্থখানি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তিরূপে বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।

এইরূপে যখন তিনি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হইয়া পড়লেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমি কাশীপুরে গঙ্গার ধারের এক বাগানে মাস দুই কাটিয়েছিলাম। কি পরিবর্তন! আগেকার সেদিন আর নাই, সে স্মৃতি, সে উৎসাহ নির্বাপিত হয়েছে—সে অক্ষয় আর নাই। শরীরে তৈল মর্দন, ওজন করে ঔষধ সেবন, মাপ জোক করে আহ্বারের ব্যবস্থা—এই প্রকার শরীর সেবাতেই দিনযাপন করতেন। সেই প্রখর স্ত্যনোজ্জ্বল চিত্ত সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

“জীবনের অবসানকালে তিনি বালিগ্রামের গঙ্গাতীরবর্তী এক উদ্যান-বাটীতে থাকিয়া এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন: এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনা ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠে তাহার দেহান্ত হয়।” ২০৭—২০৮ পৃঃ

দেবেন্দ্রসভার সভাসদ আরো অনেক ছিলেন, তাঁদের কথা বলবার আব প্রয়োজন নাই। একবার আমরা বাবামশায়ের সঙ্গে এই সব দলবল নিয়ে বরাহনগরে একটি উদ্যানে কিছুদিন যাপন করেছিলাম। সে সুখের দিন আমার স্মৃতিপটে চিত্রিত আছে। রাজা কালিকুমাৰ ও পরিজনবর্গের আরো অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। পিতৃদেব এই দলবলে বেষ্টিত হয়ে একটি ধবল প্রস্তরাসনে বসতেন, তাঁর বর্ণনা বড়দাদার একটি কবিতায় আছে—

শূদ্রমূর্তি কাস্তিমান,
উন্নত শরীর সুগঠন,
বেষ্টিত স্বজনগণে,
ধবল প্রস্তরাসনে,
বসিয়া ব্রহ্মর্ষি তপোধন।

সংসার দুর্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত তাহার উপরে করে জোর।
অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়,
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়॥

এখানে আমার জীবনস্মৃতির এই একপালা সাঙ্গ হ'ল। এখনো পাঠকদের কাছ থেকে 'আমার কথাটি ফুরলো' বলে বিদায় নেবার সময় হয়নি, পরে আর এক ভাগ আরম্ভ করা যাচ্ছে।

গ্রন্থ পরিচয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ বাংলাদেশে প্রথম আই-সি-এস হিসাবেই পরিচিত। মহর্ষির কৃতীপুত্র, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ মোটামুটি এইটুকু পরিচয়ই আজকের বাঙালী পাঠকসমাজে তাঁর অবশিষ্ট আছে। তাঁর অন্যান্য পরিচয় বিশেষ করে তাঁর সাহিত্যসেবার পরিচয় আজ বিস্মৃত। তার কারণ প্রধানতঃ বোধহয় এই যে, তিনি কাব্য ও নাট্য রচনায় হাত লাগান নি। তিনি কবি বা নাট্যকার কোনটাই নন। নিছক প্রবন্ধকারকে বাঙালী মনে রাখবে এ আশা প্রায় দুরাশা। কারণ শব্দ প্রবন্ধ লেখাও যে সাহিত্যসেবা বলে গণ্য হতে পারে এ ধারণা এখনও বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের মনে দৃঢ় নয়। শ্বিতীয়তঃ, তাঁর গ্রন্থাবলী বহুকাল অমুদ্রিত আছে। আধুনিক কালের পাঠকেরা সেগুলির সঙ্গে পরিচিত নন। শ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতির্সেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য ও নাটক রচনার মধ্য দিয়ে কিছু রসের জোগান দিতে পেরেছেন বলেই আজকের পাঠকেরা তাঁদের সম্বন্ধে ক্ষীণ উৎসাহ কখনো কখনো প্রকাশ করেন—সমালোচকেরা তাঁদের সম্বন্ধে কখনো বা দু-একটা প্রবন্ধও লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ চিন্তার জগতেই বিচরণ করেছেন, তাঁর মননশীল ব্যক্তিত্ব শর্মালোচনা, ইতিহাস ও সমাজ-সম্পর্কিত বিষয়েই প্রকাশের পথ পেয়েছে।

'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' ১৯১৫ সালের অগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। ছুটিকার তারিখ আছে ৬ই অগস্ট। শ্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়, উৎসর্গের তারিখ ৫ই অগস্ট। সত্যেন্দ্রনাথ চলিত ভাষাতেই এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছুটিকা ও উৎসর্গ-পত্রটি উদ্ভূত হ'ল।

ছুটিকা

'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' সমস্তটাই ভারতী পত্রিকার প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে বাহির হইয়াছে, এইক্ষণে এই দুই খণ্ড একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে আমার বাল্যজীবন কাহিনী বর্ণিত, শ্বিতীয় খণ্ডে আমার সিবিএল সার্ভিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্যন্ত বিবৃত এবং সেই সঙ্গে বোম্বাই মহারাজ ও সিন্ধুদেশের ইতিহাস, পারস্য জাতি, জৈন স্বামী নারায়ণ প্রভৃতি গুরুজ্ঞাতের ধর্মসম্প্রদায়, আর্থসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিবরণ অল্পবিস্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সকল লেখার ভাষা সম্বন্ধে আমার দুই-একটি কথা বলিবার আছে। বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে নানা মতের নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কল্পিত ভাষার ব্যবহার নানা কারণে দুঃখ বিবেচনা করেন, আবার 'বীরবল' প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন যাহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন মত এই দুই প্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয় বিষয়ের ভারতম্য অনুসারে ভাষারও ভারতম্য আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক ভাষাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। পাঠকবর্গ এই তর্কের মীমাংসা করিবেন। আমি গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিচারাসনে আনিয়া এখনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রাঁচী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ই অগস্ট ১৯১৫

উৎসর্গ

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

স্নেহের ভগিনী!

তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপদুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি—তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তা ছাড়া আমার বোম্বাই কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত; তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাতে যে সকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সদুপরিচিত। কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস-কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায়? তাই ভাই কারণে এই কথামালা সেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায়? তাই ভাই এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

তোমার স্নেহদ্বা।

রাচী

৫ই অগস্ট ১৯১৫

এখানে আমরা কেবল 'আমার বাল্যকথা' অংশ পুনর্মুদ্রিত করলাম। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে যে সব তথ্য এখনে আছে তা নানাদিক থেকে রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকদের অতি প্রয়োজনীয়। যে সময়ের কথা জীবনস্মৃতিতে নেই সেই সময়ের কথায় এই লেখা ভরপুর। এর একটা নিজস্ব রস আছে, পাঠক সহৃদয় হলে তার আশ্বাদ পেতে বিলম্ব হবে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১লা জুন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৫৭ সালে হিন্দু স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন। ১৮৫৯ সালে জ্ঞানদানলিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই সময়েই তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজে আকৃষ্ট হন। এই বছরেই তিনি মহর্ষির সঙ্গে সিংহলে যান—সিংহলে ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রবন্ধে সেই ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

১৮৬২ সালে মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে তিনি বিলাত গেলেন। ১৮৬৪ সালে পরীক্ষায় সাক্ষ্যল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। দ্বারকানাথের বেলগাঁছিয়া ভিলায় তাঁর এক সম্বর্ধনা সভা হয়, সেখানে বিদ্যাসাগর, রৈভারেন্ড কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আমোদাবাদে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কলকাতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ, হিন্দুসেলার আয়োজন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর অবসর-জীবন ব্যায়ত হয়। ১৯২০ সালের ৯ই জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

এই লেখাটি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয় অনুমতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

শেজপীয়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যখন বালক তখনই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষের মনের সিংহাসনে শেজপীয়ার রাজত্ব করছেন। জীবনস্মৃতিতে তিনি তখনকার সাহিত্য-দেবতা হিসাবে মিলটন বামরন ও শেজপীয়ারের নাম করেছেন। যখন বাঁধাধরা পড়ায় মন লাগে না তখন ম্যাকবেথের গল্প শোনে আর সেই গল্প শুনে ম্যাকবেথের কিছু, কিছু অনুবাদও করেন। অবশ্য গৃহশিক্ষকের শাসনই এই অনুবাদের পিছনে কার্যকরী হয়েছিল সে কথা জীবনস্মৃতিতে বলেছেন। সেই অনুবাদ পরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁর বহু লেখায় শেজপীয়ারের উল্লেখ করেছেন। প্রধানতঃ সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েই শেজপীয়ারের নাটক থেকে বিভিন্ন চরিত্রের এবং ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। মালিনীর ভূমিকায় এ কথাও স্পষ্টই বলেছেন যে শেজপীয়ারের নাট্যাদর্শই আমাদের আদর্শ।

শেজপীয়ারের টেম্পেট নাটক ও কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শকুন্তলা নাটকের আবেদন আরও কিস্তি, প্রকৃতির সঙ্গে যোগ আরও নিবিড় এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্যে হৃদয়বেগের প্রবলতা তিনি বরাবর লক্ষ্য করেছেন। ভাবের যে শান্ত পরিণতি ভারতবর্ষীয় কবির কাব্যের বিশেষ গুণ তার অভাব পাশ্চাত্য কাব্যে আছে। সেখানে হৃদয়ানুভূতির ঝোড়ো অববেগ মানব-জীবনের উপরে প্রবলভাবে আছড়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ এই আবেগোচ্ছলতার দিকটি ইংরাজী সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা বলে মনে করেছেন। কুমারসম্ভবের কাহিনী বিশ্লেষণ করতে গিয়েও তাঁর মনে হয়েছে কোন ইংরাজ-কবি পার্বত্যের প্রত্যাখ্যানের বেদনার মধ্যেই কাব্য শেষ করতেন। হয়তো রাজসভা থেকে বিতাড়িত শকুন্তলাই শকুন্তলা নাটকের শেষ ছবি হয়ে আমাদের মনে জেগে থাকতো।

শেজপীয়ারের চতুঃশতাব্দীবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শেজপীয়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখ-সংকলন আমরা প্রকাশ করলুম। এ সংকলন সম্পূর্ণ নয়, আরও বহু উল্লেখ এখানে-সেখানে ছাড়িয়ে আছে। কিন্তু মোটামুটি সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সব উল্লেখ তা সংকলিত হয়েছে। শেজপীয়ার বা তাঁর কোন নাটক বা কোন চরিত্র সম্পর্কে কোন উক্তি থাকলেই সে অংশ সংকলিত হয়েছে। এই উক্তিগুলি প্রমাণ করছে রবীন্দ্রনাথ কত গভীর-ভাবে শেজপীয়ারকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই জীবনকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের ব্যাপক মানবতাবোধ দিয়ে। কি গভীর আসক্তি নিয়ে তাঁরা জীবনকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কোন কিছু তুচ্ছ মনে হয়নি। মনের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন একগোষ্ঠীর মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ও শেজপীয়ার সম্বন্ধে অধ্যাপক ডারকনাথ সেন এই দুই জীবনশিল্পীর সম্পর্কটি তাঁর অসাধারণ সন্মালোচনার মধ্যে ফুটিয়েছেন। (সাহিত্য একাডেমীর রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বৃহৎ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

অধ্যাপক সেনের এই বিশ্লেষণ প্রমাণ করছে রবীন্দ্রনাথ শেঞ্জপীয়ার সম্বন্ধে এত উৎসাহী ছিলেন কেন। মনের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন একগোষ্ঠীর মানুষ। ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায় কোন কিছুকেই জীবনের বিরাট পটভূমিকায় তাঁরা তাক্য বলে মনে করেন নি। এই ব্যাপ্ত বিস্তৃত জীবনবোধ দুই দেশের দুই কালের এই মহাশক্তিশালী প্রণীদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করেছে।

সাহিত্যের পথে

(১)

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিশ্চয়তার কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্য দেয়, নইলে ওথেলো নাটকে কেউ ছুঁতে পারতো না।

(সাহিত্যের পথে ॥ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা)

(২)

রোমিয়ো জুলিয়েটকে যখন সাহিত্যভুবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্ক তাদের কত টাকা জমা আছে, ষড়দর্শনে তাদের বদ্ব্যপ্তি কতদূর, এমন-কি দেবদ্বিজে তারা ভক্তিমান কিনা এবং নিত্যানিয়মিত সম্ম্যাহিকে তাদের কি পরিমাণ নিষ্ঠা। তারা সত্য এই মাত্র তাদের মহিমা, সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে।

(সাহিত্যের পথে ॥ সৃষ্টি)

(৩)

আমাদের দেশে একপ্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোন মানবচরিত্র বলেন, শকুনির মতো অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়োগার অহৈতুক বিশ্বেষবদ্ব্যম্বর সঙ্গে সঙ্গে মহদগুণ থাকা উচিত ছিল...সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোন তর্কই গ্রাহ্য নয়—কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ।

(সাহিত্যের পথে ॥ সাহিত্যতত্ত্ব)

(৪)

শেঞ্জপীয়ারের রচিত ফলস্টাফ একটি বিশিষ্ট মানুষ সম্ভেদ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেঞ্জপীয়ারের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফলস্টাফ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরী নয়, কল্পনার রসে জারিত করে তার সৃষ্টি; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এই জন্য তাতে আমাদের আনন্দ।

(সাহিত্যের পথে ॥ সাহিত্যের তাৎপর্য)

(৫)

মাইকেল সাহিত্যে যে যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি কত যুবক ইংরেজি-সাহিত্যের সৌন্দর্যে ভাববিহীন। শেঞ্জপীয়ার, মিলটন, বায়রন, মেকলে, বার্ক তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা।

(সাহিত্যের পথে ॥ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ)

(৬)

আত্মচেতনার অনুভূতি আমরা ধ্বঞ্জি—এই অনুভূতি সর্বদাই আনন্দময়। আমি বলছি, মানুষের সর্বপ্রকার অনুভূতিই আনন্দময়। দুঃখের, বেদনার, ভয়ের অনুভূতি, কোনটাকেই বাদ দিয়ে বলছি না। ধরা যাক ভয়ের অনুভূতি। কোন্‌খানে এটা অসুখকর? না, যেখানে এর সঙ্গে ক্ষতি বা অনিশ্চয়ের আশঙ্কা জড়িত...যরের পাশে যদি খুন হয় অনিশ্চয়ের আশঙ্কায় আমরা পল্লিশ ডেকে বসি, কিন্তু ওথেলো যেখানে ডেসডিমোনার প্রাণ নিল সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই, বেদনার তীব্রতা সেখানে আমাদের প্রোঙ্কল অনুভূতির দীপ্ততাজে সমস্ত চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে। হ্যামলেট নাটকের গভীর নৈরাশ্য বেদনার মধ্য দিয়েই তার পূর্ণ সার্থকতা, যদি ওই নাটকের দুঃখভার কমিয়ে সুখের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ঘটনা দিয়ে ভরিয়ে তোলা যেত আমাদের আনন্দ কি বাড়ত।

(সাহিত্যের পাঠে ৥ রূপকার ৥ পারিশিষ্ট ৫)

প্রাচীন সাহিত্য

(৭)

নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্সপীয়র বলিয়া গেছেন—গোলাপকে যে-কোন নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে; কারণ গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ।... কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে।

(প্রাচীন সাহিত্য ৥ কাব্যে উপেক্ষিত)

সাহিত্য

(৮)

শেক্সপীয়রের 'অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা' নাটকের যে মূল-ব্যাপারটি তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত সুযোগ্য লোক কুহকিনী-নারীমায়ার জালে আপন ইহকাল পরকাল বিসর্জন করিয়াছে। এইরূপ ছোটোখাটো মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় ভাবনাশেষে সংসারের পথ পরিকীর্ণ।

আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়ীলীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রংগভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদবিলম্বের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিলম্বের মেঘাভ্রম্বর, প্রেম-স্বপ্নের সঙ্গে এক বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিওপেট্রার বিজ্ঞানসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারশৃংগধ্বনি তাহার সঙ্গে একসূরে মিলিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্মারক দুরঙ্গ ও বৃহৎ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐতিহাসবস্তা মমসেন পণ্ডিত যদি শেক্সপীয়রের এই নাটকের উপর প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবতঃ ইহাতে অনেক কালবিরোধ-দোষ (anachronism) অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম বাহিব হইতে পারে। কিন্তু শেক্সপীয়র পাঠকের মনে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন ভ্রান্ত বিকৃত ইতিহাসের দ্বারাও যে-একটি ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।

(সাহিত্য ৥ ঐতিহাসিক উপন্যাস)

(৯)

তুমি বলেছ সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেক্সপীয়ারের নাটককে কী বলবে। সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া অসম্ভব, অতএব একটু খোলসা করে বলি।

...শেক্সপীয়ারের অনেকগুলি সাহিত্য-সম্মতানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্সপীয়ারের আত্মপ্রকৃতির কোন অংশ নেই তা আমি শীঘ্রকার করতে পারি নে। সে রকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃঅংশ হতে বিচ্যুত হতে হয়। ভালো নাট্যকার্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।

অন্তরে বাহিরে এইরকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা ও সুক্ষ্ম-বিচার শক্তি-বলে কেবল রস্কোকো প্রভৃতির নয় মানবচরিত্র ও লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়। কিন্তু শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সম্মীলিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতুরস পান করে-ছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল, নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হতো। অতএব একহিসাবে শেক্সপীয়ারের রচনাও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।

.. যিনি যাই বলুন শেক্সপীয়ারের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূল্য ভাবশরীরী শেক্সপীয়ারকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে; যেখান থেকে ইয়োগের প্রতি বিম্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুরূপা, ডেসডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফলস্টাফের প্রতি সর্কৌতুক সখ্য, লিয়রের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কডেলিয়ার প্রতি স্নেহ শেক্সপীয়ারের মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যস্ত ও বিকীর্ণ করছে।

(সাহিত্য ৯ লোকেন পালিতকে লেখা চিঠি)

(১০)

লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাশ্য রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুকরো টুকরো করে না ভেঙে ফেলেবে, আপনার জীবনের দর্শাদিক উন্মুক্ত করে নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে। ততই তার সাহিত্যের প্রকাশ্য পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।...

শেক্সপীয়ারের লেখার ভিতর থেকে তার একটা বিশেষ স্বপ্নে বার করা কঠিন এই-জন্যে যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূল তত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বন্ধ করা যায় না। এইজন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রক্তবিন্দু-ঐক্য নেই।...

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই, সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাচ্ছেঁড়া তত্ত্ব চাইনে, মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই: তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মতো। কিন্তু এই হাসিকান্না অনুরাগ বিরাগ কোথা থেকে উঠছে? ফলস্টাফ ও ডগবেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র হামলেট পর্যন্ত শেক্সপীয়ার মানবলোক সৃষ্টি করেছেন সেখানে মানুষের হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারুর অগোচর নেই। একটা সোসাইটি-নভেলের প্রাত্যহিক

কথাবার্তা এবং খুঁচরা হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেকসপীয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জ্ঞান আঙ্কের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হইবে, শেকসপীয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব সোসাইটি নভেল যতই চিত্রাবচিত্র করে রচিত হোক, তার ভাষা এবং রচনাকৌশল যতই সর্বাঙ্গাসম্পূর্ণ হোক, শেকসপীয়রের একটি নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাইটি নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেকসপীয়রে বর্ণিত প্রতিদিনদুল্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হলে সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেকসপীয়রে আমরা চিকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মূর্খের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেকসপীয়র তাঁর সমস্ত মনুষ্যকে অবিরত করে দিয়েছেন।

(সাহিত্য ॥ সাহিত্যের প্রাণ)

(১১)

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সম্মিলিত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেকসপীয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করিনে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি।

(সাহিত্য ॥ সাহিত্যের প্রাণ)

(১২)

পূর্ণ মনুষ্যের সংস্পর্শ সচরাচর কোথায় পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি। . . মানুষ সামনে উপস্থিত হবামাত্রই আমরা এমনি সহজে স্বভাবতই আত্মসংবৃত্ত হয়ে বসি যে, একটা গুরুতর ঘটনার দ্বারা অকস্মাৎ অভিভূত না হলে কিংবা একটা অতিপ্রবল আবেগের দ্বারা সর্ববিস্মৃত না হলে আমরা নিজের প্রকৃত আভাস নিজে পাইনে। শেকসপীয়রের সময়েও এরকম সর্ব আকস্মিক ঘটনা এবং প্রবল আবেগ সচরাচর উদ্ভব হতে পারত এবং বিদ্যুৎ আলোকে মানুষের সমগ্র আগাগোড়া একপলকে দৃষ্টিগোচর হতো;...সাহিত্যের মধ্যে শেকসপীয়রের নাটকে জর্জ এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্য মন্ডলিলাভ করে দেখা দেয়। সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এই জন্যে শেকসপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়, কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জেলা অশ্লীল; কেননা তা আংশিক অনাবরণ।

(সাহিত্য ॥ মানবপ্রকাশ)

(১৩)

শেকসপীয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক-একটা অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের অস্তিত্বের প্রবেশ করে সূক্ষ্ম মানুষকে দেখতে পাই। সচেতন হলেই চির-অভ্যাস-রূমে সে লুকিয়ে পড়ে।

(সাহিত্য ॥ মানবপ্রকাশ)

(১৪)

সৌন্দর্য প্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। হ্যামলেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি, ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

(সাহিত্য ॥ মানবপ্রকাশ)

সাহিত্যের স্বরূপ

(১৫)

গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় সুন্দর কথাটা নিরে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা কোনো উপাচার্য আণ্ডাভামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধৌকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। ...দেখতে পাই ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই। লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে।

(সাহিত্যের স্বরূপ)

(১৬)

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহু দূরে লম্বন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরাজী শেখা পাঠকেরা মিলটন শেকসপীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

(সাহিত্যের স্বরূপ ॥ কাব্য ও ছন্দ)

(১৭)

উপস্থিত মতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপর কোন মত জাহির করেন তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুস্কাকারের ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই; তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে; গ্রাহের গতিক কখনও যায়, কখনও যায় না। সমালোচনার এই অমৃদব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেকসপীয়রও নিষ্কৃতি লাভ করেননি।

(সাহিত্যের স্বরূপ ॥ সাহিত্যবিচার)

(১৮)

সাহিত্যের মধ্যে মানবের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে আরই মধ্যে বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেকসপীয়রের লুক্সিস এবং ভিনস অ্যান্ড অ্যান্ডানিসের কাব্যের স্বাদ আমাদের মধ্যে আজ রুচিকর না হতে পারে সে কথা সাহস করে বলি বা না বলি; কিন্তু লেডী ম্যাকবেথ অথবা কিং লিয়র অথবা অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তা হলে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেকসপীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার স্বারোচ্ছাটন

(সাহিত্যের মূল্য ॥ সাহিত্যের স্বরূপ)

(୧୬)

(নরনারী ॥ পঞ্চদ্বিত)

(२०) .

(নরনারী ॥ পশুভূত)

(୨୨)

(কৌতুকহাস্য ॥ পঞ্চভূত) .

(੨੨)

(কৌতুকহাস্যের মাত্রা ॥ পঞ্চভূত)

জীবনস্মৃতি

(২৩)

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না।

(জীবনস্মৃতি : কবিতা রচনারম্ভ)

(২৪)

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইংস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলার মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলাছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে।

(জীবনস্মৃতি : ঘরের পড়া)

(জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে আছে—“সেই অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেক দিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।” দ্রষ্টব্য : তথ্যপঞ্জী জীবনস্মৃতি শতবার্ষিকী সংস্করণ)।

(২৫)

যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজী সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য দেবতা ছিলেন শেকসপীয়র মিলটন ও বায়রন। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে জ্বিনিসটা আমাদের খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়বেগের প্রবলতা। এই হৃদয়বেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশী। হৃদয়বেগকে একান্ত আতিশয়ো লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অস্তিত্ত সেই দুর্দাম উদ্ভীপনাকেই আমরা ইংরাজী সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বালাবয়সের সাহিত্য-দীক্ষা-গুরু অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজী কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীর নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিভাষার বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয় দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাহাদের মনের মধ্যে উদ্ভেজনার সঞ্চার করিত।

(জীবনস্মৃতি : ভূদহদয়)

(২৬)

যুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘনুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেশাঁসের যুগ আসিয়াছিল শেক্সপীয়রের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা।

(জীবনস্মৃতি : ভগ্নহৃদয়)

জাভাঘাত্রীর পথ

(২৭)

আধুনিক কালের সিঁথির লোভ প্রকাশ্য প্রবল; তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। যা কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না করে স্পর্শ করে চলে যায়। এখন হ্যামলেটের অভিনয় অসম্ভব হল, হ্যামলেটের সিনেমার হল দ্বিত।

(জাভাঘাত্রীর পথ)

(২৮)

এদের নাচে যুদ্ধের যে রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সে স্ক্রম যুদ্ধ দূরতঃও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোন স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে ছন্দে যুদ্ধ করতে হবে, এমন যুদ্ধ যাতে ছন্দোভঙ্গ হলে সেটা পরাজয়েরই সামিল হয় তবে সেটা এইরকম যুদ্ধই হত। বাস্তবের এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রম্বা বা কৌতুক জন্মায় শেক্সপীয়রের নাটক পড়েও তাদের হাসা উচিত—কেননা, তাতে লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই।

(জাভাঘাত্রীর পথ)

অন্যান্য

(২৯)

মনে আছে এমন তর্ক একদা প্রায়ই শোনা যেত যে আদর্শ সত্যী নারী হিসাবে ভ্রমর এবং সূর্যমুখীর চরিত্রে আধরতি পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য কোন কথায় কোন ভঙ্গী-টুকু নিজে। অঙ্গবরস সত্ত্বেও মনে আক্ষেপ হতো যে অরসিকের রসস্যা নিবেদন ইত্যাদি। সাহিত্য যে শ্রেয়সত্ত্বের নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই করা পদতুল গড়বার কারখানা নয় এ-কথাও কি বোঝাতে হবে? ম্যাকবেথ নাটকে দুটি মাত্র প্রধান পাত্র, ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ। বলা বাহুল্য দুজনের কাউকেই সূক্ষ্মরমিতি পাঠকদের চরিত্রগঠনযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা চলবে না। অ্যান্টনি এন্ড ক্লিয়োপেট্রা শেক্সপীয়রের প্রধান নাটকদের মধ্যে অন্যতম কিন্তু ক্লিয়োপেট্রা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে স্থান পাবার অধিকারিণী হলেও তাকে সাধুর আদর্শ বলা চলবে না আর অ্যান্টনি আপন চরিত্রের অনিন্দ্য আদর্শে আধুনিক উচ্চদের বাংলা নভেলের নায়কদের সমশ্রেণীভুক্ত নয় একথা মানতেই হবে। তথাপি এও না মনে চলবে না যে শেক্সপীয়রের নাটকটি উচ্চদের বাংলা নভেলের চেয়ে অস্তিত্ব কোন অংশে হীন নয়।

(বিচিত্রা, প্রাবণ ১৩৪০ ॥ দুইবোন)

(৩০)

“যে দেশে শেক্সপীয়র জন্মিয়াছে, সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব; ইহা হইতে প্রমাণ, হইতেছে কল্পনামাত্র কবিতা সৃজন করা নয়।”

(বাঙালি কবি নয় কেন)

(৩১)

তিনি (ট্রেভেলিয়ান) আমাকে বললেন এই নাটকে (মালিনী) তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপে দেখেছেন। তার অর্থ কী তা আমি সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে পারিনি কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেকসপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্ত ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।

(মালিনীর সূচনা)

(৩২)

যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে, কখন বা হ্যামলেট রূপে কখন বা ম্যাকবেথ রূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং, অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতি বিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই।

(মেঘনাদবধ কাব্য ॥ সমালোচনা)

(৩৩)

মনে রাখবেন এককালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল—তখন সে সম্পূর্ণ মস্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃদ্ধ সমুদ্র তার শত্রু ফেনা নিয়ে কিং লিয়র-এর মতো ঝড়ে ঝঞ্জায় অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করছে।

(ছিন্নপত্র ॥ ১নং চিঠি)

(৩৪)

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ-এ পাস করিয়া জলপাণি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি একটি বন্ধু যে জোটে না তাহা নহে, কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেগুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোন কোনদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ডিষ্টার হুগার গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেকসপীয়রের জুলিয়াস সীজার মনে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয় উন্মোচনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মত হইয়া উঠিল।

(মাণ্টারমশায়)

(৩৫)

যদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হাস্যবৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তি কোন ইচ্ছিতে প্রকাশ পায়নি এমনতরো অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

(প্রবাসী ১৩৪২ : বৈশাখ। চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ)

(৩৬)

সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে শ্রবণের মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বস্ব, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বখ্যাতিত বইয়ের শিরোনামায় যখনই দেখব 'দ্রষ্টার সম্বন্ধে স্বামীর দ্বন্দ্ব', বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যার ম্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু ওথেলো নাটকের যদি ওই নাম হতো পছন্দ করতুম না। কেননা এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঙ্গনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদই নিই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই।

(বিচিত্রা ॥ 'নামান্তর' ॥ রচনাবলী ৯ ॥ গ্রন্থপরিচয়)

(৩৭)

এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমূখ করিয়া দেন। ...সেকালের ছাত্রগণ বেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্সপীয়র-বাইরনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না।

(সমাজ ॥ পূর্ব-পশ্চিম)

(৩৮)

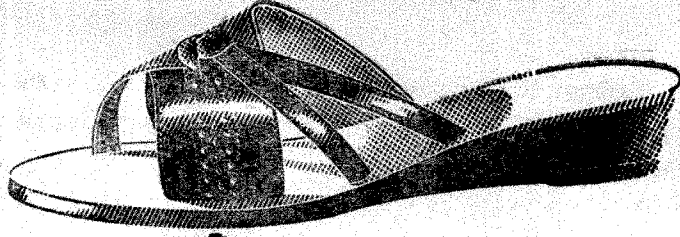
যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি দূর সিন্ধুপারে
ইংলন্ডের দিকপ্রান্ত পেরেছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে; ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন, উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অণ্ডল-অন্তরালে
বনপুষ্প বিকশিত তৃণঘন শিশির উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। স্ববীপের নিকুঞ্জতলে
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসুখবন্দনা সঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে,
নিয়োছে আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিহ্ন উদ্ভাসিয়া; তাই হেরো যুগান্তশেষে
ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শিলাইদহ

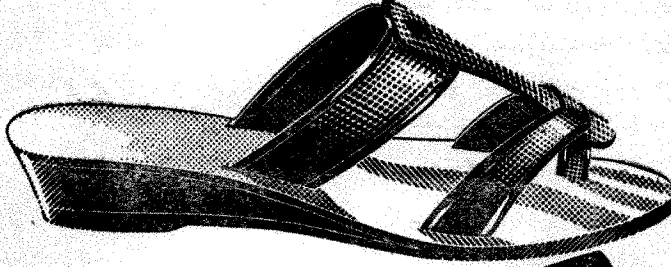
(বলাকা ॥ ৩৯)

১০ অগ্রহায়ণ ১৩২২

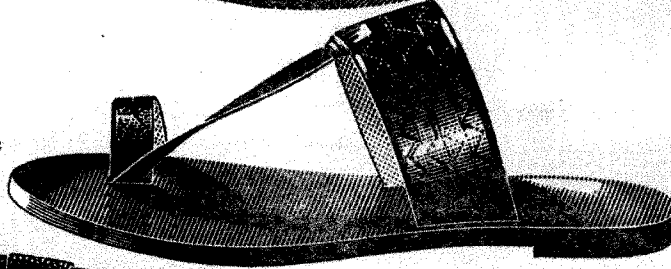
নন্দা ৯.৯৫



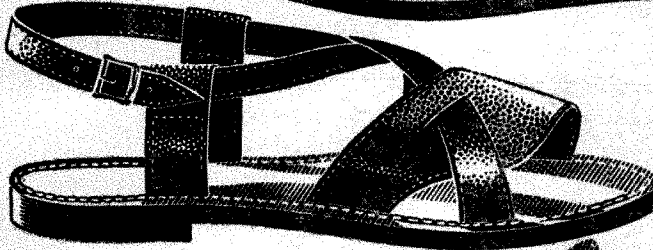
সিতারা ৯.৯৫



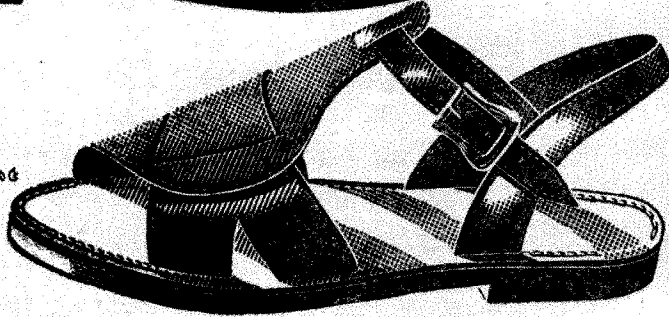
টপলাইন (৬৮) ৮.২৫



সিপ্রা ১০.৯৫



হালিডে ১৭.৯৫



পারবেন চলুন হালকা পারে



বাটা স্যান্ডাল আর বাটা চম্পল পারবেন দিয়েই আপনি খুশি হবেন। নিমেষে জানতে পারবেন এদের বৈশিষ্ট্য কী। এমন আরামদায়ক উপকরণ, নির্মাণশৈলী আর মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

ঠিক মনের মতো জুতোটি খুঁজে পাওয়া পরম তৃপ্তিকর।

Bata

756.3

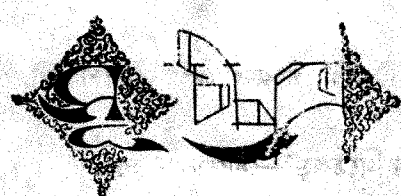
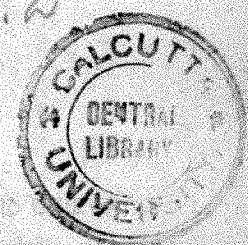
.022/1

V.3 no.2

॥ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ॥

॥ ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥

শ্রাবণ ১৩৭১



রবীন্দ্রনাথ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ ১৯১০	৬০
রাজপত্র—শিশিরকুমার দাশ	৬৫
রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুটি উপমা—শ্রীদেবদাস জোয়ারদার	৬৯
রবীন্দ্র মানসে যুগচেতনার প্রতিফলন—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৭৪
গ্রন্থ আলোচনা—	৮৬

সম্পাদক : সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহযোগী-সম্পাদক : সোমেন্দ্রনাথ বসু

বৈতানিকের পক্ষে সোমেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও লোক-সেবক প্রেস, ৮৬-এ, আচার্য
জগদীশচন্দ্র বসু রোড হইতে মুদ্রিত। মূল্য : ১.০০

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের প্রথম বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যাই

কেবল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষের চারিটি

সংখ্যাই পাওয়া যাবে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১'০০ টাকা

বাৎসরিক মূল্য ৪'০০ টাকা, সডাক ৫'০০ টাকা

রেজিস্ট্রী ডাকে ৭'৫০ টাকা

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ কার্যালয়।

৪নং এলগিন রোড। কলকাতা—২০ ॥

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালার পরিবর্তন।

১। **পুনশ্চ**—অমলেন্দু বসু, ভূদেব চৌধুরী, নীলরতন সেন, রণেন্দ্রনাথ দেব, সোমেন্দ্রনাথ বসু। ১'৫০

২। **স্মৃতিকথা**—সোদামিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ১'৫০

৩। **কড়ি ও কোমল ও মিঠেকড়া**—সোমেন্দ্রনাথ বসু ১'৫০

৪। **আমার বাল্যকথা**—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩'৫০

পুনশ্চ—কাব্যগ্রন্থের অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। বাংলা গল্পছন্দের সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা এই কাব্যে। এই পুস্তিকায় কাব্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি থেকে আলোচনা আছে।

স্মৃতিকথা—ঠাকুর পরিবারের দুই কন্যা ও দুই বধূর রচনা। দেবেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, স্বজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের নিকট ও অন্তরঙ্গ ছবি।

কড়ি ও কোমল ও মিঠেকড়া—কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানবিদ্যারদেব বাল্যকবিতা পুস্তিকার ভূমিকাসহ পুনর্মুদ্রণ।

আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাসের' প্রথমাংশের পুনর্মুদ্রণ। বহুদিন চুস্তাপ্য এই অমূল্য বইটি অল্পমূল্যে আবার সহজলভ্য হলো।

বৈজ্ঞানিক প্রকাশনী

প্রাণ্ডিস্থান

সান্যাল এণ্ড কোং

১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা—১২

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ॥

শ্রাবণ ১৩৭১ ॥

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥

রবীন্দ্রনাথ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ

১৯১৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আমরা আমাদের জাতীয় কবিকে খুঁজে পেয়েছি। আমাদের গৌরব, আনন্দ আমাদের যে, তিনি আজ এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যেরই শুধু উজ্জলতম ব্যক্তিত্ব নন, পৃথিবীর জীবিত শ্রেষ্ঠতম কবিদের একজন। গীতিকবি, নাট্যকার, গল্পলেখক হিসাবে তাঁর বিপুল সাহিত্যের সমালোচনা করার আজ সুযোগ নেই, কিন্তু প্রতিবাদের ভয়কে অস্বীকার করেই একথা বলা যায় যে তাঁর কল্পনার শ্রেষ্ঠতম ফসলগুলি সৌন্দর্য, দেশাত্মবোধ ও অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ। এর একটা চিরকালীন মূল্য আছে, সাময়িকতা ও জাতিগত চিহ্নের দ্বারা তা খণ্ডিত নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও কবিত্বশক্তির গভীরতা উপলব্ধি করতে পারার মত রসিক চিন্তের কাছে তার চিরস্থান আবেদন। কবি হিসাবে তাঁর এই প্রাধাত্যের কথা যদি বাদও দিই একটা কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না—এই প্রথম একটা ভারতীয় ভাষায় নিজের প্রতিভাকে নিয়োগ করে সাহিত্যরচনার জগৎ একজন লেখক বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করলেন। ঠিক এর অল্পকাল পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য হিসাবে মাতৃভাষার যে স্থান ছিল তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রায় তেইশ বছর আগে সিনেটের একজন

অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ সভ্য প্রস্তাব করেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের কোন উপাধি পেতে হলে মাতৃভাষার জ্ঞান গোড়াতেই প্রয়োজন। সিনেটের অন্যান্য সভ্যরা এই নবাগত সভ্যকে তাঁর অনর্গল বাচনভঙ্গীর জ্ঞান সম্মানিত করেছিলেন, তাঁর সাহসকে প্রশংসা জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের জ্ঞানগর্ভতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। একটি আশ্চর্য যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা এই প্রস্তাবকে বাতিল করেছিলেন—সে যুক্তি হলো এই যে, ভারতীয় ভাষাগুলি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ঠরত ছাত্রদের মনোযোগ পাবার যোগ্য নয়। পনেরো বছর পরে সেই অল্পবয়স্ক সিনেট সভ্য পরিণতর বুদ্ধি নিয়ে আবার চেষ্টা করলেন, এবারেও চূড়ান্ত ব্যর্থতাই ঘটলো। পরের বছর সৌভাগ্যবশত: তিনি লর্ড মিস্টার সরকারকে এই ব্যাপারে রাজী করাতে পেরেছিলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকেই স্নাতক অবস্থাতেই মাতৃভাষার সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এই

[গভর্নমেন্ট হাউসে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে ডঃ পল ভিনোগ্রাডফ, ডঃ হারম্যান জ্যাকোবী, ডঃ গিলভার্টা লেভী, ডঃ উইলিয়ম হেনরী ইয়ং, স্যার হেনরী হাবার্ট হেডেন। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। স্যার আগুতোষ মুখোপাধ্যায় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন তাঁর মধ্য থেকে শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অংশটিই উদ্ধৃত হলো। তখন চ্যান্সেলার ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।

আগুতোষ বাংলাভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে যুনিভার্সিটি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে

বিষয়ে তাঁর দক্ষতার পরীক্ষা করতে হবে ঠিক যেমন করে অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা হয় এবং তাঁর ছাত্রজীবনের সাফল্যের একটি প্রধানতম মানদণ্ড বলে গ্রহণ করতে হবে। প্রায় পঁচিশ বছর লড়াই করার পর এই প্রাথমিক সত্য স্বীকৃত হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হলে ভারতীয় ভাষাগুলির দুর্বল দাবীকে অসংশয়ে মেনে নিতে হবে! এই স্বীকৃত নীতির দূরপ্রসারী প্রভাব এখনই শুরু হয়েছে।

কালেই এই গোড়াধেঁষা, গভীর পরিবর্তনের ফল স্পষ্টচিত্তভাবে প্রমাণিত হবে। ইতিমধ্যে তেইশ বছর আগেকার সেই তরুণ সিনেট সভ্য আপনাকে অনুরোধ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে যে ‘ডক্টর অফ লিটারেচার’ এই উপাধিতে ভূষিত করে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাষার জীবনব্যাপী সাধনরত বাংলার এই মহৎ প্রতিভাশালী সম্ভানকে শিক্ষাজগতের স্বীকৃতি দান করুন।

যে বাধা পেয়েছিলেন এখানে তাঁর উল্লেখ করেছেন। বাংলা ভাষাকে পাঠ্যকরার যে যুক্তি বিরুদ্ধ পক্ষ দেখিয়েছিলেন তাঁর অসারতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। দক্ষ সেনাপতির মত আগুতোষ রবীন্দ্রনাথের এই আবির্ভাবকে তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। আরএকটি কথা উপরের ভাষণে লক্ষ্য করবার মতো। বিজ্ঞত সমালোচনায় না গেলেও রবীন্দ্র সাহিত্য যে তৎসাময়িকতার ও জাতিগত চিহ্নের দ্বারা খণ্ডিত নয় এই পরম সত্যবাক্য আগুতোষ বলে গেছেন।]

রাজপুত্র শিশিরকুমার দাশ

রাজপুত্র শব্দটি আমাদের শৈশবের বহু স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো। তার নাম জানি বা না জানি এসে যায় না, শুধু জানি সে রাজপুত্র, সে সুন্দর, সে বীরবান। তার জন্ম রাজবাড়ির সূত্র নেই, হয়ত আছে বিমাতার অবহেলা, কিম্বা অগ্নি কোন লাজনা। তার জন্ম পথে পথে অপেক্ষা করে গুপ্তসূর্য, গুঢ় ফণা। সে রাজবাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে, সাতসমুদ্র তের নদী সে পার হয়, পার হয় ধুধু করা তেপান্তরের মাঠ। তারপর দেখা মেলে ঘুমন্ত রাজকন্যার সঙ্গে। অত্যাচারী পিশাচকে বধ করে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে সে রাজকন্যার ঘুম ভাঙায়। এই রাজপুত্র সবার প্রিয়, সে একটি প্রিয় স্মৃতি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে এই রকম একটি প্রিয় কাহিনীসূত্র হল রাজপুত্র। এই রাজপুত্র তাঁর রচনায় নানাসময় নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে। জানি না এর পেছনে কবিচিন্তের কোন গোপন রহস্যের ইঙ্গিত জড়িয়ে আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বোঁঠাকুরাণীর হাট উপগ্রামটির মধ্যে এইরকম একটি সবার আপনজন যে রাজপুত্র তার আবির্ভাব ঘটল। কাহিনীর রাজা অত্যাচারী, নৃশংস, প্রজাদের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোন যোগ নেই। রাজপুত্র প্রজাদের ভালবাসে, প্রজারা তাকে ভালবাসে। সে প্রাচীন রূপকথার রাজপুত্র নয় ঠিকই—তবু রূপকথার আভাস তার গায়ে লেগে আছে। তার হৃদয় করুণায় ভরা, রূপকথার মতই সে সুন্দর এবং স্বপ্নালু। তবু পার্থক্য এই রূপকথার রাজপুত্র সব দুঃখ, সব বিপদের পরেও

পায় অনন্ত সুখ। এই রাজপুত্রের জীবনে কোন সুখ নেই, শান্তি নেই। সে মাহুশকে ভালবাসে, তাই রাজা তাকে ভয় করে তাকে শেষ পর্যন্ত কারারুদ্ধ করে। রাজপুত্র সেই বন্দী অবস্থায় দিনের পর দিন কাটায়। সে চিন্তা করে—

“জানালার ভিতর আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাথে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে— মনে হয়না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে একদিন খালাস পাইব।”

সংসার হৃদয়হীন। রাজপুত্র উদয়াদিত্যের জীবন সঙ্গিনী সুরমাকে রাজবাড়ির অত্যাচার নিষ্পেষিত করতে করতে শেষপর্যন্ত হত্যা করেছে। রাজার নৃশংসতা উদয়াদিত্যের প্রিয় বোনের সমস্ত জীবনকে নষ্ট করেছে। রাজার হিংস্রতা উদয়াদিত্যের বৃদ্ধ দাছ বসন্ত রায়কে হত্যা করেছে। এই তার জীবন। এই রাজপুত্র আমাদের ভালবাসা পেয়েছে কিন্তু তার জীবন শেষ হয় সুখে নয়, স্বাচ্ছন্দে নয়; ত্যাগে, বৈরাগ্যে।

“রাজপুত্র”র সঙ্গে আবার দেখা হল “রাজা ও রাণী” নাটকে। “বোঁঠাকুরানীর হাট” উপগ্রাম, কাঁচা হাতের লেখা। চরিত্রগুলিও স্পষ্ট রূপ পায়নি। নীহারিকাপুঞ্জের অস্পষ্টতা থেকে যেমন গ্রন্থলোক

স্পষ্ট হয়ে উঠল তেমনি “রাজা ও রাণী”তে এই “রাজপুত্র” স্পষ্ট রূপ ধারণ করলেন। তার নাম কুমারসেন, কাশ্মীরের রাজপুত্র। তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ত্রিচূরের ক্রীড়া কাননে রাজকুমারী ইলার সঙ্গে। প্রেমিক প্রেমিকার সেই অন্তরঙ্গ আলাপনের দৃশ্য সংস্কোচে আশ্বাদন করার বিষয়। ইলা তার প্রেমিককে রেখে দিতে চায় নিজের কাছে কিন্তু বাইরে বৃহৎ পৃথিবীর বৃহৎ কর্মের আহ্বান। রাজপুত্রের হৃদয় সেই বৃহৎ পৃথিবীকে অবহেলা করতে পারেনা। ইলা তাকে নিজের কাছে ধরে রাখতে চাইলেও সে ধরে রাখতে ব্যর্থ। শুধু এইটুকুই বলতে পারে :

যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র
কত ক্ষুদ্র আমি! কী বৃহৎ এ সংসার,
কী উদ্দাম তোমার হৃদয়।

রাজবাড়িতে চলেছে মঙ্গলা। পিতৃব্য চন্দ্রসেন কাশ্মীরের সিংহাসনে বসে আছেন। প্রজারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে কবে কুমারসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হবে। পিতৃব্য চন্দ্রসেন নানাভাবে সময় অপহরণ করেছেন। আজ বাইরে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে তখন পিতৃব্যানী রেবতী সেই সুযোগ নিতে চেয়েছে সুকৌশলে,

যাক যুদ্ধে তারপরে
দেবতা কৃপায় আর যেন নাহি আসে
ফিরে

তারপর আসে একের পর এক ব্যর্থতার পাল। ইলার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কুমার। রাজা বিক্রম তাকে অপমান করে, তাকে বন্দী করার জ্ঞাপ্তি অভিযান করে, রাজ্যে চলে অসহ্য অত্যাচার। রেবতী করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। এর মাঝখানে তার জ্ঞাপ্তি হৃদয় শুধু ব্যাকুল, এক বৃদ্ধ শংকর, আর তার প্রিয় বোন, বিক্রমের স্ত্রী সুমিত্রা। আর অসংখ্য প্রজার ভালবাসায় সে পূর্ণ। তাকে যারা লুকিয়ে রেখেছে, বিক্রমের হিংস্র নথরের

সামনে তারা তাকে কিছুতেই যেতে দেবেনা। ভীষণ নারী রেবতী তাকে খুঁজে বার করার পথ বলে দেয়,
প্রজাগণ

লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্ত্রক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।

সত্যি প্রজারা তাকে বৃকে করে রেখেছে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়ে গেছে, তবু তাদের ভালবাসা মুহূর্তের জ্ঞাপ্তি বিষণ্ণ হয়নি। কাঠুরিয়া, গান গায়

বঁধু তোমায় করব রাজ্য তরুতলে
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে

অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে

এর বেশী তাদের কিইবা আছে। কিন্তু প্রজাদের উপর অত্যাচার রাজপুত্রকে তার কর্তব্য স্থির করতে সাহায্য করে। এই গুপ্তজীবনের যবনিকা ভেদ করে সে বেরিয়ে আসতে চায়। তার বীর্ষ, প্রজাদের ভালবাসা আর তার প্রচণ্ড আত্মসম্মান এই তিনটি শক্তি নিয়ে সে রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—নিজের জীবন “বিসর্জন” দেয়। এই বিসর্জনই তার একমাত্র পথ। প্রিয় বোন সুমিত্রাকে সে আদেশ দেয়।

এ জীবন দিব বিসর্জন। তারপরে

তুমি মোর ছিন্ন মৃগ নিয়ে। নিজহন্তে
জালন্ধর-রাজ করে দিবে উপহার।

যখন কুমার সেনের ছিন্নমৃগ নিয়ে রাণী সুমিত্রা রাজ সভায় প্রবেশ করে তখন সবাই হতবিহ্বল, শুধু বৃদ্ধ শংকর, যে তার সমস্ত প্রজার ভালবাসার প্রতিনিধি সে জয়ধ্বনি করে।

এই ভালো, এই ভালো। মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজ্যের মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মি রেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল।

মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখায় সবার প্রিয় রাজপুত্র ভাষার হয়ে ওঠে।

আবার এই রাজপুত্রের আবির্ভাব হল “প্রায়শ্চিত্ত” নাটকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। বোঁঠাকুরানীর উদয়াদিত্যকেই আবার দেখা গেল কিন্তু এখন সে আগের রাজপুত্র নেই। তার ব্যক্তিত্ব এখন স্পষ্ট। প্রজাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক নিকট। রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধ অনেক প্রত্যক্ষ। প্রজারা রাজার কাছে দরবার করতে গিয়ে কী চাইবে? তাদের দলপতি ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে।

কী চাইবি রে ?

আমরা যুবরাজকে চাইব।

আবার অচ্যুত

উদয়াদিত্য। তবে তোরা মরতে এসেছিস এখানে ? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা, পালা।

১। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায় ?

২। তা মরতে হয় তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়াদিত্য। তোদের কী চাই বল দেখি।

অনেক। আমরা তোমাকে চাই।

এই একই কথা বলেছিল “রাজা ও রাণী”র কাঠুরিয়া—“ঐধু তোমায় করব রাজা, তরু তলে”। রাজ্য-সুখের আশা পরিত্যাগ করে, রাজত্ব ত্যাগ করে রাজপুত্র উদয়াদিত্য নেমে আসেন পথে। তাকে ধনঞ্জয় বলে, “যেখানে দীনদরিত্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়েছ। আজ আর কিছু ভাবনা নেই”।

শেষবারের মত এই রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হল মুক্তধারায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। এই রাজপুত্র নামহীন, জাতিহীন, ধর্মহীন, মুক্ত মানব। এক ঝরণার তলায় কোন একদিন তাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের থেকে তাঁকে দূরে রাখা হয়েছে। যতই বলা হয়েছে প্রজাদের জয় করতে হয় ভয় দিয়ে, আঘাত দিয়ে তার হৃদয় ততই স্বতউচ্ছসিত হয়েছে মানুষের হৃদয়ের কাছে। রাজশক্তির নিষেধ সে মানতে

পারেনি। যন্ত্রশক্তির মদমত্ত অপব্যবহারের, অসহায় প্রজাদের ওপর অত্যাচারের হিংস্র প্রতীক হিসেবে আকাশস্পর্শী লোহযন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করে দিয়েছে রাজা। সেই অসহায় প্রজাদের দৃষ্টি এসে পড়েছে রাজপুত্রের প্রতি, যে রাজপুত্র জানে, “আমার জীবনের শ্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি”। কিন্তু রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া সহজ নয়। আপন লোকেও বাধা দেয়, বিদ্রোহ করে। কিন্তু রাজপুত্র জানতে পেরেছে তার জন্মরহস্যের কথা সে শুধু রাজবাড়ির নয়, সে এই মহাপৃথিবীর।

অভিজিৎ, রাজপুত্র বলে,

—চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদাক গাছের চূড়োর ডালটির উপর একলা বসে আছে ; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে, কিন্তু ওয়ে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চূপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

কুমার সেনও তার আত্মবিসর্জনের আগে যে কথাগুলি বলেছিল তার সঙ্গে অভিজিৎের কথাগুলি একস্বত্রে বাঁধা।

এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন আমাদের করিছে আলিঙ্গন। জীবনের প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব আমি পেতেছি আশ্বাদ। ঘন বন, তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছসিত নিব্বারিনী—আশ্বর্ষ এ শোভা। অঘাতিত ভালোবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টি সম অবিজ্ঞাম হতেছে বর্ষণ। চারিদিকে ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী

শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবনবিহঙ্গ বিচিত্র-বরণ পাখা
করিছে বিস্তার।

দুজনের কথাই এই ঐক্য কিন্তু আকস্মিক নয়, বিনয়করও নয়। আসলে একই “রাজপুত্র” কাহিনী সূত্রে দুজনে বাঁধা। সেই ঐক্য থেকেই দেখলে এদের আন্তরিক মিল সহজে আবিষ্কার করা যাবে। কুমার সেন আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। আরো বৃহত্তর কারণে রাজপুত্র অভিজিৎ ভেঙে দেয় মুক্তধারার বাঁধ। উন্নত জলশ্রোতের মধ্যে রাজপুত্র ভেসে যায়। এই বিসর্জনে রাজপুত্র কাহিনীর সমাপ্তি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে এইরকম বহু চরিত্র, বহু ঘটনা বারবার ফিরে এসেছে। তারা ধীরে ধীরে নতুন বাজনা বা গভীরতা লাভ করেছে। রাজপুত্র কাহিনী সেইরকম একটি কাহিনী। বোঁঠাকুরাণীর হাট, রাজা ও রাণী, প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তধারা এই রাজপুত্র কাহিনীর চারটি স্তর বলা যেতে পারে। এই চারটি কাহিনী অল্পসরণ করলে দেখা যায় রাজপুত্র ক্রমশই তার ব্যক্তিগত বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে বৃহৎ জগতের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে। বোঁঠাকুরাণীর হাটের উদয়াদিত্যের ব্যক্তি-জীবনের বেদনা অনেক বড়। সেই বেদনাই আমাদের অভিভূত করে রাখে। এমনকি তার সমস্ত কাজের পেছনেও সুরমার মৃত্যু এবং বিভার লাঞ্ছনা বড় প্রেরণার মত কাজ করেছে। কুমার সেনের জীবনেও তার ব্যক্তি-জীবনের অপ্রাপ্তি একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। ইলার প্রেম তার জীবনকে মধুর ও সুন্দর করতে পারত কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজপুত্রের জীবনে স্থখ নেই। সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে রেখেছে

তার বিরাট কর্তব্যের ভার। উদয়াদিত্যের চেয়েও যে সাধারণ মানুষের আরো কাছে—আর বৈরাগ্যে নয়, আত্মবিসর্জনে সে রাজাকে অবহেলা করেছে। এই আত্মবিসর্জনের সূত্রটিকে “প্রায়শ্চিত্ত” নাটিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি—তাই নাটকটির নাম প্রায়শ্চিত্ত রেখেছেন। এ কার প্রায়শ্চিত্ত? রাজপুত্র উদয়াদিত্য প্রজার ভালবাসার আধার। অথচ সেই রাজশক্তির একটি অঙ্গ। রাজ-শক্তির নির্মম অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করছে উদয়াদিত্য প্রায়শ্চিত্য করতে হয়েছে হয়ত সকলকেই কিন্তু উদয়াদিত্যের মধ্যেই তার সবচেয়ে দীপ্ত প্রকাশ। আর মুক্তধারায় রাজপুত্রের পূর্ণ বিকশিত রূপ। উদয়াদিত্যের বৈরাগ্যের চেয়ে এই বৈরাগ্য অনেক বড়। কুমারসেনের আত্মবিসর্জনের নাটকীয়তা এখানে নেই কিন্তু তার গভীরতা এখানে অনেক বেড়েছে। যে “রাজপুত্র” সূত্রটি রবীন্দ্রনাথের মনকে যৌবনকাল থেকেই আকৃষ্ট করেছে মুক্তধারায় সেই রাজপুত্র আপন সত্য পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। সে শুধু রাজবাড়ির নয়, সে সবার আপন জন। তাই ধনঞ্জয় সাত্বনা দিয়ে বলেছেন, যুবরাজকে “চিরকালের মতো পেয়ে গেলি”। রূপকথার রাজপুত্র আমাদের জয় করেছে তার সৌন্দর্য, তার স্বপ্নময় যাতুকরী মায়ালোক সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের রাজপুত্র আমাদের জয় করেছে তার হৃদয়ের শক্তিতে, বলতে পারি, মানবতার শক্তিতে। রূপকথার রাজপুত্ররা ফিরে গেছে চিরন্তন সূত্রে রাজধানীতে, জয়ের আনন্দিত সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের রাজপুত্ররা ফিরে গেছে যে রাজধানীতে সে কোন কল্পিত নন্দন লোক নয়, নিতান্ত বাস্তব। আত্মবিসর্জনে কিন্তু সেখানেও মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা তাদের মুখ উজ্জ্বল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দু'টি উপমা

শ্রীদেবদাস জোয়ারদার

বীজ থেকে শস্ত এবং আবার শস্ত থেকে বীজ
এই হচ্ছে পৃথিবীতে জীবনের আবর্তগতি। এ দিক
থেকে বীজ আর শস্ত দুটিই অবিনাশী। শুধু ঘটে
এদের রূপান্তর। এ ভাবে আবার কখনও চলছে
বীজ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, আবার ফল থেকে
বীজের আবর্তগতি। বিশ্বপ্রকৃতির এই অবিনাশী
রূপে মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষকে আশ্বস্ত করছে।
উপনিষদে এই সত্যটি এভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে,
অমুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে।

সস্তমিব মর্ত্যোঃ পচাতে সস্তমিবা জায়তে পুনঃ ॥

—কঠোপনিষৎ, ১ম ব্রহ্মী, ৬

‘রঘুবংশম্’ মহাকাব্যে চিত্রিত শেষ নৃপতি ‘অগ্নি-
বর্ণের মৃত্যু হয়েছে কামনার অনিবাণ অগ্নিশিখায়।
কালিদাস তখনও গুনিয়েছেন আশার সুর। “তং
ভাবার্থং প্রসব-সময়াকাজিহ্নীনাং প্রজানা-মন্তুগুচ্চং
ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা”-রঘু, ২১ সর্গ, ৫৭।
অর্থাৎ শ্রাবণমাসে রোপিত বীজমুষ্টিকে ধরিত্রী যেমন
অতি গুঢ়ভাবে অন্তরে বহন করে, তেমনি (অগ্নিবর্ণের)
মহিষীও প্রসব কালের শুভ মুহূর্তের জন্তে প্রতীক্ষমাণ
প্রজাদের কল্যাণস্বরূপ গর্ভধারণরতা। সন্তানের মধ্যে
পিতার সুন্দরতর নবজন্ম হয়। ঠিক এমন ভাবে চলছে
শস্ত থেকে শস্তের নবজন্ম। উপনিষদের ঐ শস্তের
উপমা কালিদাসের রচনায় অল্প তাৎপর্য লাভ করেছে।

এই ধারণাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চেতনার
পরিচয় বোধ হয় প্রথম পাই ‘প্রভাত-সংগীতে’র
‘মহাশ্বপ্ন’ কবিতায়।

ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন প্রদেশে।
এখানে প্রকৃতির অবিনাশী রূপটিই শুধু কবির দৃষ্টিতে
ধরা পড়েছে, মানবের জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যটি এই
স্তরে ধরা পড়েনি। এই একই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের
অনেক পরবর্তী ঋতুনাট্যগুলির ভিত্তিস্বরূপ ঋতুচক্রের
আবর্তনের সত্যটি ‘হঠাৎ আলোর বলকানি’র মতো
আমাদের স্পর্শ করে যায়।

নিদ্রাঘ সরিয়া যায়, বরষা শ্রমানে আসি তার

নিবায় জলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।

বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,

যযাতির মতো পুন বসন্ত যৌবন ফিরে পায়।

শীতের এই বসন্ত যৌবন ফিরে পাওয়াই-তো
‘কাল্কিনী’র মর্মকথা।

ফলের উপমা রবীন্দ্রকাব্যে পূর্বাপর আমরা বার
বার পেয়েছি; কোথাও পরিণত জীবনের ব্যক্তিগত
অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে, আবার কোথাও অল্প
প্রসঙ্গে। আমরা এখানে কয়টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,

হে ছর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,

সহজ প্রবল

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে

বাহিরায় ফল

(বর্ষশেষ, কল্পনা)

নিমেষগুলির ফলের শুদ্ধ ভরে রসের ধারায়
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের

বৃন্তদোলায় দোলে

(পলাতকা, শেষগান)

‘বীথিকা’র ‘মাতা’ তাঁর সন্তানকে ‘কুমারী চাকলা-
তলে’ অমৃতব করছেন,

‘পুষ্প কোরকের বক্ষে অগোচর ফলের মতন’।

দিনান্তে সে শাস্তিভরা

ফলের মতো উঠুক ফলি,

অতজিত নিশীথিনীর

হবে পরম পূজাঞ্জলি।

—বীথিকা, দিনান্ত (সংযোজন অংশ, কবির
একাত্তর বর্ষ পুঁতি উপলক্ষে রচিতা কবিতা)।

প্রান্তিকের বারো সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেকে
সম্বোধন ক’রে বলছেন,

ফল যদি ফলায়েছ বনে,

মাটিতে ফেলিয়া তার হোক অবসান। সাদ হ’ল

ফুল কোটাবার ঋতু।

জন্মদিনের বারো সংখ্যক কবিতায় তিনি আত্ম-
সমীক্ষার ভঙ্গীতে লিখছেন,

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন

প্রথমবৃত্ত ফলের মতন

ছিন্ন হয়ে আসিতেছে।

এ সব উদ্ধৃতির মধ্যে একমাত্র ‘বর্ষশেষ’ কবিতায়

এই উপমাটিতে জীর্ণ-পুষ্পদল থেকে ফলের জন্মের
প্রতি ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির ক্রমাগত
রূপান্তরমুখী চির নতুন রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
‘মাতা’ কবিতায় শিশুই ফলের মতো কুমারী পুষ্পের
রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাছাড়া, অগ্র
কবিতাগুলিতে জীবন-সাম্রাজ্যের অমৃতভূতিই এ উপমায়
নানা ভাবে রূপলাভ করেছে।

প্রাণের ধারায় সাময়িক ছেদ হতে পারে। কিন্তু
কখনই এ ধারা বিলীন হতে পারে না। শশ্বে
‘ধুলার আঁচল’ ভরে যায়। এ কথা সত্য হলেও
আরও সত্য হচ্ছে, ‘ধুলার আঁচল’ থেকেইতো
আবার নতুন শশ্বে জন্ম হবে। প্রাণের সঙ্গে শশ্বে

এই উপমা অগ্ৰভাবে আছে উপনিষদের পূর্বোক্ত
শ্লোকটিতে। ‘রক্তকরবী’তে এই সত্যটি অপূর্ব
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ‘রক্তকরবী’র প্রথম গানটি
রঞ্জনের মৃত্যুর পরে নাটকের শেষে, পরিবর্তিত
হয়েছে। ডালা-ঘে তার ভরেছে আজ পাকা
ফসলে’র পরিবর্তে নাটকের শেষে গানটি হলো ‘ধুলার
আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে’। রঞ্জন মৃত্যুর
পরে রাজার মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এই
প্রাণের ফসল ধুলায় লুটিয়ে পড়েও প্রাণের অবি-
শ্রুততাই ঘোষণা করেছে। এভাবে ‘রক্তকরবী’তে ফুল,
ফল বা বীজ নাটকের আবহাটা রচনা করেনি করেছে
ফসল। রাজাও রঞ্জন সম্পর্কে ‘পুনশ্চের শিশুতীর্থ’
কবিতার পূর্বদেশের বৃদ্ধের মতোই বলতে পারতেন,
সংশয়ে তাকে অস্বীকার করেছে,

ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,

প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,

কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের
জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,

সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।

গভীর ভাবে ভেবে দেখলে শিশুতীর্থের নিহত
অধিনায়ক আর ‘রক্তকরবী’র রঞ্জনের মধ্যে বিশেষ
পার্থক্য নেই। যাক, সে অগ্র কথা।

বীজ, শশু, ফুল ও ফলের আবর্তগতির মধ্যে
অগ্র একটি প্রাকৃতিক সত্য সৃষ্টিরহস্ত আর সেইসূত্রে
ব্যক্তিগত জীবনরহস্তের ধ্যানে রবীন্দ্র-কল্পনায় পুনরা-
বৃত্ত হয়েছে। সেই সত্যটি দিন ও রাত্রির আবর্তন।
দিন-রাত্রির এই আবর্তনের মধ্যকার একটি যোগসূত্র
শুকতারা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ‘শেষ-
সম্পর্কে’র আটশ সংখ্যক কবিতা। পণ্ডিত যাকে
বলেন শুক্রগ্রহ সেই ‘প্রভাতের শুকতারা’।
এ তারাই আবার কখনও ‘আপন পরিচয় পালটিয়ে
দিয়ে’ সন্ধ্যাতারার রূপে ‘গোধূলির দেহলি’তে দেখা
দেয়। এই শুকতারা সম্পর্কে তিনি এ কবিতায়
বলছেন,

যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব-পথিককে
নিশেধে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

এই তারা প্রভাতে যাত্রার নিশেধ সংকেত করে,
সন্ধ্যায় বিশ্রামের আহ্বান জানায়। জীবন সায়াহ্নের
পরিণত ব্যক্তি জীবনের অন্তিম প্রকাশের ক্ষেত্রে ফুল
ও ফলের সঙ্গে একই কবিতায় সন্ধ্যাতারার উল্লেখ
পাই। মৃত্যুর পরে কার ‘অসীম নীরবতা’র মধ্যে
কবির সার্থক বাণী,

অন্ধকারের বেদীর তলায়

রইল সন্ধ্যাতারার মতো।

(দিনান্ত, বীথিকা।)

এই সন্ধ্যাতারারই উপমা পাই শেষসপ্তকের ছাব্বিশ
সংখ্যক কবিতায়,

আজ দিনান্তের অন্ধকারে

এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা

নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে

সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো

জীবনের শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাসিত

“ভালোবাসি”

‘সেঁজুতি’র ‘জন্মদিন’ কবিতায় আমরা একটি
মহাজাগতিক কল্পনার সম্মুখীন হই। আসন্ন মৃত্যুর
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি জন্মদিনে অন্তর্ভব করছেন,

আজ আসিয়াছে কাছে

জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দৌছে বসিয়াছে,

দুই আলো মুখো-মুখি মিলিছে জীবন প্রান্তে মম

রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম—

এক মস্ত্রে দৌছে অভ্যর্থনা।

জীবনের আরম্ভ ও সমাপ্তিকে একই লগ্নে প্রত্যক্ষ
করার জন্তে কবি ‘প্রত্যুষের শুকতারার’ ও ‘রজনীর
চন্দ্রের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে সমাপ্তিই আরম্ভের হাতে ‘অপূর্ব
বেশ’ ধারণ করে। এ সত্যটি ‘পূর্ববীর শেষ’
কবিতায় কবি এভাবে জানিয়েছেন,

হে অশেষ, তব হাতে শেষ

ধরে কী অপূর্ব বেশ

কী মহিমা।

সৃষ্টির আরম্ভই এই ‘অশেষ’। একের পর এক
তারা রাত্রি শেষের আসন্ন-উষার দীপ্তিতে হারিয়ে
যায়। তখন শুধু থাকে চন্দ্র আর উদয় সূর্য। আর
এই মুহূর্তেই রাত্রি শেষে আবার কিভাবে প্রভাতের
আরম্ভ হওয়ায় সৃষ্টির সেই আদিমন্ত উচ্চারিত হচ্ছে,
তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শোনালেন এ ভাবে,

প্রভাত আকাশে চন্দ্র, করণ মাদুরী

শেষ করে যায় তার

উদয়-সূর্যের পানে শাস্ত নমস্কার।

(শেষ, পূর্ববী।)

কালিদাসের দৃষ্টিতে রঘুবংশের মহিষী গর্ভবতী
সুদক্ষিণা ‘তল্ল-প্রকাশেন বিচয় তারকা প্রভাত-
কল্লা শশিনেব শর্করী’ রঘু, ৩য় স্বর্গ, ২। অর্থাৎ
“প্রভাতকালে নক্ষত্রাবলী ক্রমে কমিয়া গেলে এবং
শশাঙ্ক দীপ্তিহীন হইলে রজনী-সুন্দরীর যেমন হয়,
তাহারও তদ্রূপ শোভা পাইল”—অনুবাদ, রাজেন্দ্র-
নাথ বিদ্যাভূষণ। সুদক্ষিণার শেষরাত্রির আকাশের
মতো এই আপাতরিক্ততার মধ্যে আসন্ন উষার
পূর্ণতাই যেন বিস্তারিত হচ্ছে। সুদক্ষিণা সব বাহ্য
রূপ হারিয়ে আজ এক আন্তররূপে দীপ্তিমতী।
কালিদাসের এই উপমাকে আর একটু টেনে নিয়ে
কল্পনা করতে পারি—রাত্রির আকাশের কোনও
তারাই আর নেই, শুধু একটি তারাই আছে,
সুদক্ষিণা বসে আছেন, ‘শিশুতীর্থ’ কবিতার মতোই
কোলে তার—পুত্র রঘু—উষার কোলে যেন
শুকতারার।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিশুতীর্থের মূল কথা বোধ
হয় বলা হয়েছে ‘তীর্থযাত্রী’ নামক গল্পরচনায়

(শিশুতীর্থ কবিতা প্রকাশের এক মাস পরে ১৩৩৮ সালের বিচিত্রার ‘আশ্বিন’ সংখ্যায় প্রকাশিত ।)
 “মাহুযকে নতন করে জন্মাতে হবে। তবেই হবে তার শোধন। মাহুয দ্বিজ, বার্থজন্মের বিকার থেকে পরিব্রাণের জন্তে নতন জন্মের সংস্কার তার চাই।”
 যে উত্তেজিত জনতার হাতে ‘শিশুতীর্থ’ কবিতার অধিনায়কের মৃত্যু হয়েছে, সেই জনতাই বার্থজন্মের বিকার থেকে পরিব্রাণ লাভ করেছে ঐ শিশুর জন্মের মধ্যে। এ অর্থে শিশুই তীর্থ। আবার ‘তীর্থযাত্রী’ রচনারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি—“পশুশাবক পিতৃধর্মের পুনরাবৃত্তি করতে আসে। পিতাই দেখা দেয় বারে বারে। মাহুযের শিশু আসে পুত্রকে আবিষ্কার করতে। যে-পুত্র পিতাকে পূর্ণতা দেয়।” ‘শিশুতীর্থের জনতা পূর্ণতা লাভ করেছে ঐ শিশুর জন্মে। স্মরণে গুণতারার সঙ্গে এই শিশুর উপমা অনুরূপ প্রসঙ্গে আমরা নবজাতকের প্রথম কবিতায় পাই।

আমরা বেড়াই খুঁজি

আগামী প্রান্তের গুণতারাসম

নেপথ্যে আছে বৃষি।

মানবের শিশু বারে বারে আনে

চির আশ্বাসবাণী—

নতন প্রভাতে মুক্তির আলো

বৃষি-বা দিতেছে আনি।

মাহুযের সভ্যতার সাময়িক অন্ধকার পর্বের শেষে মানবশিশুর জন্ম-সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের অমুভূত, একটি গভীর সত্য। দীর্ঘ জীবনের প্রান্তে রচিত ‘ঐ মহামানব আসে’ গানেও একই সত্যোপলব্ধির স্পর্শ। তাই এমন দৃঢ়তার সঙ্গে ‘সভ্যতার সংকট’ নামক শেষ জন্মদিনের ভাষণে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে যে মাহুযের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। জয়সিংহের আত্মদানের পরে রঘুপতির নবজন্ম বা রজনকে হত্যা করার পরে রাজার নবজন্ম—এ সব নাটকীয় ইঙ্গিতে ভিতরের দিক থেকে মাহুযের আত্মশোধনের অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রসাহিত্যে জানতে পেরে আমরা আশ্বস্ত

বোধ করি। আবার ‘আগামী প্রান্তের গুণতারাসম’ শিশুর আবির্ভাবের কথা শুনে তো দৃঢ়চিত্তে রবীন্দ্রনাথের মতোই আমরা বলে উঠতে পারি—রাত্রির তপস্বী সে কি আনিবে না দিন ?”

কালিদাসও তাঁর কাব্যে ও নাটকে ঐ মানবশিশুর কথা শুনিয়া আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। শকুন্তলার ভরত, ‘বিক্রমোর্বশী’র আয়ু, অগ্নিবর্ণের মহিষীর ঐ গর্ভস্থ সম্ভান—সবাই এই মানবশিশু। এঁরা জনক—জননীকে পূর্ণতা দিয়েছেন বা আত্মবোধনে সাহায্য করেছেন। আর কুমারসম্ভব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই শোনা যাক “এই কথাটি আছে কালিদাসের কুমার সম্ভবে। দেবতা পরাভূত, স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট। সুরেন্দ্র প্রমত্ত করলেন, সুরলোক কে উদ্ধার করবে ? উত্তর এল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, দেবসমিতি নয়, কোনো কর্মপদ্ধতি নয়, অমরাবতী অপেক্ষা করে আছে নবজাতকুমারের প্রত্যাশায়, দৈত্যগীড়িত দেবসমাজের তীর্থযাত্রার অঙ্কলীন সেই শিশুর কাছে”। ‘তীর্থযাত্রী’

এই নবজাতকুমার কান্তিক রবীন্দ্র-কল্পনায় দুয়েক-বার এসে, উপস্থিত হয়েছেন। বর্ষশেষ কবিতায় ‘সন্তোজাত মহাবীর’ ‘কুমার’ ও ‘কিশোর’ বলে যাঁকে কবি সম্বোধন করেছেন, তাঁর উপর সুরলোকের নবজাতকুমার কান্তিকের ছায়া পড়েছে। বহুকাল পরে ‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার শরৎ’ কবিতায় কান্তিক এসে উপস্থিত হয়েছেন,

“দেবী সারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি

দেব সেনাপতি কুমার দৈত্যাজয়ী

সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী”

এই মহাবীর চরণে তাঁহার মাগো রে।

বর্ষার ‘মলিনের নাগপাশ’ থেকে মুক্তিলাভের জন্তে

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা

নিত্যকালের বালকবীরের মানসে।

নবীন রঙে আগায় চঞ্চলতা

বলে, চলো, চলো, অথ তোমার আনোঁসে

পুনশ্চের 'পরলা আশ্বিন' কবিতাতেও দেখি
'অমর প্রাণের অসাধ্যসাধনে' গব বিপদ ঘাঁরা অগ্রাহ
করে চলেছেন,

তাদেরই সেই শুভ্র কেতনগুলি

ঐ উড়েছে শরৎপ্রাতের মেঘে

আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

এভাবে শরৎ রবীন্দ্রনাথের কল্পনার রাজ সিংহাসনে
বার বার অভিষিক্ত হয়েছে। আর এই শরতের সঙ্গে
যুক্ত হয়েছে 'অমর প্রাণের অসাধ্য' সাধনারত বীর
বালক বা শিশুর কল্পনা। তাই তাঁর দৃষ্টিতে শরৎ ও
শিশু এমন একাকার। পূর্ববীর পূর্বোল্লিখিত 'শেষ'
কবিতায়ও তিনি বলেছেন।

যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়

বর্ষণের সকল সম্বল,

শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জল।

বর্ষার মালিন্যমুক্তির জগ্গেই শরৎ শিশুর জন্ম।
শরতের এই শিশুরূপটির ধ্যানচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন
বিচিত্রে প্রবন্ধের শরৎ রচনায়।

'শারদোৎসবে'র পরিবর্তিত রূপ 'ঋণশোধ' নাটকে
আমরা শরতের অল্প একটি রূপের সন্ধান পাই।
প্রভুর ঋণশোধের জগ্গে বালক উপানন্দের সাধন

একদিকে চলছে। অন্যদিকে চলছে শরতের শস্ত্রাঞ্জলি
উপহারে বর্ষার জলধারার ঋণশোধের সাধনা। মানুষ
ও প্রকৃতির এই দুটি সত্য কবির দৃষ্টিতে এক হয়ে
উঠেছে। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো রবীন্দ্র-
সাহিত্যে গল্পে-নাটকে-কবিতায় যেখানেই শিশুর কথা;
সেখানকার পরিবেশটি অনেকক্ষেত্রেই শরতের।
দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। কেননা সে এক অল্প
প্রসঙ্গ।

বীজ, শস্ত্র, ফুল ও কলের আবর্তগতির কল্পনার
সঙ্গে কখনও রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধি
জড়িত, আবার কখনও সৃষ্টির পুরাতন অথচ চিরনূতন
অবিনাশী রূপের গভীর সত্যের বোধ জড়িত। শুক-
তারারই সন্ধ্যাতারায় পরিচয় পরিবর্তনে আছে দিন ও
রাত্রির প্রাকৃতিক সত্যটি। এ আবর্তনের সঙ্গে কবি
কখনও তাঁর ব্যক্তিজীবন প্রবাহের আরম্ভ ও শেষের
মিল অনুভব করেছেন। আবার কখনও মানব সত্যতার
পরিভ্রাণের জগ্গে নূতন শিশুর জন্মের সঙ্গে পূর্বদিগন্তে
অমানিশার শেষে শুকতারার আবির্ভাবের মিল অনুভব
করেছেন। এই মানবশিশুর কল্পনায় কোথাও এসেছেন
কার্তিক আর এর সঙ্গেই এসেছে বর্ষার কালিমাঞ্জরী
শরতের নিরাসক্ত রূপের চিত্রটি।

রবীন্দ্র মানসে যুগচেতনার প্রতিফলন

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারাকে সঠিক ভাবে বোঝার জন্য তাকে সামগ্রিক ভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সেই ধারা একটি সরল রেখায় অগ্রসর হয় নি। বাইরের ও ভিতরের অনেক পিছটান এবং মতসংঘাতের মধ্য দিয়ে তা এগিয়ে এসেছে। অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে তার মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রতি স্তরে সেই স্ববিরোধিতাকে অতিক্রম করে অগ্রগমনের সত্যটিও সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশিত। যারা সামাজিক প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আলোচনায় উৎসাহী, তাঁদের অগ্রসর হতে হবে উপরোক্ত সত্যকে স্বীকার করার ভিত্তিতে। সুখের বিষয় এই যে ‘স্বাস্থ্য-পরিচয়’ প্রভৃতি বইতে কবি নিজে তাঁর মননের ইতিহাসের উপর আলোক সম্পাত করেছেন। সেই আলোকে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা, বিশেষ করে তাঁর বিশাল প্রবন্ধ সাহিত্যের পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা অধ্যয়নের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করি।

দ্বিতীয়ত, কবির মননের প্রক্রিয়াকে তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক-সামাজিক পশ্চাৎপটের সাথে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তার দ্বারা আমরা বুঝতে পারব কি ভাবে কবির চিন্তায় যুগমানসের প্রতিফলন হয়েছে এবং কি ভাবে সেই চিন্তা ভৌগোলিক সীমা ও তৎসাময়িক-তাকে অতিক্রম করে সকল দেশের সকল মানুষের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ কাজটি কঠিন ও সহিষ্ণু পরিশ্রম সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের

জীবনকালের পটভূমি সুবিশাল। সে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সমূহ, তাঁর মতামত ও কর্মের পরিধি দিগন্তপ্রসারিত। মানবচিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তিনি আলোচনা ও দিক নির্দেশ করেছেন। স্বদেশ এবং বিশ্বের নানা সমস্যায় অংশ গ্রহণ করেছেন নানাভাবে। সৌভাগ্যক্রমে কবি-জীবনীকার শ্রী প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে গবেষণার একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তার পরিপূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে উপরোক্ত পদ্ধতিতে অধ্যয়নের একটি রূপরেখা রচনার প্রচেষ্টা করা হবে।

যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে কবির মনোজগতে জাগরণ সূত্র হয় সেখান থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করা ভাল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন রায় যে নূতন যুগের সূচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে তা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। যে ঘন তমিস্রার ভিতরে রামমোহন মোহমুক্ত জ্ঞান এবং উদার মানবিকতার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অপসারিত না হলেও আলোকবৃত্তের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ বাঙ্গালীর জীবনে ও চিন্তায় প্রত্যক্ষ রেখাপাত করেনি ঠিকই কিন্তু তার প্রভাব অল্পভূত না হওয়ার কথা নয়। অতীতকে কবির জন্মের আগে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা বাঙালীকে মধ্যযুগীয় কুপমণ্ডুকতা এবং অনড় অচল সংস্কারের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। সেগুলির মধ্যে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, বিববাবিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে বিজ্ঞানাগরের সাহসী পদক্ষেপ, নীলবিদ্রোহ এবং ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকায় হরিশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সে বিদ্রোহের প্রতি নির্ভীক সমর্থন জ্ঞাপন, বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় সাঁওতাল বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাবে নব্যযুগের প্রাণচাঞ্চল্য, দেশীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে যুগচেতনার আত্মপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সামাজিক পরিবেশ ও চরিত্র অবশ্যই তাঁর মানসের বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করেছে। অর্থ-নৈতিক দিক থেকে বলা যায় যে কয়েকপুরুষ ধরেই সে পরিবারের জীবনের সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ফাটল কালে ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং তা এদেশের উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে সে পরিবারে পরিবেশ প্রায় পূর্বসংস্কারহীন হয়ে এসেছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। সাম্প্রদায়িক গুহাচার যে সকল অনুকল্পনা, যে সমস্ত কৃত্রিম আচার-বিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু-শতাব্দী জুড়ে নানাস্থানে অন্তত আকারে একজাতির দুর্বীরতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অঙ্গ সংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিশ্চুপ্তক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশের সর্বত্র

পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্তরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। একথা বলবার তাৎপর্য এই যে জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলম্বন ঘটে নি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্ধত তর্জনির প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয় নি।” (‘আত্ম-পরিচয়, রবীন্দ্রচরিতাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কারণ, দশম খণ্ড, ২১২ পৃঃ)।

এই পরিবেশে কবি উপনিষদীয় চিন্তার সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং তা তাঁকে উদার দৃষ্টি ভঙ্গী লাভে সাহায্য করেছে। প্রথম বয়স থেকেই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গভীর অতিক্রম করে বিশ্বের সাথে একাত্মতাবোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সেই একাত্মতাবোধের সোপান হিসাবে তিনি সকল মানুষের সাথে অন্তরের ঐক্য স্থাপনের সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। মানবপ্রেম তাঁর কাছে বিমূর্ততা তা হয়ে থাকে নি। মানুষের রচিত যে সব কৃত্রিম ভেদাভেদ, সামাজিক আচার বিচার, প্রথা মানুষের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে সে সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। সকল রকমের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর ক্ষমাহীন প্রতিবাদ। অল্পবয়স থেকেই তিনি একদিকে সামন্তযুগীয় চিন্তাধারা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন অণুদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলামোচনের প্রয়াসে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছেন। জাতীয় জাগরণের কর্মকাণ্ডের এই উত্তরদিকে কবির অবদান বাইরের ও ভিতরের নানা বাধার মধ্য দিয়ে স্বন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কবির প্রথম যৌবনে দেশে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন রবীন্দ্রনাথ নবীনের পক্ষ নিয়ে রক্ষণশীলতা এবং অতীত মূল্যবোধ

বিক্ষেপে অস্ত্র ধারণ করেন। সেই সমস্ত অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি সময়ে শশধর তর্ক চূড়ামণি প্রমুখ সনাতনপন্থী পণ্ডিত হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে অনেক আজগুবি মতামত প্রচার করেন। রক্ষিমচন্দ্র (কিয়দংশে), চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষিরাও সেই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে প্রচলিত সমস্ত আচার অনুষ্ঠানকে বিজ্ঞান সম্মত বলে প্রমাণ করা। তাঁদের মতামতের কঠোর সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। শুধু প্রবন্ধই নয়। ‘হিউম্যানি’র নামে অবাস্তব ধর্মমোহের আশ্বালনকে স্মৃতীক্ষণ শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেন কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতায়। নাটকে প্রহসনেও সে আক্রমণের অভিব্যক্তি হয়। সেই সময়ের একখানি পত্র কবিতায় তিনি লেখেন,

“ক্ষুদে ক্ষুদে আর্ধশূলা ধাসের মত গজিয়ে ওঠে।

ছুঁচলো সব জিভের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।

তীরা বলেন, আমি কঙ্কি - গাঁজার কঙ্কি হবে বুঝি—
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।”

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সনাতনপন্থীদের মতামতখণ্ডনে নিজের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি তাদের অতীত মূখীনতার কারণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন যে প্রথমত, আমরা নূতন শিক্ষার প্রভাবে কতকগুলি নূতন কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু নানা পিছুটানের জন্ত সে কর্তব্য পালনে সমর্থ হই না, বরং অনেক সময় সমাজের ভয়ে তার বিপরীতাচরণ করে থাকি। কিন্তু নিজেদের বিবেক তাতে অশাস্ত হয়ে ওঠে তাই প্রাণপণ স্মৃষ্কৃতি প্রয়োগে প্রমাণের চেষ্টা করি যে যা বরাবর করে আসছি তাই সত্য। দ্বিতীয়ত, নবীনপন্থীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরাতনের উপর আড়ি করে নবীনের নামে অনেক অর্থোক্তিক কার্যকলাপের দ্বারা নূতনের উপরই অবিশ্বাস সৃষ্টি করেন এবং সেই প্রতিক্রিয়ায় একদল লোক নূতন মতকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস প্রমাণ

করার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে ওঠেন। তৃতীয়ত, পরাধীন জাতি হিসাবে অথবা বিদেশীর কাছ যে অবমাননা লাভ করি তার প্রতিক্রিয়া রূপে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরার এবং অতীতের সব কিছুকেই সমর্থনের মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। চতুর্থত হয়ত অনেকে মনে করেন যে প্রাচীনতাকে অবলম্বন করা আমাদের দেশের রাজনীতিক উন্নতির পক্ষে অত্যাশঙ্কক। ‘সমাজ’শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত ‘হিন্দুবিবাহ’ নামক প্রবন্ধে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার সাহায্যে আমরা জাতীয় জাগরণের সেই অধ্যায়ের একটি প্রধান স্ব-বিরোধিতা অর্থাৎ রাজনীতিতে চরমপন্থা অথচ সামাজিক বিষয়ে চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার সহ-অবস্থানের কারণ বুঝতে পারি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিজেরও স্ব-বিরোধিতার ব্যাখ্যা পাই। তিনি নবীনপন্থীদের অতিউগ্রতা, বে-পরোয়া ভাঙনের উৎসাহ এবং নিজ দেশের ঐতিহ্যের সমগ্র জিনিষটাকেই বর্জনের প্রবণতা প্রভৃতিকে সমালোচনা করেন। কিন্তু ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের সময় তিনি এরূপ অনেক মতামত প্রকাশ করেছেন যাকে অতীতমুখীনতা এবং রক্ষণশীলতার পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। তখন জাতীয় জাগরণের অনেক পুরোধা ব্যক্তি যথা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী প্রভৃতির মধ্যে ‘নব্যহিন্দুত্ব’ বা হিন্দুজাতীয়তার মনোভাব প্রবল হয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন যে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী যে উদার আদর্শ তার দ্বারা সমাজের বৃহত্তর অংশকে উদ্ধৃত্ত করতে পারলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এই নব্য হিন্দুত্বের প্রভাব এবং একটা ‘ঐকান্তিক হিন্দু’ মনোভাব দেখা যায়। অবশ্য মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে হিন্দুজাতীয়তাবোধ যে রকম উগ্ররূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় তার সাথে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর

নবহিন্দুত্ব গোঁড়া হিন্দুয়ানি থেকে স্বতন্ত্র হলেও তার মধ্যে অতীতমুখীনতার প্রভাব স্পষ্ট। এমন কি তিনি সেই সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্মকেই হিন্দু সমাজের একোয় ভিত্তি রূপে ঘোষণা করেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলসূত্রটি অবশ্য ঐ সব বক্তব্যের মধ্যেও বিজ্ঞমান ছিল, যদিও তা হিন্দুত্বের আবরণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উপরোক্ত মনোভাবের উর্ধে উঠতে সমর্থ হন। ক্রমশঃ তিনি দেশবাসীর সামনে হিন্দু জাতিত্বের বদলে উদার যুক্তিনিষ্ঠ দেশপ্রেমের আদর্শ উপস্থিত করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ এবং দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে রচিত প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদিতে সেই চিন্তাধারা সন্দেহাতীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। হিন্দু সমাজে ধর্ম নামে লোকাচার এবং প্রথার দাসত্ব প্রভৃতি যে আবর্জনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনকে পঙ্কু করে রেখেছে এবং মানুষের লালসার স্বপক্ষে মিথ্যা কৈফিয়তের প্রাচীর গড়ে তুলেছে তার বিরুদ্ধে কবি প্রবল আঘাত হানেন ‘অচলায়তন’ নাটকে। ‘অচলায়তন’ প্রকাশিত হওয়ার পর রক্ষণশীলরা কবির উপরে ভীষণ ভাবে ঝড়গহস্থ হয়ে ওঠেন। সেই কোলাহলের জবাবে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন “অচলায়তন লেখায় যদি কোন চকলতাই না আনে তবে উহা বুঝা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকে বলে নিষ্ফলতা। নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেইপরিমাণেই আঘাত করিবে ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বদা মাথিয়া নিষ্ফল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না।..... অন্তরের যে সকল মর্যাস্তিক বন্ধন আছে, বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্তূলপ্রকাশ মাত্র.....আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে—যত লড়াই ওই শাস্তির

সঙ্গে আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি? আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।”

এই সময়ে কয়েকটি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধে উপস্থাপিত মন্তব্যে কবির চিন্তার গতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে বোঝা যায় যে তিনি ‘নবহিন্দুত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে চলেছেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তা হল নিম্নরূপ: ধর্মের বিশিষ্টতা ও বিশ্বজনীনতা মোটেই পরস্পরবিরোধী জিনিস নয়, সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্য দিয়ে একই সত্য প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে এবং হিন্দুধর্মের প্রাণসত্তার সঙ্গে সেই বিশ্বজনীন সত্যের কোন বিরোধ নেই, বিশেষ দেশে উদ্ভূত এবং বিশেষ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম সার্বজনীন হতে পারে ইত্যাদি।

ধর্ম বলতে কবি যা বুঝেছেন তার সাথে সমাজে প্রচলিত ধর্মের ধারণার পার্থক্য বোঝানর জন্য তিনি ‘ধর্মতন্ত্র’ শব্দটি ব্যবহার করেন। ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের প্রভেদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন “ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলি যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অন্নশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে

হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতত্ত্ব বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।” (‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ নামক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ)

ধর্মবোধ বলতে তিনি ক্রমশঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার যোগ তথা চিন্তের যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কবি-জীবনীকারের কাছে আমরা জানতে পাই যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কবীর এবং মধ্য যুগের অগ্রাঙ্গ সন্তদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সকল ধর্মের ভাবুকদের কথা জানার তাঁর মনে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। এরই কিছুদিন পরে তিনি ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন যে ভারতীর সাধনার অন্তর্নিহিত বাণী হল সর্বমানবে মিলনের বাণী। ঐ প্রবন্ধে তিনি ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেন এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নানা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে ভেদবুদ্ধি ঘোচানই ছিল ভারতের সাধনা। ভারতের ইতিহাস কাকরই স্বতন্ত্র ইতিহাস নয়। আর্য অনার্য, হিন্দু-মুসলমান সকলেই মিলেছে এখানে। মিলবে খৃষ্টান। প্রাচ্যকেও মিলতে হবে পশ্চিমের সাথে তবে অন্ধ অন্ধকরণ বা ভীত আত্মসমর্পণের দ্বারা নয়।

ধর্মমোহ ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে কবির আক্রমণ ক্রমেই আরো বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯২৫ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বীভৎসতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন “এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো।.....আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি নাস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে।” (রবীন্দ্র

জীবন কথা, ১৯৮ পৃঃ) আরো কয়েক বছর পরে ‘রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখেছেন “যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ প্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নিমূল করে; এত বড় বন্ধন-জর্জর জাতিকে এত অল্প কালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিন্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজ্যও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজ্য বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ-পর্বস্ত দেখা গেছে, যে রাজ্য প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজ্যের সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিবকণ্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে তক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন না তার মার আরামের মার।” (রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৭০২ পৃঃ)

সাম্প্রদায়িক ধর্মের আবরণের মধ্যদিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করলে যে তার আবেদন খণ্ডিত এবং শেষ পর্বস্ত বার্থতায় পর্ববসিত হতে পারে একথা রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি এবং দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৫ সালে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক কমিটির দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকার পরিণাম সর্বনাশ হতে বাধ্য। তিনি বলেন, “যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতে আসে সেই হয়ে উঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচণ্ড শত্রু। সব বাঁধনের মধ্যে ধর্মনামাক্তি বাঁধন ভাঙাই সব চেয়ে কঠিন। সব গারদের চেয়ে জঘন্যতম সেটা যা অদৃশ্য, যেখানে মানুষের আত্মা মোহজ্বলিত আত্মপ্রবঞ্চনায় বন্দী।” (রবীন্দ্রজীবন কথা, ২৫৮ পৃঃ)

এক সময়ে অতীতমুখীনতাকেও এমনি ভাবে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে এসেছেন। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর দৃষ্টিকে অনেক স্বচ্ছ করেছে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা করেন তখন সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন নিয়েই সেখানে যান। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের পর্দায় তিনি আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন অবদান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। ভারতবাসী কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্যের থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। কবি-জীবনীকার বলেন যে ‘প্রাচীন ভারত’ সম্বন্ধে তাঁর কল্পনার চিত্রে যে অবাস্তবতা ছিল সে সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটছে এবং তাঁর মন আধুনিক হয়ে উঠছে। যুরোপের বিজ্ঞানসাধনা এবং মনের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি লেখেন “যুরোপের সভ্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে, ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোন খুঁত দেখা যায় এই সভ্যতার আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সভ্যতার সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্ত সেই সভ্য যে ব্যাপ্তি, যে মুক্তি দিতেছে, সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার; তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তত্ত্বমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সাহায্যে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।” (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৩৭ পৃঃ)।

ঐ প্রবন্ধেরই উপসংহারে অতীতমুখীনতার মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে তিনি লেখেন “সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে। আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ধূলিপুঞ্জে শুকপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাত সূর্যকে ঘান করিল, নব নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবন

ধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল—আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিছের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে, তবেই নিত্য সম্মুখগামী মহৎ মহুগ্ধত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম বার্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব—সেই মহুগ্ধত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, সে চিরজাগরক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণহস্ত, জ্ঞানজ্যোতির্বালোকিত সভ্যতার পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নব নব তোরণ দ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।” (ঐ, ২৪৭ পৃঃ)।

নবীনের অত্যাগ্র অসম্মুখতাকে সমালোচনা করলেও নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে তখন তিনি অকুণ্ঠভাবেই নবীনের পক্ষ নিয়েছেন। তিনি যখন দেখেছেন যে, নবীনের অভ্যুদয়ের পথে চারিদিকেই বাধা এবং তাকে খাঁচায় পুরে রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে আছে তখন তিনি খাঁচাটাকেই ভাঙবার পরামর্শ দিতে দ্বিধা করেন নি। ‘বিবেচনা ও অবিবেচনা’ নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন “বাংলাদেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সভ্য তাহার প্রমাণ এই যে তাহার চাকল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলোকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভ্যতাই করতালি তুলান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল; এমন কি হিন্দু-মুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয় হয় করিতে লাগিল।

* * *

সেই বহুবার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার বোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া

আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার সময় আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবল ভারতেরই জল-বাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাহাজ আছে যে, এখানে নীতি আপনাই রীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোন প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই। কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।” (রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)

উপরোক্ত মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে ঐ প্রবন্ধেই তিনি লেখেন, “পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাজক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্রপর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে; বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া, অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া, মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সর্গোরবে বিহার করিতেছে। ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাজক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই। কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মুঢ়তার স্বকপোল-কল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর শুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।” (ঐ, ২২০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ নবীনের দুঃসাহসিকতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু সে দুঃসাহসিকতা অন্ধ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিষ্ফল পথ অনুসরণ করলে তার ভুলত্রুটিকে চোখে আব্দুল দিয়ে দেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। তাই বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী তরুণদেব দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তিনি তাদের অল্পমত নীতি যে বন্ধ্য তা দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন।

সেই তরুণদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, “দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্তে আলো নিয়েই জন্মেছিল— ভুল করে আগুন লাগালো, দন্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক বার্ষতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুঃখ ইচ্ছাশক্তিকে।”

(দেশনায়ক রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড ৩৮৯ পৃঃ)

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিখিল ভারতের আগরণ, সর্বভারতীয় সংযোগ এবং সর্বধর্মের মিলনের প্রসঙ্গে বড় করে দেখতে সুরু করেছিলেন। সেই সময়ে একটি চিঠিতে তিনি রাষ্ট্রবন্ধন উৎসবকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন “এই ক্ষেত্রে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত করতে হবে। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড়ো দিন হবে। তাহলেই এই বড়ো দিনে বুদ্ধ হুস্ট মহম্মদের মিলন হবে।” (রবীন্দ্রজীবন কথা, ১১৫-১১৬ পৃঃ)

হিন্দু-জাতীয়তা এবং প্রাচীনতার প্রতি মোহ কাটিয়ে উঠে তিনি ক্রমশই দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন উদার যুক্তিনিষ্ঠ দেশপ্রেমের আদর্শ। তাতে একদিকে যেমনি গ্রামশালি জন্ম বা জাতীয়তার ইতি-বাচক দিকগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে জাতীয়তার নামে অন্ধ উন্মাদনা, মুঢ়তা ও সঙ্কীর্ণতার মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। দেশপ্রেমকে তিনি দেখেছেন মানব ঐক্যেরই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তাই প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছেন যে, বঞ্চিত উপেক্ষিত জনসাধারণই দেশের সত্যকার প্রাণশক্তি। জাতীয় আগরণে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন জনক্লেশের

জাগরণকে। স্বদেশবাসীর হাতে জনগণের লাজনার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাঁর বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ। জনচিত্তের জাগরণের মহাত্মকে উপেক্ষা করে সৌখীন দেশপ্রেম বা দেশসেবার মনোভাবকে তীব্র কশাঘাত করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। “আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া “মা” শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়বেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মা’কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি, কেবল গানের দ্বারা, কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্ত দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা’কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিজ্ঞোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মা’কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্বক্ষে লইতে রাজি নহি। * * *

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে ক্ষতবেগে পদানত করিবার চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাঁকি দিবার জন্ত, পথ বাঁচাইবার জন্ত আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়; অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে

চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভাল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।” (‘আত্মশক্তি ও সমূহ’ নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৮২২-৮৩০ পৃঃ)

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ হিসাবে কবি জনচিত্তের সর্বতোমুখী জাগরণ এবং জনশক্তিকে সংগঠিত করাকেই প্রধান মনে করতেন। তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর বিরূপ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। মহাত্মা গান্ধী দেশপ্রেমের আহ্বানকে জনসাধারণের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাকে অভিনন্দন অকুণ্ঠভাবেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর যে সব কাজের দ্বারা জনগণের যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার ও মূঢ়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তার কঠোরতম সমালোচনা করতে রবীন্দ্রনাথ এক মুহূর্তের জন্ত দ্বিধা করেন নি। তিনি এই প্রসঙ্গে একটি পত্রিকায় লেখেন—

“দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেন না তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই তো ছিল আমাদের গুণত অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, ‘কেবলমাত্র সকলে মিলে স্মৃতি কাটো, কাপড় বোনো।’ এই ডাক কি সেই ‘আয়ত্ত্ব সর্বতঃ স্বাহা’? এই ডাক কি নবযুগের মহা হুস্তির ডাক? বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্ত নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উন্টো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই।* * *

স্বরাজ্য তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ্য তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রসচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ্য সৃষ্টি করতে স্বরাজ্যসৃষ্টি কোন দেশেই তো শেষ হয় নি; সকল থাকে। এই দেশেই কোন না কোন অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু, সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিন্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিন্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিন্তের বিকাশের উপরই স্বরাজ্য দাঁড়াতে পারবে। তার জন্তে কোনো বাহ্যিক ক্রিয়া, বাহ্যিক ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিন্ত-প্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজ্যকে অল্প কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়? যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি, তাহলে আমাদের দেশে যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অগ্রতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তাহলে আশু প্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে, অথ সকল রকম বাণীই নিরন্তর হয়ে যাবে।” (‘সত্যের আহ্বান’ নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৩০১—৩২০ পৃঃ)

জনচিন্তের জাগরণের প্রয়োজনকে বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরে তিনি জাতীয় আন্দোলনের সামনে এক উজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ করেছিলেন কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তার মধ্যেও একটা দুর্বলতা ছিল। গণসংগ্রাম সন্দেহে তাঁর মনে বড় রকমের ভীতি ছিল। গণজাগরণের জন্ত গঠনমূলক কর্মসূচীর বেশি অগ্রসর হতে তাঁর আপত্তি ছিল। তাই অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তিনি গান্ধীজীর নামে একটি খোলা চিঠিতে লেখেন “লোকের মনকে

অহিংসামত্রে দীক্ষিত না করে এ-ভাবে অহিংস প্রতিরোধের আন্দোলন চলতে পারবে না,—পদে পদে অনর্থের ও সম্ভ্রান্তার সৃষ্টি হবে।” (রবীন্দ্র জীবন কথা, ১৬৩ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী একটি অপূর্ব সৃষ্টি। সে চরিত্র অহিংস প্রাতরোধের আদর্শে উদ্ভূত জনমনের প্রতীক। কিন্তু তার মধ্যে কবির তৎকালীন জীবন দর্শন প্রতিকলিত হয়েছে। কবি বিশ্বাস করতেন যে অত্যাচারীর ভিতরের মনুষ্যত্ব তথা শুভবুদ্ধি একদিন জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং তাহলেই অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটবে। ‘মুক্তধারা’ এবং ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাসই তিনি রূপায়িত করেছেন।

গণসংগ্রাম সন্দেহে ভীতি ও বিরূপতা সন্দেহে দেখা যায় যে যখন গণ আন্দোলনের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সেই নির্ভীক প্রতিবাদের অমর বাণীরূপ বাঙালীর ধানধারণার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গেও বিশ্বাসের সন্দেহই লক্ষ্য করতে হয়, যে শেষজীবনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত জীবনদর্শনের গভীর ছাড়িয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার ধনভাস্করিক শোষণের চেহারা দেখেছেন। নিজ দেশে ও অত্যাগত পরাধীন বা অহুয়ত দেশে সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্যাসিবিদের অমাহুযিক বর্বরতা সন্দেহে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সেই আলোকে তাঁর সত্যনিষ্ঠার সাহায্যে পুরাতন ধারণাকে কাটিয়ে উঠে কবি লিখেছেন;—

“যদি কেউ বলে দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্তই তারা পণ করেছে তাহলে আমরা কোন মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই? তারা

হয়তো ভুল করতে পারে—তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল কববে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবাব আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তাহলে মানুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ, শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে; এতদিন ভুলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত কবে তুললে। নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানব সমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অল্প পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।”

(রাশিয়ার চিঠি, রচনাবলী, দশমখণ্ড, ৬৮১ পৃঃ)

এরই সাথে সংশ্লিষ্ট আর একটি প্রশ্নও কবির শেষ জীবনের চিন্তাধারা আগেকার মতামতকে পিছনে ফেলে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। সমাজের নীচের তলার নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষগুলির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজে উচ্চনীচ তথা পরিশ্রমভোগী এবং শ্রমজীবী এই-শ্রেণীভেদের অস্তিত্ব অনিবার্য। তাই তিনি শ্রেণীভিত্তিক সমাজের কাঠামোর ভিতরই শ্রমজীবী মানুষকে যতটা সম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবতেন। শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনাকে অবাস্তব বলেই মনে করতেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন সম্ভব এক্ষণে কোন নিশ্চিত বিশ্বাস তাঁর মনে জন্মেছিল কিনা জানা যায় না বটে কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে তিনি কুণ্ঠাহীন ভাবে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন “রাশিয়ায় একেবারে গোড়া থেকে এই সমস্ত সমাধান করার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।”

(রাশিয়ার চিঠি, রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, ৬৭৬ পৃঃ)

সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নিজদেশে এবং অন্তান্ত পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ যে রক্তপিপাসু দানবীয় মূর্তিধারণ করে দেখা দিয়েছে তার স্বরূপ তিনি বহু প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত করেছেন। “পৃথিবীতে যারা পবজাতির স্বাভাব্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়ারকেই সে এক কবা বলে প্রচার করে।”

(‘শিক্ষার মিলন’ নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী একাদশ খণ্ড, ৬৭৪ পৃঃ)

ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি যেমন সেখানে সভ্যতাব্যবধানগুলির সাথে পরিচিত হয়েছেন তেমনি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখে শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নিজের দেশে জাতীয় জাগরণে যাতে উগ্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রভাব না পড়ে সেজন্য তিনি বহুবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। সেজন্য স্বদেশে ও বিদেশে উদ্ভয়ক্ষেত্রেই তাঁকে বহু বিক্রম আক্রমণ এবং বিবোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশবাসীকে উগ্রজাতীয়তাবাদের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে তিনি লিখেছিলেন :-

“কিন্তু, মানুষের এই বড়ো বড়ো অহুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করছে। মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে—এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড কবে দিচ্ছে; কত অম্মায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি কবছে। মানুষের ‘জাতীয়তা’ ইংরেজিতে থাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠছে এইজন্য যে তাব মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই ভ্রমস্তা ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই

জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিবোধ, কত আঘাত, কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে।” (সৃষ্টিব ক্রিয়া নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী দ্বাদশখণ্ড, ৫০১ পৃঃ।)

ইউরোপে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলছিল তখন তিনি লেখেন—

“ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ কববেন ; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত কবে তাব জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে—তা হবে না, ইতিহাসবিদ্যাতার এই আদেশ। মানুষ আজ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এতদিন ধরে নববলির উদ্‌যোগ কবেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবাব চকুম হয়েছে। ইতিহাস বিদ্যাতা বলছেন,—এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ কবে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না।” (‘আবো’ নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৫০৫ পৃঃ)

কবি ফ্যাসিজমের চরিত্র প্রথমে বুঝতে পারেন নি, সে সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কবি-জীবনীকাব বলেছেন যে “মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা থেকে এবং রোমের নানাস্থান দেখে ফ্যাসিষ্ট মতবাদের যে রূপটি কবির নিকট প্রকাশ পেল তার মধ্যে এমন-কিছু নিন্দনীয় দেখতে পেলেন না। কর্মক্ষেত্রে কল্যাণেচ্ছু স্বেচ্ছাচার আর দলাদলির নাগবদোলায় বর্ণ্যমান লোকতন্ত্র—উভয়ের মধ্যে কোনটা যে ভালো ও কাম্য সে বিষয়ে কবি মনস্থির করতে পারেন নি।” (রবীন্দ্রজীবন কথা ১৯৯ পৃঃ)

কিন্তু বোম্বা রোলার সঙ্গে সাক্ষাত ও আলোচনার ফলে যে মুহূর্তে ফ্যাসিজমের মানবতাবিরোধী রূপটি তাঁর সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখনই তাঁর মোহমুক্তি ঘটতে বিলম্ব হল না। তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামে অবিচল থেকেছেন। সাম্রাজ্যবাদ

ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রজ্জ্বলন্ত ঘৃণার অনিবার্ণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন ‘কালান্তর’ নামক প্রবন্ধেব পৃষ্ঠায়।

“তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন মাতালের আক্রমণ গেল ঘূচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্তে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি। তারা আসতো কালো আঁধার ধূলায় আপনাকে আবৃত কবে ; কিন্তু এ এসেছে যেন আগ্নেয়াস্ত্র, অবরুদ্ধ পাপেব বাধামুক্ত উৎস-উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দৃষ্টি করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি যুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা কবে কল্যাণেব আদর্শকে উপহাস করতে উচ্ছত। * * * অমানবিক

নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশে বুক ফুলিয়ে। সভ্য-যুরোপের সর্দার-পোড়ো আপনাকে দেখলুম চীনে ; তার নিষ্ঠুর বলদৃষ্ট অধিকার লজ্জনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্তে নাকির বের করে যুরোপেব ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্ত পিঙ্গলের যে উন্নত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পাবতুম না। তারপর চোখেব সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে যুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাদর্শে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজম-এর নির্বিচাৰ নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশেব স্বাধীনতা যুরোপেব একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি যুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতাব কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে... * *

পোলিটিকাল মতভেদের জন্ত ইটালি যে দ্বীপান্তর-বাসের বিধান কবেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে। যুরোপীয়

সত্যতার আলোক যে সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে, জার্মানি। কিন্তু আজ সেখানের সত্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্নত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এওতো অসম্ভব হ'ল না।” (বচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২ ৫-২১৬ পৃঃ)

এমনি আরো অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে দৃষ্টান্তের বাহুল্য এড়িয়ে একটি কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পাবে। যুগচেতনার মধ্যে যে উৎপাদনগুলি জীর্ণ অতীতেব অবশেষ এবং যা পিছুটান হিসাবে কাজ করে সেগুলিও কোন কোন ক্ষেত্রে কবিমানসে প্রতিকলিত হয়েছে বটে কিন্তু তিনি সেই পিছুটানকে কাটিয়ে উঠেছেন। যুগচেতনার মধ্যে যে সব উপাদান মানবতার অগ্রগমনের সহায়ক সেইগুলিকে তিনি সচেতন ও বলিষ্ঠভাবে আপনার করে গিয়েছেন।

সমসাময়িক যুগে যে সব উপাদানের মহান সম্ভাবনা অগ্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি তার মূল্যও তিনি উপলব্ধি করেছেন গভীর সত্যদৃষ্টির আলোকে। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই কথাই বলা চলে যা তিনি লিখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে ;—

“তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেন না তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তাব এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অম্ল দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিন্তের মধ্যে নিজের চিন্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত।” (বচনাবলী, একাদশখণ্ড, ৩৮৮পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ যে কালে বিরাজ করেন তা অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত। “আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।”

গ্রন্থ আলোচনা

পবনমহেশাস্পদ

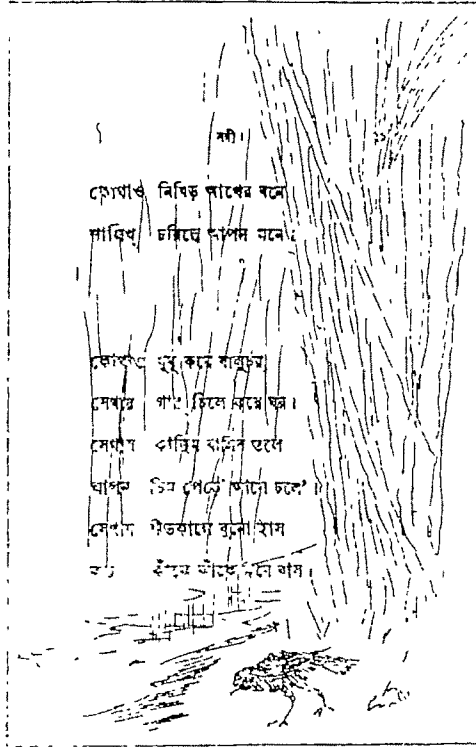
শ্রীমান বালেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব হস্তে,

তাঁহাব শুভ পরিণয় দিনে

এই গ্রন্থখানি উপহৃত হইল

২২ মাঘ, ১৩০২

নদী—শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অঙ্কিত। বিপ্ৰভাবতী। মূল্য ১.৫০ টাকা।



১৩০২ সালে নদী প্রথম প্রকাশিত হয় বালা-
গ্রন্থাবলীর অন্ততম হিসাবে। রবীন্দ্র বচনাবলীর ৪র্থ
খণ্ডে ও ববীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ডে প্রকাশের তাবিধ
আছে ২২শে মাঘ। বচনাবলীতে মুদ্রিত উৎসর্গপত্রে
লেখা আছে—

সমালোচ্য চিত্রিত খণ্ডটিতে পরিচিতির পৃষ্ঠায়
লেখা আছে, ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২ মাঘ গ্রন্থাকারে নদী
প্রকাশিত হয়।' সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ। তা না হলে
এই তারিখের সূত্র কি তা না জানানোর কোন কাবণ
নেই।

সেই প্রথম প্রকাশের পব নদী গ্রন্থাকাষে এই
দ্বিতীয়বার ছাপা হলো। 'শিশু' কবিতাগ্রন্থের মধ্যে
এতকাল নদী স্থান পেয়ে এসেছে এবং রচনাটি যে
নিজের পুত্রকঙ্কাকে আনন্দ দেবার জন্ত রচিত এ
কথা জীবনীকাব প্রভাত মুখোপাধ্যায় অস্বীকার
করেছেন।

বচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে গ্রন্থকাষে যে বিজ্ঞাপন
উদ্ধৃত আছে তাতে বল' হয়েছে :—'এই কাব্যখানি
বালক বালিকাদেব পাঠের জন্ত বচিত হইয়াছে।
পরীক্ষাব দ্বাৰা জানিয়াছি, ইহাব ছন্দ শিশুবা সহজেই
আবৃত্তি কবিতে পারে। বয়স্ক পাঠকঙ্গিকে বলা-
বাহুল্য যে পত্রের ছত্রেব আবৃত্ত ধসটিব পরে যেখানে
ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে স্বল্পকাল খামিতে
হইবে।' স্বভাবতই শিশুদের আনন্দ দেবার জন্ত এই
সরল ধনিতবঙ্গ কবিতাটি লেখা হয়েছে।

আলোচ্য সংস্করণে উৎসর্গপত্র ও গ্রন্থকারের

নিম্ন গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা অনূদিত হবার পর বিজ্ঞাপন নেই। এ ছুটি বাদ দেবার কোন কারণ খুঁজে পাইনি। রবীন্দ্রনাথের যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন এবং প্রিয়তম ভাতৃপুত্রকে যা উপহার দিয়েছিলেন তাঁব বিবাহোপলক্ষে, সেগুলি বাদ দেওয়া বিদ্যাসূত্রে প্রশংসা করতে পারছি না।

পরিচিতি পৃষ্ঠায় আব একটি সংবাদের উল্লেখ থাকে উচিত ছিল। ১৩৬১ সালের শারদীয়া আনন্দ-বাজারে অবনীন্দ্রনাথের সচিত্রিত নদী প্রকাশিত হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থেই অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল, অসিতকুমার ও কবির নিজের আঁকা বহু ছবি আমরা দেখেছি। কবি ও শিল্পীদেব যে স্তূভযোগ ঘটেছিল তাব স্মৃতি বাংলা সাহিত্য কিছু কিছু পেয়েছে। বর্তমান সংস্করণ নদীতে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ২১ খানি ছবি এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা ৭ খানি ছবি আছে। সচিত্র গ্রন্থরচনার যে ধারা রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত শিল্পীগোষ্ঠী সুরু করেন তা এখন বেশ বিস্তৃত। বাংলা সাহিত্যে বহু সচিত্র গ্রন্থ আমরা পববর্তী যুগে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা এই প্রথম নয়। সাধনায় বিশ্ববতী কবিতার সঙ্গে, চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সঙ্গেও অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেছিলেন। ‘জলকে চল’ কবিতাটিও সাধনার প্রকাশিত হয়েছিল সচিত্রিত হয়ে।

জীবনস্মৃতির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের ছবিগুলি পাঠকের চোখে এক নতুন জগৎ খুলে দেয়। আমেরিকার ইলিনয় থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন—“গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবন-স্মৃতিব সঙ্গে এমন স্নানভাবে জড়িত হয়ে রইল এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করছি।” বিদেশ থেকে লেখা আর একটি চিঠিতে (২৮ জ্যৈষ্ঠাবি ১৯১৩) বলছেন, “আমার জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি এখানে সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। গগনের উচিত তাঁর অন্ত ছবিগুলি একটা পোর্টফোলিও আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন।”

চিত্রাঙ্গদা।

এ পৌরনন্দন পরশার হস্তে,
এই মৌর বহুভাঙ্গা। এ যেমনা বোয়
দুখের অধিক দুখ, আশার অধিক
আশা, অধরের চোখে বন, তাই তারে
একত্রে দাখা যেনে নদী হর জিরে।



নন্দন। বসন্ত। চিত্রাঙ্গদা।

নন্দন। চিত্রাঙ্গদা।

নন্দন।

আজ রাতি অবসানে

তব অঙ্গ-গোড়া, কিরে' যাবে বসন্তের
অক্ষর ভাঙাবে। পার্বেণে চুপচাপ
কুলে' সিনে, তব কল-রাখ, ছুটি দল
বিশালরে বহুবি' উঠিয়ে লাড়িকার।
অধের বহুণ তব, লত খেত কুলে
ধরিয়া হৃদয় তব, পতঙ্গকথা
তামিবে বহুরে হত দল কাপরণে।

চিত্রা। যে অঙ্গ, যে বসন্ত, আজ রাতি ভবে

এ বহুধরন বোয়, শেষ রজনীতে
বির গরীশের অধিম শিখার মত—
আচলিতে উঠুক উজলতব হয়ে।

নন্দন। তবে তাই বোঝে' সখা, হৃদয় পবন
লাও তবে সিংহসিঁদা প্রাপ্তবুধে যেরে।

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রাঙ্গদার একটি পৃষ্ঠা।

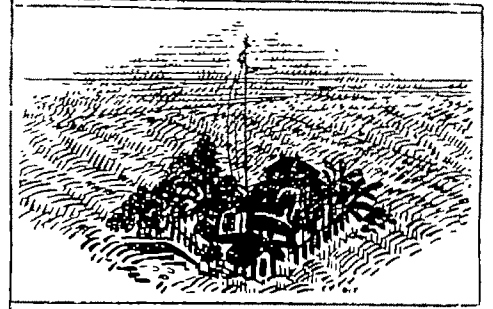
কবি একটি সচিত্রিত সংস্করণ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। ১৩১৯ সালের এই ভাদ্র লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন “রবেন্দ্রব্রজের ইচ্ছা অবন কিশা নন্দলাল যদি গোটা তিন চার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শক্ত অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটাকয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন তবে ভাল হয়। অক্টোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই। Reproduction খুবই ভাল হবে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তর্জমা কবা হয়েছে :—১ জগৎ পাবাবারের তীব, ২ জন্মকথা, ৩ খোকা, ৪ অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাকুবি, ৭ নিলিপ্ত, ৮ কেন মধুর, ৯ ভিতরে ও বাহিরে, ১০ প্রশ্ন, ১১ সমব্যথী, ১২ বিজ্ঞ, ১৩ ব্যাকুল, ১৪ সমালোচক, ১৫ বীরপুরুষ, ১৬

রাজার বাড়ি, ১৭ নৌকাযাত্রা, ১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র, ১৯ মাতৃবৎসল, ২০ লুকোচুরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগজের নৌকা। এর মধ্যে থেকে যে কটা খুশি চেষ্টা কবে দেখতে বোলো। গগন যদি করতে পারেন তাহলে আমি আরও খুসী হই। যদি চেষ্টা করতে গিয়ে একবার তার হাত খুলে যায় তাহলে আর দেরী হবে না। যেমন যেমন একটা একটা হবে অমনি যদি পাঠিয়ে দেন তাহলেই ভাল হয়—সবগুলো শেষ করে পাঠাতে হলে দেরী হবে। তোমাদের চারিদিকে যষ্টির প্রসাদে শোকাখুকির তো অভাব নেই অতএব ছবির জন্ত আদর্শ খুঁজতে হবে না।”

শিশুর ইংরেজি ক্রিসেন্ট মুন প্রকাশিত হলো— ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। সেই সংস্করণে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ৮টি ছবি প্রকাশিত হয়। তারপর অনেকদিন যাকে ঠিক সচিবিত বই বলে সে রকম কিছু নেই। চিত্রিত প্রচ্ছদপট কোন কোন বইয়ের আছে।

রক্তকরবীর ছবি এঁকেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। জালের ভিতরে রাজা, বাইরে থেকে ডাকছে নন্দিনী। অপূর্ব ছবি। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বিচিত্রায় বেরুলো। নটরাজ ঋতুবদশালা। প্রতি পাতা নন্দলাল-অঙ্কিত। বিভিন্ন ঋতুর গান আর ছবি পাশাপাশি কবি আর শিল্পীর হাতে ফুটে লাগলো। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রচ্ছদপট আঁকতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন শিল্পীর ছবি দেখে একগুচ্ছ কবিতা লিখলেন সেগুলি বিচিত্রিতা নামে সংকলিত হলো। ১৩৪৪ সালে বেরুলো ছড়ার ছবি নন্দলালের চিত্রিত। তার আগেই ১৩৪৩-এ বেরিয়েছে খাপছাড়া, এবার শিল্পী কবি নিজেই। ১৩৪৪-এ আর একটি বই প্রকাশিত হলো—সে—তাও কবির নিজের চিত্রিত। ছবির সঙ্গে বাণীর এমন মিলন যে সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একাধিক গ্রন্থ চিত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ চিত্রিত নদী গ্রন্থটিকে আমাদের



দীপালি
দায়

হিমের বাতে ঐ গগনের
বীপ ওগিরে
হেমময়িকা কবল গোপন
আঁচল খিবে।

হবে হবে ডাক পাঠালে—
“বীপালিকার জালাও আলো,
কালাও আলো, আপন আলো,
সাদাও আলোর ধবিকীর” ॥



নন্দলাল বহু অঙ্কিত নটরাজ ঋতুবদশালায় একটি পৃষ্ঠা। সহজলভ্য করে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

চিঠিপত্র ॥ অষ্টম খণ্ড : প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রাবলী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। পৃ: ৩২৮, মূল্য ৫০.৫০ টাকা।

৮ম খণ্ড চিঠিপত্রে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ১৩৭টি চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রিয়নাথ সেনেরও ২১টি পত্র পরিশিষ্টে যুক্ত হইয়াছে। দীর্ঘ গ্রন্থপরিচয় চিঠিগুলি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিস্ফুট করিয়াছে। কবির সঙ্গে প্রিয়নাথবাবুর বন্ধুত্বের ইতিহাস এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়—“এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাহার উৎসাহ অমূল্য আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার

বিকাশ চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন।.....একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের বসভাগুরে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধু আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।”। স্মৃতরাং কবির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কারণ বেশ সহজবোধ্য।

১৮৮১ হইতে ১৮৮৩ পর্যন্ত ২৫টি চিঠি ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’-এব লেখা। তাহার পর হইতেই যে প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না—ইহার পরেও বহুক্ষেত্রে ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’-এর দর্শন মিলিলেও ‘তোমার রবি’ ‘তোমাব’ এবং ‘তোমাবি’র সাক্ষাৎও অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। এই ২৫ সংখ্যক পত্র হইতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্ঘোষনেবও পবিবর্তন ঘটিয়াছে : ২৩ সংখ্যক পত্র পর্যন্ত ছিল ‘প্রিয়বাবু’, ২৪ সংখ্যকে হইল ‘ভাই প্রিয়বাবু’ এবং ২৫ সংখ্যকে আসিয়া দাঁড়াইল ‘ভাই’ : ২৪ সংখ্যক পত্র পর্যন্ত ছিল ‘আপনি’র সম্পর্ক—২৫শে আসিয়া ‘তুমি-আপনি’র সম্মিলন ঘটিয়াছে : ৩০ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই লিখিয়াছেন—“আপনি এলে—আবার আপনি বল্চি—তুমি এলে বড় আনন্দ হয়”। আবার ৩৩ সংখ্যক পত্রে ভ্রমক্রমে একবার। ‘তুমি-আপনি’ জটপাকাইয়া গেলেও সর্বত্রই সম্পর্ক ‘তুমি’ তে নামিয়া আসিয়াছে। প্রিয়নাথবাবুর দ্বিক হইতেও সম্পর্কটি ‘তুমি’তে নামিয়া আসিয়াছে ১৮৮৫ খ্রীঃ হইতেই। ২২ সংখ্যক পত্রে বন্ধুর নিকট রবীন্দ্রনাথ পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন ; যিনি সহজেই অস্ত্রের নিকট হইতে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করেন তিনি বন্ধুর নিকট হৃদয় উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন,—“রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে ঢাক পিটিয়ে দাও।”

চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া মানুষের সত্যরূপ যত

সহজে বোধগম্য হয় হয় তত ‘আর কোন কিছুতেই হয় না।’ রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিগুলির মধ্য দ্বিগ্নেই মানুষটিকে বার বার দেখা গিয়াছে : বিশ্বকবি বলিয়া বন্দিত রবীন্দ্রনাথও যে অর্থের জ্ঞাত কতোবার কতো দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন তাহার সংবাদ তাঁহার কাব্যের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অর্থের জ্ঞাত নানা জিনিস-পত্র এমন কি পুস্তকও বিক্রয় করিতে হইয়াছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবিকে অনেকে ধনী-অভিজাত বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন—কিন্তু ঐশ্বর্যের গর্ব যে তাঁহার কোনদিনই ছিল না, তাঁহার প্রমাণ এই পত্রগুলি, সাধারণ মধ্যবিত্তের জায়গায় তাঁহাকে অর্থের চিন্তা করিতে হইত। কেবল কাব্যের কল্পলোকেই তিনি থাকেন নাই, নিজের পুস্তকের কর্ম্ম-কাগজ এবং ঘামের হিদাবও তাঁহাকে কখন কখন করিতে হইয়াছে। পরের মেয়ের বিবাহের জন্তও কবি উদ্বিগ্ন থাকিয়াছেন—পত্র হাত-ছাড়া না হইয়া যায় সেদিকেও তাঁহার সাধারণ একটি মধ্যবিত্তের জায়গায় দৃষ্টি ছিল।—নানা ব্যবসায়ের কথাও তাঁহার মাথায় আসিয়াছে, পরের হিসাব তিনি করিয়াছেন এবং অর্থের টানাটানি করিলে যেমন সহজেই লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে রবীন্দ্রনাথের চিঠির মধ্যে সেইরূপ প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রায় স্পষ্ট হইয়াই দেখা দিয়াছে। কোন্ কোন্ অথবা কোন্ ধরণের লোক কবির বিশেষ প্রিয় ছিলেন তাহারও আভাস পাওয়া যায় চিঠিগুলির মধ্যে।

গুঢ় বিচার প্রতিও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কৌতূহল ছিল—‘শ্রীশবাবুর জ্ঞান clairvoyance সেই জন্তই তিনি দেখিতে চাহেন। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও কবি কোষ্ঠ বিচারের উপর বিশেষ আস্থা বান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে কিছুটা কবির রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় আছে।

সাহিত্য রচনায়ও রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে—মনে হয়, অনেক সময় লেখার চাপেও তিনি বড় অসহায় হইয়া পড়িতেন : সব

লেখা প্রাণের টাণে আসিয়াছে কিনা সন্দেহ, প্রাণের দায়ও কিছু কিছু সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়—“নাটোরকে সেই বিনোদিনীর গল্পাংশ একদিন শোনান গেল— তাঁর খুব ভাল লাগল। শোনাতে গিয়ে সেটা লিখে ফেলবার অন্তে আমারও একটু উৎসাহ হয়েছে—কিন্তু অন্ত সমস্ত খুঁচরো লেখা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটার হাত দিতে ইচ্ছা আছে। এদিকে খুঁচরো লেখা বক্তবীজের ঝাড়; একটা যেতে না যেতে আর দশটা এসে উপস্থিত হয়—অথচ খেঙলো মাথা থেকে বোটিয়ে না ফেলে মনটা কোন বড় লেখা লেখবাব শক্তিও আবার পায় না। নাটোর না এসে পড়লে এতদিনে আমি চিরকুমার শেষ কবে ফেলতে পারতুম”।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির মধ্যে বেশ সহজ সরল ভাব আছে। তাঁহার বিরক্তি, রহস্য, চিন্তা ভাবনা, ব্যবসারে লাভের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে—সাধারণতঃ সম্মান লাভের আশায় নিজের মনোভাবের উপর কোন প্রলেপ দিবার চেষ্টা মাত্র ও তিনি করেন নাই। চিঠিগুলির মধ্যে একদিকে যেমন কবির মনের সরলতার পরিচয় আছে, অপরদিকে তাঁহার মনের হৈহের সন্ধানও পাওয়া যায়—“এত বৈষয়িক ঝগড়া ও বিয়ের মধ্যেও ঈশ্বর আমাদের সর্বদাই শক্তি প্রেরণ করছেন—অবসাদে আমাকে অভিভূত করে ফেলে নি—সকল প্রকার সম্ভবপর দুঃখ দৈন্ত্র বিপদ নৈরাশ্রের ক্ষণে আমাকে অনেকটা সরল শাস্ত্রভাবে প্রস্তুত করে রাখছেন এজন্য আমি আমার বর্তমান সময়কে হৃদয়মনে ধন্য জানি।” বৃত্তিতে পারা গেল যে কবি রচিত কাব্যে বহুবার যে বাণী লিখিত হইয়াছে, মানুষ রবির জীবনেও সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটাইয়াছিল। প্রিয়নাথ বাবুর শেষ পত্রটি স্মরণীয়—“সব চেয়ে congratulate করি তোমার সেই চেষ্টার জন্য বাহাতে মানুষ রবি কবি রবির সদৃশ হয়।” সকল কবিকে হয়তো তাঁহাদের কাব্যে পাওয়া যাইবে না কিন্তু রবি কবি যে কবি রবি হইয়া

উঠিতেছিলেন তাহার প্রমাণ এই পত্রগুলি স্মরণ্য রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির ধারাবাহিক আলোচনা বিশেষ রূপে প্রয়োজন।

—সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

রবিতীর্থে—বিনায়ক সাম্রাজ্য। বেঙ্গল পাবলিশিংস্ প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য চার টাকা।

সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ সংকলনেব গ্রন্থ অত্যন্ত দায়সারা ভাবেই লেখা হয়ে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় বহুজনের তাগিদ এড়াতে না পেরে লেখা প্রবন্ধ একত্র সংকলিত কবে বই ছাপাবার জন্তে লেখকরা অনেক সময় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তার ফলে কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড ধারণার অসম্পূর্ণ ছবি মনের মধ্যে এলোমেলো ভেসে ওঠে। তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মৃতিচারণ হয়তো হওয়া সম্ভব নয়।

সম্প্রতি একখানি প্রবন্ধ সংকলের গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পড়েছে, যেটির সম্পর্কে আমরা উৎসাহিত বোধ কবেছি। সে গ্রন্থে এমন বহু লেখা আছে যার নূতনত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও জীবনী সম্পর্কে নানা বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন লেখক।

-- বিনায়ক সাম্রাজ্যের রবিতীর্থে রবীন্দ্র আলোচনার একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যে প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেগুলি হলো—রহস্যবাদ ও রবীন্দ্র নাথ, খেয়া ও নৈবেদ্য, রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি, রবীন্দ্র কাব্যে প্রতীচ্য প্রভাব, রবীন্দ্র কাব্যচ্ছন্দের ভূমিকা, রবীন্দ্র কাব্যে রূপক, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, দর্শন রসিক রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব রহস্যবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর যোগাযোগ লেখক প্রথম প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি দীর্ঘতম এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বৈষ্ণব রসদৃষ্টি এবং রবীন্দ্র জীবনদর্শনে কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় মৌলিক পার্থক্য লেখক তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বৈষ্ণবের মাদুর সাধনা আর রবীন্দ্রনাথের সাধনা যে

অনেকাংশে সমধর্মী এ কথা বাংলা কবিতার পাঠক মাতেই জানেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে খেয়া ও নৈবেদ্যের বিশদ আলোচনা আছে। কবিতাগুলির কোন কোনটির বিস্তৃত রসবিচার এবং কবির উপর বিভিন্ন প্রভাবের আলোচনায় লেখক কখনো কখনো কিছু পুনরুক্তি দোষে দোষী হলেও প্রবন্ধটি সাধারণ উদ্ধৃতি কণ্ঠকিত কাব্য আলোচনা মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর প্রতীচ্য প্রভাবের আলোচনায় শেলী কীটস ও মেটারলিংকের সঙ্গেই প্রধানত সাদৃশ্য দেখিয়ে লেখক উপসংহারে বলেছেন “বাহিব হইতে যাহা কিছু তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই আত্মীকৃত হইয়া তাঁহার একান্ত নিজস্ব হইয়া গিয়াছে।” রবীন্দ্রকাব্যে রূপক এবং রূপক নাটকগুলির আলোচনা পড়বার মতো। লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যই নেই, আরও আছে কাব্য আলোচনার উপযোগী শিল্পী মন। রবীন্দ্রচর্চায় এই গ্রন্থের মূল্য পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন।

—শান্তি সিংহরায়

রবীন্দ্রচরিত—বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর এক পরম বিস্ময়। সাহিত্যে ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে দিনে তাঁর আবির্ভাব। তারপর সুদীর্ঘ আশী বছরের জীবনে তাঁর সৌন্দর্যবোধ, তাঁর রূপসাধনা, তাঁর বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ জাতিকে নানা নতুন মূল্যবোধের সন্ধান দিয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী ভারতবর্ষের স্বপ্ন তাঁর দৃষ্টির স্পর্শমণিতে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়েছে।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। বাংলাদেশে, তাঁর নিজের দেশে যেখানে শিক্ষিত শতকরা দশজনের বেশী নয় সেখানে কবির বাণী কজন লোক জানে। শিক্ষিত সমাজ কবিকে যেমন করে জানলো তেমন করে জানবার সুযোগ কোথায় দেশ জোড়া অশিক্ষিত পরিভ্রমজীবী মানুষের। এমন কি যাদের শুধু পড়বার ক্ষমতা মাত্র আছে, তাঁর বেশী বিদ্যাচর্চার সুযোগ ও অবকাশ নেই তারাই

বা কি জানে। বড় বড় জীবনী তাদের পড়বার সময় নেই, মানসিক প্রস্তুতি নেই। তাদের জন্তে বিদ্যাচর্চার একটি সহজ পথ কি ভাবে খোলা যায় তাব নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধে দিয়েছেন।

বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্যের ‘রবীন্দ্রচরিত’ সেই জাতীয় পাঠকদের মনে বেধে লেখা যাঁবা শুধু পড়তে পারেন কিন্তু তার বেশী যাদের বিদ্যাচর্চা এগোয় নি। বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখা হওয়াব ফলে স্বভাবতই এই গ্রন্থেব আবেদন সীমিত হতে বাধ্য। বিচার্য এই যে যাদের উদ্দেশ্য করে এ গ্রন্থ রচনা তারা এর কতটা বুঝবে। বর্ণপরিচয় আছে এমন লোকদের যে তরল শিশুপাঠ্য কাহিনীই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেদিক থেকে লেখক যা দিয়েছেন তা উদ্ভিষ্ট পাঠক গোষ্ঠী চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করতে নিশ্চয়ই পারবেন।

কিন্তু আপত্তিও এই যে লেখক অত্যন্ত অগ্রমনস্ক ভাবে লিখেছেন এবং যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনী রচনাব গুরু দায়িত্ব পালন করেন নি। নিছক ঘটনা বিবরণ এবং গ্রন্থপ্রকাশ প্রসঙ্গে দু’লাইন উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রজীবনী নয়। এই বই পড়ে কোন লোকের মনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঐংস্ক্য বা উংসাহ জাগবে বলে মনে হয় না।

—অরুণা মিত্র

The House of Tagores—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত। মূল্য ১.৫০

দি হাউস অফ টেগোরস রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ঠাকুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২। প্রথম সাতাশ পাতা ঠাকুর পরিবারের কথা। তারপর আছে বংশপঞ্জী, রবীন্দ্রজীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এবং সর্বশেষে আছে কবির প্রয়োজনীয় (Important) রচনাগুলির তালিকা। পুস্তিকাখানি সম্ভবতঃ ঠাকুরবাড়ী দর্শনে আগন্তুক বিদেশীদের জন্ত লেখা। অল্প আয়তনে প্রাথমিক পরিচিতি দানের পক্ষে একটি পুস্তিকার

অভাব অনেক দিন থেকেই অনুভব করা গিয়েছিল।
পুস্তিকাটিতে সেই অভাব মিটেবে এই আশা কবেছিলুম।
কিন্তু সে আশা মেটেনি। কেন তাই বলছি।

কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুস্তিকা প্রকাশিত হলে,
এবং তার লেখক স্বয়ং উপাচার্য হলে পুস্তিকা
নির্ভুল হবে, সমন্বোধোগে লিখিত হবে, তারিখগুলি
নির্ভরযোগ্য হবে এইটাই সবাই আশা কবে। যে
বইটি আমরা পেয়েছি তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়,
পাতায় পাতায় অজস্র ভুল, তারিখেব ভুল, তথ্যের
ভুল। উপাচার্য লিখিত ঠাকুর বাড়ির কাহিনীটি
নিতান্ত অসম্পূর্ণ, এলোমেলো এবং বিষয়বস্তু বর্ণনায়
ভারসাম্যহীন। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়,
ঠাকুর পরিবারের বসতবাটিতে যার অধিষ্ঠান, সেই
বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর অপাঠ্য
পুস্তক প্রচার করবেন তা আমাদের ভাবনার
মধ্যেও ছিল না।

শেষে যে রবীন্দ্র বচনাবলীর তালিকা দেওয়া
আছে তা রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষক, ছাত্র বা গবেষকদের
তৈরী নয়—ললিত কলা অকাদেমী প্রকাশিত
'টেগোর স্টেনিয়ারী একজিবিসনের' স্মারক গ্রন্থটি
থেকে এলোমেলোভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সে স্বীকৃতি
অবশ্য কোথাও নেই। পংক্তির পব পংক্তি টুকে
দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে যে সব আশ্চর্য ক্রটি
ঘটেছে তাতে মনে হয় লিপিকার অবশ্যই
অশিক্ষিত। এই কপি-কর্ম কি রকম নির্বোধের মত
করা হয়েছে তার দু একটি নমুনা তুলে দেওয়া গেল।

(১) ললিত কলা একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থে
আছে

Valmiki prativa. Calcutta, Adi
Brahmasamaj. 13 p. 12 cm. Re
-/4/-A musical drama.

রবীন্দ্রভারতীর পুস্তিকায় আছে

Valmiki Prativa. Calcutta, Adi
Brahmasamaj. 13 p. 12 cm. Rs.
4/-, A musical drama.

ললিত কলার গ্রন্থে যেটা Re -/4/সেটা রবীন্দ্র-
ভারতীর গ্রন্থে Rs. 4/-

(২) ললিত কলার গ্রন্থে—

Sandhya Sangit. Calcutta, Adi
Brahmasamaj. xii 135 p. 20.5 cm.
Re. -/8/- A book of poems

রবীন্দ্রভারতীর পুস্তিকায়

Sandhya Sangit Calcutta, Adi
Brahmasamaj. xii 135 p. 20.5 cm.
Rs. 8/- A book of poems.
Re. -/8/ অশিক্ষিত কপিকাবের হাতে
হয়েছে Rs. 8/-

(৩) ললিত কলার গ্রন্থে

Navin. Calcutta, Viswabharati
Granthalaya. ii, 28 p 18.5 cm
Re. -/4/- A Drama

রবীন্দ্রভারতীর পুস্তিকায়

Navin. Calcutta Viswabharati
Granthalaya ii 28 p. 18.5 cm.
Rs 4/- A Drama

চার আনা দামের বই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকের হাতে
চার টাকা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ছাপার ভুল নয়
কারণ একাধিক বটনা পাঠ্যকেব কাছে উল্লেখ করেছে।
গ্রন্থপঞ্জীতে মূল্যোল্লেখের কোন নির্দিষ্ট রীতি নেই।
নানারকম ব্যবহার আছে যথা

Re. -/8/- As -/8/-

Re. 1/12/- Rs 1/4/

এবং কি বলতে ইচ্ছে করে—লাইনেব পর লাইন
টুকেও এই পণ্ডিত ফলানো—এর চেয়ে মাছি মারা
টোকা হলে ভুল বোধহয় কম হতো।

গ্রন্থপঞ্জীর শিরোনামায় আছে 'ইমপোর্টেড' বইয়ের
তালিকা। এটা যে শুধু অর্থহীন তা নয়, এখানেও
নিবৃত্ততার শেষ নেই। স্কুলপাঠ্য বই 'পাঠ প্রচর'
'সহজ পাঠ' উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু 'গান' 'সংসার' 'ঋতু
উৎসব' 'পীতবিত্তনের' উল্লেখ নেই। অথচ এমন নয়
যে সব সংকলন গ্রন্থই বাদ দেওয়া হয়েছে—'সঞ্চয়িতা'

আছে। ‘ডাকঘর’ বোধহয় ইমপোর্টেন্ট বলে মনে হয়নি। কালের যাত্রা ললিত কলা একাদেমীর বইতে আছে ১৯৩২ সালে—রবীন্দ্রভারতী পুস্তিকায় তা আছে ১৯৩১ সালে। এখানেও ললিতকলার দাম Re-6/- রবীন্দ্রভারতী পুস্তিকায় Rs. 6/- অথচ বাকিটা ছবছ নকল করা হয়েছে। দামটুকু বাদ দিলে উভয় গ্রন্থেই পরিচিতি এই—

Kaler Yatra. Calcutta, Viswabharati granthalaya. iv, 39 p. 20 cm. Re -/6/- [Rs. 6/- রবীন্দ্রভারতী] Dedicated to the famous novelist Saratchandra Chatterji. Two dramatic pieces Rather Rasi and Kavir Diksha.

এই তো গেল গ্রন্থপঞ্জীর কথা। এবারে ঠাকুর বাড়ির পরিচিতি অংশে আসা যাক। এই অংশ স্বয়ং উপাচার্ঘী শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। তাঁর রচনায় তথ্যগত ত্রুটি প্রচুর আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি বিশেষ একটি দিকের প্রতি ঝাঁক খাকার ফলে তাঁকে শুধু মাত্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা বলেই মনে হবে। যে ভুল রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ঘের কাছ থেকে আমরা কখনোই প্রত্যাশা করিনি সেগুলি হলো এই—

দ্বারকানাথ সম্বন্ধে তিনি বলছেন : he was given a quick promotion to hold the post of the Chairman of the Board of Customs, salt and Opium.

পুরনো কোন বেকর্ডেই দ্বারকানাথকে কাষ্টম, সল্ট আর ওপিয়াম বোর্ডের চেয়ারম্যান বলা হয়নি, সর্বত্রই বলা হয়েছে দেওয়ান। দ্বারকানাথ যে চেয়ারম্যান ছিলেন এ কথা ইতিহাসগত সত্য নয়।

অবনীন্দ্রনাথের বাড়িটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—
“At present the house is non existent as after acquisition it suffered damages and had to be pulled down.” এই পংক্তিগুলি পড়লে মনে হয় যে বাড়িটি এমন অবস্থায় এসে

পৌঁছেছিল যে ‘ভাঙতেই হলো।’ ধারা সেই সময়কার কথা জানেন তাঁরা মনে করতে পারবেন যে ভাঙবার বিরুদ্ধে দেশে প্রতিবাদ উঠেছিল কিন্তু নতুন হাল-ক্যাশানের বাড়ি তৈরী করার মোহেই সেদিন সেই বাড়ি ভাঙা হয়েছিল। সেক্সপীয়রের বাড়ি, গোটের বাড়ি বহুকালের পুরানো তবু রক্ষা করা গেছে, আর এই বাড়িটিই ‘had to be pulled down’ এ কথা বিশ্বাস্ত নয়। আধুনিককালে বাংলা দেশের ইতিহাসে ভাঙালিস্তানের এই ঘটনাটি চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখক যা লিখেছেন তাতে মনে হয় যে ব্রাহ্মসমাজ গঠন, কেশবসেনের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং কেশবসেনের সঙ্গে বিরোধ এই ঘটনাটুকুই প্রাধান্য পেয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের অন্তান্ত সামাজিক কার্যকলাপের কিছুমাত্র পরিচয় নেই। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিব উল্লেখ নেই। তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নাম পাওয়া যাচ্ছেনা। তাঁর জীবৎকালেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সাহিত্যে, অভিনয়ে, পত্রিকা প্রকাশে, সমাজ সংস্কারে বাংলার কেন্দ্রমণি হয়ে উঠেছিল তার কোনই চিহ্ন লেখক রাখেন নি।

দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় স্বল্পপ্রমাণ আর মেঘদূতের অম্লবাদের উল্লেখই শেষ। তাঁর দার্শনিকতার উল্লেখমাত্র নেই, তার জীবনের সঙ্গে জড়িত হিন্দুমেলা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি কার্যাবলী লেখক মনে রাখতে চাননি। তিনি যে বিংশশতাব্দীতেও প্রায় পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন শান্তিনিকেতনের তপোবন নাম যে এই সাধু প্রতিম ব্যক্তির উপস্থিতিতেই সার্থক হয়েছিল, গান্ধিজীর অম্লসরণে সারা ভারত তাঁকে বড়দাদা বলেছে এ সব কথা ‘ব্রিফ রেকাংস’ হলেও দেওয়া যেত।

ঠিক তেমনি সত্যেন্দ্রনাথেরও আই-সি-এস হওয়া এবং পর্দা উচ্ছেদের এক লাইনের উল্লেখের বেশি নেই। তিনি যে বাংলা লিখেছিলেন অনেক আলোচনা করেছিলেন বৌদ্ধধর্ম, তুকারাম, গীতা, বোম্বাই প্রবাস প্রভৃতির সম্বন্ধে, সে কথা কোথাও নেই।

সে দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাগ্য ভাল দেখছি, তাঁর সাহিত্যকীর্তির কিছু উল্লেখ আছে।

গণেন্দ্রনাথ ও গিবীন্দ্রনাথের উল্লেখ নেই, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির নাট্যশালা গঠনে যে এঁদের দুই ভাইয়ের কিছু অবদান ছিল একথা জানাশোনা বিদেশী বা স্বদেশী পাঠকদের কি ক্ষতি হতো।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ক্রটি তারিখ নিয়ে হয়েছে তা অমার্জনীয়। ছোট খাটো ঘটনা নয়, রবীন্দ্রনাথের বিয়েই তা বিখ্যাত উপাচার্যমশায় কোথায় পেলেন। তিনি লিখেছেন—

Rabindranath was married to Mrinalini Devi in November 1882.

রবীন্দ্রচর্চা যদি উপাচার্যের হাতেই এই দশা পায় তাহলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কি গতি হবে। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ১৮৮৩ সালের ২ই ডিসেম্বর। এক বছর উপাচার্য মশায় এগিয়ে দিয়েছিলেন।

২০ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ১৯০০ সালে স্থাপিত হয়—“The Brahmacharyya Ashram was founded in 1900”

এ তারিখটি কোথায় পাওয়া গেছে? আসল তারিখ কি ২২শে ডিসেম্বর ১৯০১ সাল নয়?

২১ পৃষ্ঠায় আছে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম “was raised to the status of a University”

প্রকৃত পক্ষে বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তিস্থাপন হলো ঐ দিনে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বার্থ পূরক হলো ১৯২১-এর ২২শে ডিসেম্বর, যেদিন আচার্য ব্রহ্মেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী ব উদ্বোধন হলো।

এ ছাড়া সাধারণ ভাবে স্বদেশী যুগের উল্লেখ নেই, কবির সম্পাদিত পত্রিকাগুলির উল্লেখ নেই। এণ্ড্রু জ, পিয়র্সন, নাম মাত্র, তবু ফুলাইন জায়গা পেয়েছেন এলমহাষ্ট। বিদেশ যাত্রা ও অন্তান্ত দেশেও সমাদর কখন কখন নেই।

আর একটি কথা লেখক নিজের একটি বক্তব্য

সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন যার বিরুদ্ধ সাফা রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায় আছে। রবীন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকোর বাড়িকে অবজ্ঞা করেন নি, এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে উপাচার্য মশায় বলেছেন

“Every year, during the Maghotsab festival he would attend the function at this house accompanied by his friends, colleagues and students from Santiniketan.”

এই উক্তি মনে হবে যে জোড়াসাঁকো বাড়ির মাঝোৎসবে উৎসবটি তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি দলবল নিয়ে নিয়মিত আসতে ভালবাসতেন। একথা সত্য নয়, কখনো সত্য নয়। জোড়াসাঁকোর বাড়ির মাঝোৎসবের আসরের নিয়ন্ত্রণ তিনি শেষ জীবনে রুচি ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১৩৫৮ সালের ১লা বৈশাখ তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন,

“একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্ম সমাজ একটা প্রকাণ্ড বিভ্রম। আর কিছু কাল পরে স্বয়ং কটিটাই অস্ত্রধীন করবে আর যিনি বন্দী ছিলেন তাঁরও ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কেবল শিকলটা স্বমতম কববে। প্রথা জিনিসটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথাই মত লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই। শান্তিনিকেতনে ১১ই মার্চের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অহুষ্ঠানের আড্ডার আমাকে বড় লজ্জা দেয়।”

রবীন্দ্র-পরবর্তী ঠাকুর বাড়ির কোন কোন শ্রষ্টার কথা ‘আর্কটাব মো’ অংশে বলা হয়েছে। অবনীন্দ্র, গগেন্দ্র, সরলা দেবী, বসেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী এবং রবীন্দ্রনাথের কথা আছে। কিন্তু তাদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নেই। সাধারণ ভাবে পড়লে মনে হয় এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের পবে তাঁর দীপ্তিটুকু বহন করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে চারজন কবির জীবিত কালেই মাঝে গেছেন। চারজন পরে।

কালগত যোগাযোগটুকু স্পষ্ট না জানা থাকলে ‘আক্টার প্রো’ কথাটা শুনেও যতই কাব্যিক লাগুক তাব তাৎপর্য বোঝা যাবে না কিছুতেই। সুধীন্দ্রনাথের নাম থাকা কি উচিত ছিল না।

বইটি আয়তনে এতই ছোট যে এর সম্বন্ধে বেশি বলার অবকাশ থাকতেনা যদি অংশ বিশেষ রবীন্দ্রভাবতীর উপাচার্যের লেখা না হতো এবং বইটি রবীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম চিহ্ন বহন না করতো। এই অসার্থক রচনাটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিব প্রতি ধোঁচাচিত সম্মান বক্ষার যোগ্য আদ্যেই নয়।

ঋষি চক্রবর্তী

সাহিত্যতত্ত্ব—বিনয় সেনগুপ্ত। নয়া প্রকাশ।
মূল্য—চারটাকা।

সাহিত্যে আমরা যতটা অমুরাগ প্রকাশ করি, ঠিক ততটা পরিমাণে বীতরাগ আমাদের প্রকাশ পায় সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনায়। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা ঠিক হুচন্দ্রের সভার সেই নিরাকার ভোঞ্জে বসে থাকার সভাসদদের মত। অপেক্ষায় থাকি গোড়ীষ মাধুর্ষ ব্যাখ্যায় উলোট পালোট করা আলোচনার, অপেক্ষায় থাকি সেই মুহূর্তের যখন না বোঝার নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে সমস্তের কোলাহল করে উঠবে, পরিষ্কার, পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।

তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমাদের মনের অবচেতনে তত্ত্বের প্রতি অমুরাগের একটি ফলস্বরূপ নিরন্তর বয়ে চলেছে। হাজার হাজার বছরের দেশী এবং বিদেশী তত্ত্বতিহাস সাহিত্যপাঠকের মনেব অপার কৌতুহলের একটা প্রধান দিককে স্পষ্ট করেছে। ভাব ও ভাবার সমন্বয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি। কিন্তু ভাবের ইতিবিশেষ আছে, ভাবার ব্যক্তনাভঙ্গির নানা রীতি পদ্ধতি আছে। সাহিত্যতাত্ত্বিক নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করেন ভাবকে সাহিত্যদর্শী কবতে হলে একটা ‘high seriousness of attitude’ বক্ষা কবতে হবে, বলতে পারেন ভাবকে বসোত্তীর্ণ

করতে হলে একটা ‘Grand style’ এর প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক সমাজবদ্ধ জীবনেরই একজন, সাহিত্য তাই জীবনের প্রতিচ্ছবি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে সাহিত্য বাস্তবতা, নৈতিকতা প্রভৃতির স্থান ও প্রাধান্য কোথায় এবং কতটা পরিমাণে; সাহিত্য জীবনঅঙ্গ না জীবন বিমূখ, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সমগ্রাঙ্গুলি খুব মুখরোচক সন্দেহ নেই। হাজার বছর আগে দার্শনিক Plato তাঁর রামবাক্য থেকে নিরীহ কবিদের বহিষ্কারের দৃষ্টান্ত দিলেন। তাইব অপরাধ তারা মিথ্যার বেসাতি করেন, ছায়াব ছায়া নিয়ে কারবাব। তাঁর স্ত্রযোগ্য শিষ্য Aristotle গুরুব রোষকে উপেক্ষা করে বেচারী কবিদের পক্ষ নিলেন যাতেকবিদের ভিটেমাটি উচ্ছেদরোধ করা যায়। এল যুক্তির পর যুক্তি। প্রমাণ হল কবির মিথ্যাচারী নন, তাঁরা ব্রষ্টা। সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনার দিক নির্ণয় হল। কাল তার যাত্রা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বজায় রাখল; একইভাবে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে Aristotelian imitation বা mimesis, katharsis, সাহিত্যেব জাতিবিচার, সমালোচনা সাহিত্যের খুঁটি আগলে রইল। সমস্ত পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে Aristotle অনস্বীকার্যভাবে একজন অমর প্রভাব হয়ে রইলেন।

ভারতীয় সাহিত্যেও প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে ভারতের ঋষিগণ সাহিত্য-তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে মনোনিবেশ কবেছেন। ভারতীয় তত্ত্বসাহিত্য এবং অলংকারের আলোচনার সূত্রপাত ভারতের সময় থেকে প্রকৃতপক্ষে হয়েছে। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র ধ্বনি ও রসের যে সব সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ইতিহাসও অল্প নয়। ‘স্বসংবিদানন্দ’ চর্কণাই অভিনবগুপ্ত প্রবর্তিত রসতত্ত্বের আসল কথা এবং তাব গুরুত্ব অল্প নয়।

সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত পথে অনেক অগ্রসর হয়েছে। অনেক অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বরূপ অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থেরও বচনা হয়েছে।

যে সব গ্রন্থে শুধু পণ্ডিতদের দস্তখুট করাবাব অধিকার আছে সাধারণ পাঠকদের সঙ্গে তাদের ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক ছিল। ছাত্রদের পাঠোপযোগী সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব অনেক দিন অনুভব করা গেছে। শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত রচিত “সাহিত্যতত্ত্ব” পুস্তকটি এতদভাবে অনেকাংশে দূর করতে সাহায্য করবে। অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এবং সুবোধ্য ভাষায় লেখক সাহিত্যের জটিলতত্ত্ব পাঠককে পরিবেশন করেছেন। সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যে বাস্তবতা, নৈতিকতার স্থান নির্ণয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব, এরিস্টটেলীয় মতবাদের আলোচনা এই গ্রন্থটির মূল্যবর্ধন করেছে।

বইটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় উৎসর্গিত হয়েছে। আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য। তাঁর “সাহিত্য” “সাহিত্যের পক্ষে” প্রভৃতি গ্রন্থে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। বর্তমান লেখক পাঠকদের অবগতির জন্ত ঘোষণা করেছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের “সাহিত্য” গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তিনি স্মৃতিতেই রবীন্দ্রনাথের “জীবনদর্শন” নামক দুর্লভ সমগ্রটিকে উত্থাপন করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের “আধ্যাত্মিক জীবনদৃষ্টির” উল্লেখ করেছেন। স্থানস্বলতা হেতু সম্ভবত আলোচনার পূর্ণরূপ ব্যহত হয়েছে, কিন্তু তবু তা পাঠকদের কৌতুহলকে যথেষ্টরূপে জাগরুক করতে সহায়ক হবে। সাহিত্যে বাস্তবতা, সাহিত্যের ধর্ম, আধুনিক কাব্য, সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের মৌলিক মতবাদের সুন্দর আলোচনা আছে পুস্তকটিতে এই আলোচনা আশা করা যায় পাঠকদের রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পঠনে অধিকতর উৎসাহিত করবে।

ঋষি চক্রবর্তী

রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
জিজ্ঞাসা। মূল্য ৪.০০

রবীন্দ্রনাথের জীবন এত বিস্তৃত ও এত কর্মবহুল যে খুব উৎসাহী রবীন্দ্রপাঠকের পক্ষেও সব কথা সব

সময়ে মনে করা সম্ভব নয়। স্মরণশক্তির ভাবতম্যে অবশ্য মনে রাখা না রাখা নির্ভর করে তবু হাতের কাছে নির্দেশ পাবার মত স্বল্পায়তন রেফারেন্স বই যদি থাকে তাহলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী সেই জাতীয় রেফারেন্স গ্রন্থ যার মধ্যে বছর উল্লেখ করে সেই বছরের কবিজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ধবে দেওয়া আছে। বছরে বছরে প্রধান প্রধান সভা ও ভাষণ এবং সাহিত্য বচনাব উল্লেখও আছে। বইটি নানারকমে পাঠকদের সহায়ক হতে পারে। রবীন্দ্রঅনুবাগী পাঠকদের পক্ষে এই বই অবশ্যই সঞ্চিত হবার যোগ্য।

গুরুদেবের শাস্তিনিকেতন—প্রফুল্লকুমার সরকার। বুকলাগু প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য তিন টাকা।

লেখক প্রফুল্লকুমার সরকার ১৯১৯ সাল থেকে বছর দুয়েক শাস্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন। পরে বিলাতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের উপর আলোচনা করেন এবং সেই রচনারই অংশ বিশেষ গুরুদেবের শাস্তিনিকেতন গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত মতামত লেখক দেবার চেষ্টা করেছেন। রচনাভঙ্গী স্ববোধ্য। শাস্তিনিকেতনের স্মৃতিও হু একটি রচনায় সুন্দর কবে আঁকা আছে। আলোচনার সংক্ষিপ্ততা এই জাতীয় গভীর বিষয়ের প্রতি সুবিচাব করে না। লেখক যদি আরও বিস্তৃত আলোচনা করতেন তাহলে এ গ্রন্থের একটা বিশেষ মূল্য হতো

শচীনন্দন সিংহ

রবীন্দ্র সুভাষিত—বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত। রবীন্দ্রভারতী। মূল্য বারো টাকা।

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহের রবীন্দ্র সুভাষিত একটি বৃহৎ গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩৭। ঠিক এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলায় ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি, তবে সুভাষিত কোন শ্রেণীরই বাংলায় নেই ভূমিকায় হিষ্টিয়া

বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি অজ্ঞানতাজ্ঞাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল আগেই বঙ্কিম সাহিত্য থেকে একটি রসসমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশ কবেছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামী ‘রবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়’ নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। কাঙ্ক্ষের আয়তনে, চরিত্রে এবং বিষয় বিস্তারিত আশোচ্য এই বইটির সঙ্গে ঐ বইগুলির তফাত আছে “কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোনো শ্রেণীর ‘সুভাষিত’ই দেখা যায় না” এ কথা মোটেই সত্য নয়।

প্রথমই স্বীকার করে নিতে চাই যে এই বিরাট কাজে হস্তক্ষেপ করে সংকলক আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। ভবিষ্যতে আবও অনেক রবীন্দ্রবচন সংকলন প্রকাশিত হবে। সেই সব রচনার প্রথম আদর্শ—তা যতই অপূর্ণ হোক—আশোচ্য লেখকই খাড়া করলেন। ইংরাজীতে অবশ্য এগুলি সাহেবের একটি সাংবৎসরিক ডায়েরী আছে যার পাতায় পাতায় রবীন্দ্রবাণী সংকলিত। সে যাই হোক এই জাতীয় গ্রন্থ সংকলনের সূত্রপাত হিসাবে এই বইয়ের মূল্য অল্প নয়।

কথার ক্রমায়ুসারে এই সুভাষিত সাক্ষ্যনো হয়েছে। বিষয় বস্তু অল্পাধারী নয়, যেমন চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক মদন মোহন গোস্বামী। তাতে সুবিধা এই যে কোন কথার ব্যবহারে কবির প্রয়োগ কোশল অন্ততঃ ৫ এইটি উদ্ধৃতি থেকেও দেখা যাবে। লেখক কোন কোন বাক্যের বহু সুভাষিত তুলে দিয়েছেন। তাতে সেই কথার নানা রকম প্রয়োগ একই সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে। লেখকের নিষ্ঠা ও বিপুল পরিশ্রমের পরিচয় পাতা ওস্তাতে ওস্তাতে অল্পভব করেছি।

এখন কয়েকটি ক্রটির কথা বলি। সেগুলি কিছু মারাত্মক ক্রটি নয় কিন্তু আর একটু যত্ন নিলে সহজেই ধরা পড়তো। লেখককে অনুরোধ করবো পরবর্তী সংস্করণ হলে এইগুলি ভেবে দেখবেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে রাগিনীর বহু উল্লেখ আছে—
উদ্ধৃত কবিতায় গল্পে, গানে এমনকি গুরুতর প্রবন্ধেও।

লেখক সাহানী রাগিনীর উল্লেখ করেছেন। সানাই কবিতা থেকে তুলে দিয়েছেন—

“সাহানার রাগিনীতে বৈরাগিনী ওঠে বেন জেগে
তখন সন্ধান করলুম কবির প্রিয় রাগরাগিণীগুলির—
ভৈরবী, বেহাগ, ইমন। দেখলুম কোনটির উল্লেখ
নেই। তখনই মনে হলো বাক্যচয়নে কোন নির্দিষ্ট
পরিকল্পনা নেই। মনের মধ্যে ভেসে এলো—

‘মল্লার মজিত বীণ’

দেখলুম মল্লাব নেই। তাহলে শুধু সাহানাই বা
কেন। তখনই সন্দেহ হয় যে এলোমেলো নির্বাচন
হয়েছে। তেমনি ফুলের মধ্যে গোলাপ আছে, করবী
আছে কেতকী আছে কিন্তু রজনীগন্ধা, নেই, মালতী
নেই, কদম নেই। এই ফুলগুলি সমন্বিত কোন
সুভাষিত পাওয়া গেল না? স্মৃতিতেই কয়েকটি
সুভাষিত গাঁথা আছে—

কুমুদিনীর বর্ণনায় ‘রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড’

‘ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো’

‘এই মালতী নতা হোলো’

‘বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল’

চাপাকেও মনে পড়ছে—

‘তুলিছ জাতী, তুলিছ বুঁধী তুলিছ চাপা ফুল’

‘ও চাপা ও করবী’

তেমনি দেখলুম মাসের ক্ষেত্রে বৈশাখ আছে, আশ্বিন
আছে, আষাঢ় আছে ‘মাঘ’ নেই। মনে পড়লো,

‘মাঘের সূর্য উত্তরাংশে পার হয়ে এল চলি।’

এগুলি সম্বন্ধে সংকলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
যেহেতু সুভাষিতগুলি বাক্যের ক্রমে বিস্তৃত সেই হেতু
বাক্য সন্ধান করলাম কয়েকটি। বাক্যও ঠিক নয়,
রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি উজ্জ্বল পংক্তি থেকে মনে মনে
শব্দ ভেবে নিয়ে খুঁজলুম।

ক্ষুধাতুর—দেখলুম ক্ষুধা আছে ক্ষুধাতুর নেই একটি
পংক্তি মনে পড়লো বা একবাব পড়লে ভোলা শব্দ।

“ক্ষুধাতুর আর ভূরীভোজীদের নির্দাক্ষণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,”

তেমনি খুঁজলুম ‘দূত’—

“ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত

পাঠায়েছ বারে বারে”

‘বিদ্বেষ’ খুঁজলুম—বিদ্বেষ বিষ নাশো

“বিদেশিনী”—চিনি গো চিনি তোমারে গুণো

বিদেশিনী।

এমনি আরও বহু বাক্য মনে পড়ছে যা রবীন্দ্র কাব্যে সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সুভাষিত পংক্তিতেই আছে কিন্তু রবীন্দ্র সুভাষিতে নেই।

অবশ্য এ সব ক্রটি মারাত্মক নয় কোন সংকলের কাজই একবারে পারফেক্ট হতে পারে না। সংকলকের রবীন্দ্রচর্চা রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনায় আরও ফসল দেবে এ আশা করবো।

মঞ্জুলা বসু

সূর্যনাথ রবীন্দ্রনাথ : সোমেন্দ্রনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬ মূল্য চার টাকা,

এই ক্ষুদ্র কলেবর, স্নিগ্ধ প্রচ্ছদযুক্ত গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক দশটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সংকলন। রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী পরিচয় এত বড় ও ব্যাপক যে তাঁর অন্তরালে তাঁর সংগ্রামী ও চিন্তাশীল মনের পরিচয় জনসাধারণের কাছে ক্রমশই অস্পষ্টই হয়ে আসছে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব বড় কবিরই কবিত্বের পরিচয়ের দ্বারাই তাঁদের অন্ত সব পরিচয় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। লেখকের মতে কবির জীবনের এই অংশটিও মূল্যবান, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের। সমাজ ও দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কত গভীর ছিল, সমগ্র পৃথিবীতে স্বার্থময়ী দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের কত তীব্র ছিল—এবং তাঁর মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামী ও কর্মী রবীন্দ্রনাথকে পাই তাকে বিশ্বাস হলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার পরিচয় পাব না। এই বক্তব্যটি লেখক প্রথম প্রবন্ধ “রবীন্দ্র চিন্তায়” (পৃঃ-৭) ব্যক্ত করেছেন। তাঁর দশটি প্রবন্ধের পাঁচটি তাই

রবীন্দ্রনাথের বাইরের জীবনের নানাচিন্তা ও রূপের প্রতি। আত্মচিন্তা, স্বদেশ ও বিশ্বচিন্তা এগুলির উপজীব্য। “আজি মম জন্মদিন” (পৃঃ ৩৩-৬০) প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে জন্মদিন বিষয়ক কবিতা ও ভাষণের মধ্যে যে চিন্তা করেছেন, যে চিন্তার সঙ্গে মানবচিন্তাও বিশেষভাবে জড়িত, তারই কথা কালাহুক্রমিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন অত্যাচারিত দেশগুলি, যারা প্রতিবেশীর লোলুপ দেশপ্রেমের দ্বারা নিপীড়িত, কিংবা যারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থক্ষেত্রে নিষ্পেষিত, তাদের বেদনা রবীন্দ্রনাথের মনে কীভাবে বেজেছে এবং কাব্যে তার কী প্রতিধ্বনি উঠেছে তার বিবরণ আছে “যে পক্ষের পরাজয়” (পৃঃ ৬১-৭৪) প্রবন্ধে “কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাক্কনে” (পৃঃ ৯২-১০১) প্রবন্ধটিতে আবার রবীন্দ্রনাথের চোখে পাঠক-সম্প্রদায়েব রুচি, লোকসমাজের স্তুতি বা নিন্দার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। “পশ্চিম দিগন্ত পারে” (পৃঃ ১১০-১২৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের বাকী পাঁচটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেব পাঁচটি বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে রচিত। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ (পৃঃ ৮-১৮) প্রবন্ধটি, কারণ এর বিষয় গৌরব, দ্বিতীয়ত এই প্রবন্ধের নামেই বইটির নামকরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সূর্য শুধু চিত্রকল্প রূপেই বারে বারে ফিরে আসেনি তা শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধানতম প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সূর্যের সঙ্গে তাঁর শৈশবস্মৃতি, তাঁর ধর্মবোধ ও সর্বোপরি তাঁর কল্পনা নানাভাবে জড়িত। এই সব বিভিন্ন অল্পস্বল্পকীভাবে তাঁর কাব্যে কাজ করেছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক এই প্রবন্ধে। প্রকৃতির সঙ্গে কবির নিজের সন্তার যে নিগূঢ় যোগ। যা যুগে যুগে বিভিন্নরূপের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত • হয়ে

এসেছে—রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনাটি কিভাবে শেষপর্ষন্ত একটি দার্শনিক প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল সেই কথা আলোচিত হয়েছে “কোন আদিকাল হতে” (পৃ: ১২-২৫) বচনায়। আবাব মৃত্যুর পবেও জীবনের যে প্রবাহেব অবিচ্ছিন্নতা অঞ্চল কবিসত্ত্বাব বিদ্যায় তাঁকে বারবার চিন্তিত কবেছে, সেই পৃথিবীর মধ্যেও তাঁর উপস্থিতি তিনি কল্পনা করেছেন বিভিন্ন রচনার মধ্যে। “তবু মনে রেখো” (পৃ: ২৬-২৭) প্রবন্ধটি সেই আবেগ-মধুর রচনাগুলির পরিচয় দিয়েছে। লেখক আবার দুটি প্রবন্ধ, “আজিকার দিন না ফুবাতে” (পৃ: ৭৫-৯১) এবং “কিছুতে কেন যে মন লাগেনা” (পৃ: ১০২-১০৩), রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে অন্তঃশীলা স্রোতের মত যে অনিদেস্তা বেদনা ও উদাস মানসিকতার প্রবাহ চলেছে তাই পরিচয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির চেয়ে ছোট এবং ভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন রীতির। লেখক এখানে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি, রসিক পাঠকের মত আনন্দন করেছেন। ব্যক্তিগত ভালোলাগাব অমুভূতিগুলিকে তিনি তাই বস্তুসন্ধানী সমালোচকের মত নিষ্ঠুর ভাবে বাহ্য দেননি—বরং সেগুলিকে এমনভাবে তাঁর আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন যে এগুলিকে সমালোচনার চেয়েও “ব্যক্তিগত প্রবন্ধ” বললে যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। “কিছুতে কেন যে মন লাগেনা” রচনাটির সূচনা উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে :

ঘনবর্ষাব দিন ঘরে বসে থাকি, আকাশে নিবিড় কালোমেঘ, মন উদাস হয়ে ওঠে, ঠিক এমনি একপ্তি আসন্নবর্ষ মুহূর্তে সঙ্গলোভী মন ভাবছে কাব কাছে যাই, এমন বন্ধু কে আছে যাকে নিয়ে এই ধারাপতনের সুরে মন ভরাবো, একে একে মনে পড়ল সন্ধ্যাকে। প্রিয় থেকে প্রিয়তর, কিন্তু মনে হলো ঠিক এই বর্ষার কান্নায় সাড়া

• দেবার কেউ নেই। যাবা আছে সবাই, তাদের

কাউকে নিয়েই এই শ্রাবণের সন্ধ্যা কাটবেনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর সবকটি প্রবন্ধেই লেখকের ভাবুকতা যুক্ত হয়ে তাদের অন্তরঙ্গ কবে তুলেছে। প্রথম গুচ্ছের প্রবন্ধগুলির বিষয়, রবীন্দ্র চিন্তা ও কর্ম। রচনারীতিও তাই এখানে স্বতন্ত্র। প্রবন্ধগুলিকে বলা যায় অনেক বেশী তথ্যনির্ভর। এগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মভূতি এবং বিশ্বাত্মভূতি আত্মচিন্তা ও বিশ্বচিন্তার আলোচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ “পশ্চিম দিগন্তপারে”। আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে শিক্ষিত সমাজে যে বিরাট আন্দোলন জেগেছিল যাকে আমরা সাধারণত বাংলার বেনেসস বলে পরিচয় দিয়ে থাকি তার ধাক্কা এসেছিল পাশ্চাত্য দেশ থেকে। পাশ্চাত্যের প্রতি বিশ্বাস সেদিন অগাধ, অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত অন্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শক্তির ধাক্কাতেই আমাদের দেশে বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে হিন্দুপ্রতিক্রিয়া তীব্রকণ ধাবণ করল এবং তার ফলে ভারতীয় সমাজের ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতাকে বেহিসবর্ষ বস্তুবাদী ভোগবাদী ইত্যাদি বলে নিন্দা করার প্রবণতা দেখা গেল বাঙালী মনীষীদের মধ্যে। এই মন্তব্য গুলি আজ পর্যন্ত বেশ চলে এসেছে এবং এদের জনপ্রিয়তা বিশেষ কমেনি। এগুলির উৎপত্তির পেছনে বাস্তব সত্য যে পরিমাণ আছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে আছে নিজেদের হীনমন্ত্রতা। রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও এই ধরণের মন্তব্য করেছেন কিন্তু তার মন্তব্য বর্তমান যুগের ইতিহাসের ঘটনা আশ্রিত। লেখক যাকে “আধ্যাত্মিক বিলাসিতা” বলেছেন তার থেকে তাঁর ইউরোপীয় আদর্শের সমালোচনা উৎসারিত হয়নি। ইউরোপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা স্তবে স্তবে বিকাশিত হয়েছে—জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি ইউরোপ

গেছেন, দুটি যুদ্ধের ইউরোপকে দেখেছেন; আবার ইউরোপের মনীষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন। তাঁর ইউরোপ চিন্তা তাই বিশেষ মূল্যবান। তিনি প্রচলিত মতামতসারে ইউরোপকে বস্তুমুখী এবং ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক বলেই দায়িত্ব সমাপন করেননি। ইউরোপের “আধ্যাত্মিকতা” কে তিনি দেখেছিলেন এবং ইউরোপের মানসশক্তির বিরাট উৎস যে তার চরিত্রের মধ্যে, তার মানবতাবাদের মধ্যে একথা বুঝেছিলেন। ইউরোপের এই গুঢ় মানসশক্তিকে আবিষ্কার একটা বড় ব্যাপার কারণ শক্তির কাছে বাঙালীর নবজাগরণ স্থগী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্ধ জাতীয়তা, অন্ধ ধর্মচিন্তার মূর্ত প্রতিবাদ তাই তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জড় ও তামসিকতাকে আঘাত করতে ভোলেননি—আর ইউরোপের প্রাণশক্তির বন্দনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। লেখক যদি ভবিষ্যতে “রবীন্দ্রনাথ ও ইউরোপ” এই বিষয়টি আরো সম্প্রসারিত করে বলেন তাহলে তা আনন্দের বিষয় হবে।

সুধসনাথ গ্রন্থখানি পাঠক চিন্তকে ভাবায়, লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাগুলিও অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করে, শাস্ত্র সহজ গতিতে প্রবাহিত ভাষাধারা তৃপ্তি দেয়।

শিশির কুমার দাশ

রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-২। মূল্য চার টাকা।

‘রবীন্দ্রনাথের জীবন সাহিত্য ও মতামত সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বোধগম্য সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত’ এই গ্রন্থটিতে খ্যাতিমান লেখক বিভিন্ন প্রবন্ধগুলিকে চারটি স্তবকে বিভক্ত করেছেন :

রবীন্দ্র জীবন ; রবীন্দ্রসাহিত্য ; রবীন্দ্রমনন ; এবং রবীন্দ্রচর্চা। লেখকের রচনার প্রসঙ্গগুণে রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিচিত্র কাহিনী মনোরমভাবে বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বিষয়ক অভিমতগুলি আহরণ

করে যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে লেখকের মুষ্টিমানার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ‘রবীন্দ্রচর্চা’ অধ্যায়ে ‘রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে’ প্রবন্ধটি রীতিমতো কৌতুহলোদ্দীপক। পরিশিষ্টে সংযোজিত ‘রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বই’ ও ‘ইংরেজী বই’ অধ্যায় দুটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য,—পাঠকদের কাছে এই তালিকা খুবই মূল্যবান বিবেচিত হবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু স্বীকার করতে স্মিমা নাই যে, গ্রন্থের ‘রবীন্দ্র-সাহিত্য’ অংশটি আমাদের হতাশ করেছে। যাদের উদ্দেশ্য ক’রে এ বই লেখা, তারা এ বইখানি পড়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে শুরু করে নাটক, উপন্যাস, গল্প, গল্পসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, এমন কি ইংরেজী রচনা পর্যন্ত সর্ববিধ সৃষ্টিকর্মের পরিচয় দিয়েছেন লেখক—নিজস্ব মন্তব্যসহ। কিন্তু আলোচনা-গুলি এতো সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়তন যে, তা থেকে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সাধারণ পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে মূর্ত কবে তুলতে হলে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কিত আলোচনার ধারা আরো ব্যাপক ও বিশদ হওয়া প্রয়োজন ছিল। এক একটি প্রসঙ্গে ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক প্রভৃতি সৃষ্টিকর্মের মাত্র তালিকা রচনা করা যায়—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। লেখক আসলে তাই-ই করেছেন। এতে করে রবীন্দ্রনাথের স্বজনী প্রতিভার কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটে উঠে নাই। লেখকের ভাষার অল্পসরণে তাই বলা যায়—চলন্ত রেলগাড়ি থেকে দেখা স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি এর চেয়ে স্পষ্ট হতেও পারে না।

কাজেই আলোচনার এই হ্রস্বতা আমাদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে। কিন্তু আমাদের তীব্রতর আপত্তি লেখকের রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি সম্পর্কে। মন্তব্যগুলির দুই একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

কবিতা সম্পর্কিত :

এ জায়গায় (আত্মকেন্দ্রিক লিরিক কবিতা যা রচিত হয় ব্যক্তিজীবনের দুঃখবেদনাকে আশ্রয় করে) হায়েনে, পুস্কিন, ভালের্ন, বার্বৌ, শেলী এবং ব্রাউনিং নিঃসংশয়ে গীতিকবি হিসাবে (রবীন্দ্রনাথের চেয়ে) আমাদের বেশি কাছে। (৬৪ পৃঃ)

নাটক সম্পর্কিত :

বাইবনের ম্যানফ্রেড, শেলীর প্রমিথিউস্ আন্-বায়ুণ্ড, টেনিসনের হারল্ড এবং ব্রাউনিং এব পিপ্পা পাসেস যে-জ্ঞাতের রচনা, এবা (নাট্যকাব্যগুলি) তারই সঙ্গোঙ্গর। (৬৭ পৃঃ)

[অন্তর্ভুক্ত], মেতারলিংক, হাউপ্টম্যান, ও ইয়েটস্ রচিত সাংকেতিক নাট্যগুলির সংগে রবীন্দ্রনাথের এই (সাংকেতিক) নাটকগুলি তুলনায় আলোচনা করা যেতে পারে এবং সে-আলোচনায় দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের আসন তাঁদের খুব পরে নয়। (৬৮ পৃঃ)

গল্প সম্পর্কিত :

রবীন্দ্রনাথের এককালের অনেক প্রসিদ্ধ গল্পই কতকটা দ্বিবিমার গহনার মতোই ঠেকে আজকের পাঠকের কাছে।.....আসলে কবি উপর থেকে আলো ফেলে জীবনকে দেখেছেন; তাই কি শহর আর কি পল্লী, কি ধনী আব কি নির্ধন, কোনোটাই ঠিক সত্যরূপে প্রতিভাত হয়নি তাঁর গল্পে। চলন্ত রেলগাড়ি থেকে থেকে দেখা ছুনিয়া এর চেয়ে বেশি বাস্তব হতেও পারে না। (৭৬ পৃঃ)

এই মন্তব্যগুলির নিজস্ব মূল্য কতটুকু, এগুলি কতোখানিই বা যুক্তিসহ—সে বিচার এই গ্রন্থ অবলম্বনে করা সম্ভব নয়। কারণ, এই মন্তব্যগুলি লেখক আলোচনার দ্বারা বিশদ করেন নাই; কেবল উচ্চতম রসগ্রম্যতাব আদেশ বলে যেন সেগুলি অনভিজ্ঞ পাঠকদের শিরোধার্য করাতে চেয়েছেন! আমাদের প্রধান অপত্তি এইখানে। এই ধরনের ভারী মন্তব্যগুলি যথার্থ কি না (অবশ্যই আমবা সর্বত্র একমত নই) সে আলোচনায় প্রবেশ করাব আগে মনে রাখতে হবে, লেখকের উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর কথা।

সেই পাঠকেরা বলেন, ‘ছোট্ট কবে সহজ কবে যা-কিছু জ্ঞানাব কথা, বোঝার কথা, সব যদি লেখেন কবি সম্বন্ধে, একমাত্র তাহলেই উপকাব হয় আমাদের মতো মানুষদের। আমরা পড়েছিও কম, জানিও কম, কিন্তু শ্রদ্ধা বা আগ্রহ তো কম নয় আমাদের।

(গোড়াব কথা)

এই কম-পড়া, কম জ্ঞান পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিকর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা হলো না, অথচ নিজস্ব সিদ্ধান্তের সাহায্যে একটা ধারণা চাপিয়ে দেবাব চেষ্টা হলো—যে-সিদ্ধান্ত রীতিমতো বিতর্কিত—এ-কাজ নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। তা ছাড়া এই অল্পশিক্ষিত পাঠকদের সামনে রবীন্দ্রনাথের তৌলন (comparative) আলোচনা করা হচ্ছে কাদের সংগে—হায়েনে, পুস্কিন, ভালের্ন, বার্বৌ, ইয়েটস্ মেটারলিংক, হাউপ্টম্যান প্রভৃতি অপবিচিত কবিদের সংগে। এবং এই কবিদের নামমাত্র উল্লেখ করে পাঠকদের সামনে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁদের উচ্চতর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। এতে লেখকের বিশ্ববৈদম্ব্যের পরিচয় হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু পাঠকদের (এবং রবীন্দ্রনাথের) প্রতি স্মৃতিচারণ করা হয় না। এই সাংবাদিকমূলভ ও আধুনিকোচিত সর্বস্বতার অহমিকা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করবে বলে আশংকা করি।’

শচীনন্দন সিংহ

রবীন্দ্র অভিধান—(২য়, ৩য় খণ্ড)। সোমেন্দ্র

নাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য প্রতিখণ্ড ছয় টাকা।

নিবলস একাগ্রতায় রবীন্দ্র-গবেষক অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্র অভিধান রচনায় যে ভাবে আত্মনিয়োগ কবেছেন সেটি সত্যই ববীন্দ্রচর্চাকারী-গণের ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ করে সম্প্রতি কয়েক বৎসবে রবীন্দ্রসাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নের যে বহুমুখী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে অভিধান রচনাপ্রয়াস তারই অগ্রতম শ্রম ও অধ্যাবসায় লব্ধ প্রয়াস রূপে গণ্য হতে পারে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ

ধরনের গ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরেই সম্ভবত এই প্রথম সূচ হযেছে। বাংলায় রবীন্দ্র অভিধান জাতীয় গ্রন্থ শতবার্ষিকী বৎসরে আরও দু'একজন লেখক লিখেছেন বা লেখা আবশ্য করেছেন। তাব মধ্যে বিশ্বভাবতী প্রকাশিত এবং চিত্তরঞ্জন দেব রচিত 'রবীন্দ্র বচন কোষ' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের সঙ্গে অবশ্য সোমেনবাবু অভিধান-পবিকল্পনায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

'রবীন্দ্র অভিধান' একাধারে অভিধান এবং রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক গ্রন্থ। লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি রচনাব সংক্ষিপ্ত পবিচয় সহ তার আকর গ্রন্থের নাম করেছেন। স্তত্রাং সহজেই অনুমান করা যায়, এই গ্রন্থ সুসম্পূর্ণ করতে তাকে দীর্ঘকাল ধরে অধ্যাবসায় ও যত্ন সহকায়ে কাজ করে যেতে হবে। এখন পর্যন্ত তিনটি খণ্ডে স্বরবর্ণ সূচী সমাপ্ত হযেছে। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠাভেই লেখকের জামশীল যত্নের স্বাক্ষর রয়েছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থ পরিচালনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক সবিনয়ে বলেছেন,—

আমি শিক্ষক। ছাত্রদের নিয়ে আমার কাজ। তাই এই কথাই মনে হযেছে এমন কিছু করা আমাব দবকার যাতে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথ পড়তে সাহায্য পান। তাই অভিধানের চেষ্ঠা। অভি-
ধানেব কাজ অর্থ পরিশ্ফুট করা—সমালোচনা নয়। তাঁর বিভিন্ন বচনার অর্থ বিদ্বতভাবে ব্যাখ্যা করাব চেষ্ঠা করেছি। আশা করছি প্রবেশপথে এই সাহায্যটুকু পেলে পাঠকদের নিজের মনের মত অর্থ ও রসগ্রহণে সুবিধা হবে। সমালোচক-
দের মতামত যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই উদ্ধৃত করেছি।.....

অল্পসাধ্য সাগবসিক্কন ছঃসাহসের কাজ। বৃত্ত যাকে নিয়ে এই চেষ্ঠা তাব প্রতি প্রকাণ্ড অল্পবাগই এ কাজে হাত লাগাবার প্রেরণা। ভুল ভ্রটি থাকবেই। পাঠক ও সমালোচকদের কাছে একান্ত অল্পবোধ কোন ভ্রটি চোখে পড়লে, কোনও

নূতন ইঙ্গিত দেবাব থাকলে প্রকাশকের ঠিকানায় জানাবেন। পত্রলেখককে বন্ধু সহকর্মি বলে মনে কবব।

এমন ধরণেব তথ্য সমৃদ্ধ বিপুলায়তন কাজে সামগ্র্য ভুলভ্রটি থাকা স্বাভাবিক। সোমেনবাবু এই অনিবার্ধ অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হযেই পাঠক ও সমালোচকদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। এই সহযোগিতাব মনোভাব নিয়েই হুএকটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই।

প্রথম কথা হল, এই জাতীয় অভিধান বচনায় দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ (objective) রাখাই ভালো। লেখক সে সম্পর্কে সচেতনও রয়েছেন। তবু মাঝে মাঝে কয়েকটি আলোচনা যেন একটু বেশী দীর্ঘ হযে পড়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডেব 'আমত্মপরিচয়,' 'আপনাবে তুমি সহজ,' 'আবদ্যাবের আইন' এবং তৃতীয় খণ্ডের 'উর্বশী,' 'এ কথা জানিতে তুমি' প্রসঙ্গগুলির আলোচনা এখানে স্বরণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গের মূলবস্তুবি নিষ্কর কথাব বলে অন্ত্যন্ত সমালোচকদের কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থের উল্লেখ করে দিলেই বোধ হয় আভিধানিকের দায়িত্ব সুষ্ঠুতরভাবে পালিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিধানেব বিস্তারিতিতে লেখক একটি নির্দিষ্ট ধারা মেনে চললেও মাঝে মাঝে তার কিছু তারতম্য ঘটেছে। যেমন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭০-এ 'এ পথ গেছে কোনখানে' অংশের পরিচয়ে লিখেছেন 'অচলাবতনে (১১) পঞ্চকের গান। রবীন্দ্র অভিধান ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬ দেখ। স্বরলিপি—স্বরবিতান ৫২।' এ পরিচয় পদ্ধতি সুন্দর। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডে পৃ. ১০২-এ 'এসো গো জেলে দিয়ে যাও' অংশের পরিচয়ে লিখেছেন 'আহবান দেখ। রবীন্দ্র অভিধান ২য় খণ্ড।' এ অংশে পাঠক প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব বোধ হয় করবেন, আহবান পৃ. ২৩০ দেখ। তাহলেই সঙ্গতি থাকত, পাঠকেরও সুবিধা হত।

গানের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক আরও সাবধানতার

সঙ্গে একই বিজ্ঞাপনধর্মিতা মেনে চললে ভালো হয়। সাধারণত তিনি স্বরলিপি প্রসঙ্গ সবশেষে দিয়েছেন। ৩য় খণ্ডে ১২১ পৃষ্ঠাতে দেখছি ‘ওগো তুমি নব নব রূপে’ গানের স্বরলিপি প্রসঙ্গ প্রথম দিকে দিয়েছেন। কোনও গানের সুর নির্দেশ করেছেন, কোনও গানে কবেননি। কোথাও গানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কোথাও দেননি। যে কোনও একটি নির্দিষ্ট নীতি মেনে চললে আরও ভালো হয়।

লক্ষকবা গেল, ‘উৎসর্গ’ স্মৃতিতে কোনও কোনও গ্রন্থের ‘উৎসর্গ’ অংশের পরিচয় দিয়েছেন, কোনও কোনও অংশের দেননি। যেমন চৈতালী, খেয়া, জামলী কাবোব উৎসর্গের পরিচয় দিয়েছেন, বিসর্জনব, চিত্রাঙ্গদাব দেননি। বলাকাব ‘উৎসর্গ’ কবিতার প্রথম লাইন ধরে আলোচনা অন্তত্ন দিয়েছেন। তাতে পবিকল্পনাব সম্মতি নষ্ট হয়েছে।

তৃতীয়ত, তথ্যগত একটি ভ্রান্তিও প্রাপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ কবি। ২য় খণ্ড পৃ. ৮১ ‘তে অঁধাব বজ্রনী পোহালো’ কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য বলে লেখক যা দিয়েছেন সেটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অমূল্যধন বলতে চেয়েছিলেন, কবিতাটি নয় মাত্রার ছন্দে লিখিত নয়, বাংলায় আদপেই নয় মাত্রার ছন্দ হতে পারে না। এ কবিতাষ পূর্ণ পর্বমাপ ছয় মাত্রা, তারপরে তিনমাত্রার অপূর্ণ পর্ব এসে নয় মাত্রা হয়েছে।

বিপুলায়তন তথ্যবহুল কাজে এমন সামান্য কিছু কিছু ত্রুটি থাকবেই। সেটি তেমন কিছু দোষের কথা নয়। লেখক অনায়াসে ভবিষ্যত সংস্করণে এগুলি সংশোধন করে নিতে পারবেন। সমালোচকের কর্তব্য হিসাবে শুধু সেদিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।

গ্রন্থটির গুণেব দিকেই বরং লক্ষ্য করতে গেলে বিশ্বাসে অভিব্যক্ত হতে হয়। তিনি অধুনা ছাপ্পা বহু উপকরণ এনে ববীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার উপর ধেরূপ নতুন আলোকপাত করেছেন সেখানে এক অনুলস সজাগদৃষ্টি গবেষককে আবিস্কার করা যায়।

দু’-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ২য় খণ্ড—পৃ. ৮৫ ওতে প্রহাসিনীর ‘আধুনিকা’ কবিতাটি কোন প্রসঙ্গে কি ভাবে লিখিত হয়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে অপবাক্তিতা দেবীর প্রাসঙ্গিক কবিতাংশটি তিনি সংগ্রহ কবে দিতে ভোলেননি। পৃ. ১১৭-১৮ তে ‘আমায় বোলোনা’ গানটি কবি কোন উপলক্ষে রচনা কবেছিলেন লেখক বহুসহকারে সে তথ্য উদ্ধার কবে দিয়েছেন। পৃ. ২৩২-৪০-এ সানাই কাবোর ‘আফ্রান’ কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক তাব গীতি-রূপান্তর সম্বন্ধে উল্লেখ করতে ভোলেননি। তৃতীয় খণ্ডেও এমন সমস্ত সম্পাদনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃ. ৮৪-৮৬ তে ‘একটি পুর্বাতন কথা’ প্রবন্ধ বচনার আনুপূর্বিক ইতিহাস লেখক সংগ্রহই কবে দিয়েছেন; পৃ. ১১৭-১৮ তে ‘এই মহামানব আসে’ গানটির সবগুলি পাঠান্তর তিনি উদ্ধৃত কবেছেন। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। দু’-একটি উল্লেখ করলাম মাত্র। এমন একটি গ্রন্থ যে ববীন্দ্র সাহিত্য পাঠকদের অপবিহার্য নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। পাঠকদের তবক্ষ থেকে, এই মহৎ উদ্ভবের জন্ত, লেখক অবশ্যই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ লাভ করবেন।

গ্রন্থটির প্রকাশককেও তাব নতুন ধরণের উদ্ভবের জন্ত ধন্যবাদ জানাতে হয়। বাঁধাই এবং মুদ্রণ সৌষ্ঠবে গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়েছে। তবে সবিনয়ে একটি কথা বলতে চাই, সাধারণ পাঠকদের ব্যবহারের পক্ষে গ্রন্থের মূল্য কিছু কম ধার্য করলেই ভালো হ’ত বিশেষ কবে গ্রন্থ যেখানে দশবারো খণ্ডের কমে শেষ হচ্ছেনা।

—নীলরতন সেন

আমাদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিপ্লবলাল ধর।
প্রকাশক : ক্যালকাটা পাবলিশাস। মূল্য : আট টাকা।

“আমাদের রবীন্দ্রনাথ” একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। বাংলাদেশের কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংগৃহে থাকার মতই বই। কিশোর মনের গ্রহণোপযোগী ভাষায় ও গল্প-বলার ভংগীতেই লেখক

এ গ্রন্থের বিষয় বস্তু লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে কতটুকুই বা জানে? তারা জানে কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে আর জানে 'গীত-বিতান'কে বা রবীন্দ্র সংগীতকে আর শুনেছে 'শান্তিনিকেতন'র কথা। কিন্তু কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, আর সবার উপরে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, এই সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত যে সুবিপুল ব্যক্তি সত্ত্বা, যে অমৃতময় পুরুষ তাঁকে আমরা কতটুকু জানি বা জানার চেষ্টা করি?

সাধারণ মানুষের তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানা নিতান্তই উচিত ততটুকুই মাত্র লেখক বর্ণনা করেছেন। একটি অগাধ অনন্ত জীবন-সিন্ধুর তটবেশা ধরে তাব বিচিত্র গতিপথ ও ঝাঁক-ফেঁবা লক্ষ্য করেছেন মাত্র তার প্রতিটি ঢেউ গণনা করেন নি। তবে লেখক আমাদের নেহাৎ বঞ্চনাও করেন নি। সংক্ষিপ্ত পবিত্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষমতা ও কর্মকুশলতা, গঠনক্ষমতা বাঞ্ছনীয় বোধ, পল্লীর প্রতি আন্তরিকতা, মানবপ্রীতি সব কিছুই পরিচয় এক-স্মাচড়ে অথচ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত কবেছেন।

সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর গল্প বলার ধাবা-বাহিকতাটুকু। কোথাও তিনি পাঠককে ক্লান্ত কবে তোলেন নি। এক পর্বের সমাপ্তিতে আর এক পর্বের জন্তে আগ্রহটুকু সহজেই জাগিয়ে রাখতে পেরেছেন। ঘটনাব গতির সঙ্গে তাল বেখে জীবনের গতি স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক প্রবাহে এগিয়ে চলেছে। লেখকের ভাবালুতা বা ভক্তি প্রাবল্য কোথও মূল বস্তুব্যাকে অস্পষ্ট বা আচ্ছন্ন করে নি। একটি বিবট মহাজীবনের সার মাত্র সংকলনে এই তথ্যভিত্তিক বর্ণন ক্ষমতার নিষ্ঠাটুকু নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

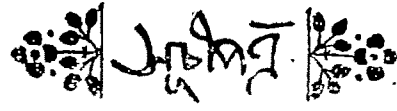
রবীন্দ্র-রচনাব আলোচনাব অংশটুকু নেহাৎ-ই

সংক্ষিপ্ত। এখানে লেখক নিজেকে একটিও মন্তব্য না করে প্রসিদ্ধ সমালোচক এবং সাহিত্যিকদের সমালোচনাব অংশবিশেষ উদ্ধার করেছেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের কি পরিমাণ প্রয়োজন-সিদ্ধ হবে বলা কঠিন-তবে সাহিত্যমুগ্ধগীর কাছে এ পদ্ধতি আদৃত হবে বলে মনে হয় না। কবির কোনও সৃষ্টির একটি সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-তা যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন, যে স্বাধ সঞ্চার করতে পাবে, টুকবো টুকরো মন্তব্যে তার কণামাত্রও যেন পাওয়া যায় না। লেখক অবশ্য এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচকদের নাম ও লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে এঁদেরও সঙ্গে পরিচিত হওয়া, উপবি-পাওনাব মতো।

রবীন্দ্রনাথের জীবন পঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থের তালিকার সংযোজন বইটিকে একটি অভিধানিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সাধারণ পাঠকের জন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবন কথা বইলো, আবাব রবীন্দ্র চর্চায় আগ্রহী পাঠকের জন্ত বইলো জীবন পঞ্জী, রচনাপঞ্জী। আগে শোনালেন যে মহাজীবনের গান শেষে লিখেছেন তালে লয়ে ঝাঁপা তারাই স্ববলিপি। কেউ বা তটে বসে মহাসিন্ধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ অবাক চোখে দেখবে, কেউ বা ডুবু বইবে সিন্ধুগর্ভের গভীরতাব সন্ধানে। যার যেমন জিজ্ঞাসা লেখক তার জন্তেই তেমনি বোধিনী তৈরী কবেছেন।

সবশেষে সর্বিনয়ে বলতে চাই মুদ্রণ প্রমাদ যা আছে তা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ এমন বইএর অত চটকদার সস্তা মানের প্রচ্ছদ কেন? আমরা কেন ভুলবো যে কিশোরদের হাতে আগবা ক্যাভবারী চকোলেটেব বাক্স তুলে দিচ্ছি না, দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা। রংচংএ প্রচ্ছদ দিয়ে ভোলাবার প্রয়োজন কি? —নন্দরানী চৌধুরী



৭৫৬.৩

০০২২/১

V.3 ১১০.৫

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ॥ তম বর্ষ তম সংখ্যা ॥

কার্তিক ॥ ১৩৭১ ॥

সম্পাদক ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকাব্যে বৌদ্ধকাহিনীর পুনর্জন্ম	নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	...	...	১০৫
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী				১১৭
পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	১২৪
রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনা ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	নন্দরাণী চৌধুরী	...	...	১২৮
আলোচনা—	সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য			১৩৪
গ্রন্থালোচনা—	সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু । শচীনন্দন সিংহ । বিভাস রায় চৌধুরী । ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী । নন্দরাণী চৌধুরী । প্রশান্ত মিত্র ।			১৩৯
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমকালীন জগৎ	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর			১৪৬

সহযোগী সম্পাদক । সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা—১

পুনশ্চ

পুনশ্চ কাব্য বাংলা কাব্যের ধারায় অভিনবত্বের দাবী নিয়ে এসেছিল। তার নানাদিকের বৈচিত্র্য আজও সমালোচকদের নতুন নতুন রচনা উদ্বুদ্ধ করেছে। এই গ্রন্থে পাঁচটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংকলিত হয়েছে।

পুনশ্চের প্রাণ—ভূদেব চৌধুরী

পুনশ্চের শিশু সম্পর্কিত কবিতা—সোমেন্দ্রনাথ বসু

পুনশ্চের আধ্যাত্মিক কবিতা—রণেন্দ্রনাথ দেব

পুনশ্চের ছন্দ—নীলরতন সেন

শিশুতীরের জনতা—অমলেন্দু বসু

মূল্য ০৫০ ন. প.

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা—২

স্মৃতিকথা (মল্লভূ)

সৌদামিনী দেবী

প্রফুল্লমণী দেবী

হেমলতা ঠাকুর

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

মহর্ষি জ্যোষ্ঠা কল্যাণী সৌদামিনী দেবী, বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লমণী দেবী, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা ঠাকুর এবং রবীন্দ্র পাঠকদের সুপরিচিত ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিচিত্রের একটি সংকলন। ঠাকুর পবিবারের দুই কন্যা ও দুই বধূ এই রচনাগুলি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার রসে পূর্ণ। বিশেষ করে চারটি মাঝখানে এই লেখাগুলি থেকে খুব কাছে পাওয়া যাবে—দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

মূল্য—১৫০

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা—৩

কড়ি ও কোমল ও মিঠে কড়া—৫০

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা—৪

আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—২৫০

জোড়াসাঁকোব ঠাকুর বাড়ীর একটি বিশেষ সময়ের জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

বৈতানিক প্রকাশনী

সাহ্যাল এণ্ড কোং

২৩বি বেধুন রো।

১-১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট

কলিকাতা-৬

কলিকাতা-১২

বৈজ্ঞানিক পরিচালিত

বীজ প্রসঙ্গ

সম্পাদক—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরাজীতে আছে সেক্সপীয়র কোয়ার্টারি সেক্সপীয়র ও তাঁর সৃষ্টির নানা দিক নিয়েই শুধু আলোচনা।

মহৎ স্রষ্টা ঋষি, ঋষিদের প্রতিভা একটা বিশেষ কাল ও দেশে উদ্ভূত হয়ে সমগ্র কাল ও সকল দেশকে স্পর্শ করে তাঁদের যতই জানবার চেষ্টা করি, দেখি দূর দিগন্তের মতো তাঁরা কেবলই আমাদের ধরা-ছেঁষার বাইরে চলে যাচ্ছেন। সৃষ্টিশীল প্রতিভা চির নবীন, চির

আধুনিক। তাঁদের জানবার চেষ্টা তাই কোনদিন স্তিমিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমাজ, তাঁর দেশ, তাঁর সৃষ্টি এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়ের পরিধে।

ত্রৈমাসিক রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের প্রকাশকাল—
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, কা্তিক, মাঘ। বাৎসরিক
মূল্য, ৪.০০, ডাকমাণ্ডল অতিরিক্ত ১.০০।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ—কার্যালয় : ৪নং এলগিন রোড,
কলিকাতা-২০

উইলস্-এর
উড্‌বাইন্

মাদে মেরা
বিত্র্যাত
সিগারেট

৩৫ পয়সায় দশটি

উইলস্-এর

উড্‌বাইন্



WIC-2 BEN

বুকল্যাণ্ডের বই

ডঃ হরিহর মিশ্র

কাস্তা ও কাব্য (সত্ত প্রকাশিত) ৫'০০

অসিতকুমার হালদার

রূপদর্শিকা ১০'০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২'৫০

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬'০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শাস্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী ৫'০০

শঙ্কুচন্দ্র বিচারত

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও
ভ্রমনিরাশ ৬'৫০

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর ঘরাণা ৫'০০

ডঃ ক্ষুদ্রিরাম দাস

রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় ১০'০০

ধীরানন্দ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা ১২'০০

রাবীন্দ্রিকী ৪'০০

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার

গুরুদেবের শাস্তিনিকেতন

(সত্ত প্রকাশিত) ৩'০০

মোহিতলাল মজুমদার

শ্রীকান্তের শরণচন্দ্র ১০'০০

ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব

কবিস্বরূপের সংজ্ঞা ৪'০০

ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি

চৈতন্য পরিকর ১৬'০০

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য ১০'০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু

বিদেশী ভারত সাধক ৩'৭৫

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৪'০০

রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড

প্রতি খণ্ড ৬'০০

ডঃ শিশিরকুমার দাস

মধুসূদনের কবিমানস ২'৫০

॥ বুকল্যাণ্ড গ্লাইভেট লিমিটেড ॥ > শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ ॥ শাখা: এলাহাবাদ, পাটনা



রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ॥

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥

কার্তিক ১৩৭১ ॥

রবীন্দ্রকাব্যে বৌদ্ধ কাহিনীর পুনর্জন্ম

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ 'ষাঁকে অস্তুরেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করতেন সেই করুণাঘন মহামানবের কথা তিনি তাঁর কবিতায় গানে প্রবন্ধে নাট্যে বহুভাবে বলে গেছেন; তাঁর প্রচারিত ধর্মের মর্মবাণী নতুন রূপায়ণে এবং নতুন ব্যাখ্যানে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা প্রেম মৈত্রী এবং অহিংসা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। হীনযানের শুদ্ধ তত্ত্ব অপেক্ষা মহাযানের ভক্তি ও প্রেমের রস তাঁকে বিশেষ ভাবে উদ্ভুদ্ধ করেছিল; কারণ এই ভাবনার সঙ্গে কবির নিজের মনোভাবনার গভীর এবং অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। বৌদ্ধধর্মে 'ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—“হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজা ভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎসত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংঘম নাই।”

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণ মুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের

প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্ব-ব্যাপী প্রেমের অন্তঃশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সৃষ্টি ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনো মতেই শব্দের নহে। বুদ্ধদেব এবং তাঁর ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্তে আর একটি উদ্ধৃতি আমরা প্রয়োজনীয় বোধ করছি। “যারা বলে ধর্ম নীতিই বৌদ্ধ ধর্মের চরম কথা তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র।...মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে।...কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া...সে যে কেবলই দেওয়া। এই প্রেমের ভাবে, এই আদান বিহীন প্রণানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্তে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে—তিনি তাঁর সাধন প্রণালীও বলে দিয়েছেন।...এই প্রণালীর নাম 'মেস্তি-ভাবনা'—মৈত্রী ভাবনা।

মেওঞ্চ সন্মলোকসিং

মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং

সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা, তার একটি মাত্র পুত্রকে যে রকম ভালোবাসেন সেই রকম ভালোবাসা।” (ব্রহ্মবিহার প্রবন্ধ)

দ্বিব্যাবদান, অবদানশতক, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি মহাযানীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কয়েকটি

কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কথা’ কাব্য গ্রন্থে এই প্রথম মৈত্রী ভাবনার রসে এবং রঙে নতুন রস এবং নতুন রঙ দিয়েছেন। ‘কথা’ কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যাহাদের কথা তুলিছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তুভিত হয়ে বও।

ভাষা দাও তারে হে মূনি অতীত
কথা কও কথা কও।

অতীত বৌদ্ধ কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিতায় ভাষা পেয়েছে নব রূপায়ণে। ‘সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ‘কথা’ ও কাহিনীর গল্পধারা সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই: “অনেক ঘটনা আছে যা জ্ঞানার অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা ঘনিষ্ঠ ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে স্থষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ ‘কথা’ ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মত নানা শাখায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল। কিন্তু এই ‘কথা’ ও কাহিনীর রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা।... ..সম্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনব মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে একী মহিমায়, একী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল।...”

আমরা যা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলুম তা রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নতুন ভাবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

(১)

‘কথা’ কাব্যের প্রথম বৌদ্ধ কবিতা—‘শ্রেষ্ঠ

ভিক্ষা’। অবদান শতক থেকে এর কাহিনী গৃহীত হয়েছে। মূল কাহিনী এইরূপ :—বুদ্ধের অন্ততম প্রধান শিষ্য অনাথ পিণ্ড নগরের সাহায্যার্থীগণকে সাহায্য করবার জন্তে, তাঁর প্রভু বুদ্ধদেবের জন্তে ভিক্ষা করতে, রাজ্যাব কাছ থেকে অল্পমতি লাভ করলেন। তিনি একটি হস্তী আরোহণ করে ভিক্ষার জন্তে নগরে বেরোলেন এবং বহু নগরবাসীর কাছ থেকে নানা ধাতব পাত্র এবং অঙ্গদবলয় প্রভৃতি বহুমূল্য নানা অলঙ্কার ভিক্ষা লাভ করলেন। এক দরিদ্র রমণীও ঝোপের পেছনে লুকিয়ে তার একমাত্র সঞ্চয় বস্ত্রখানি হাতীর উপর নিষ্ক্ষেপ করলেন ভিক্ষারূপে। ভিক্ষুক মুহূর্ত-মধ্যেই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে—সেই রমণীকে প্রচুর ধন উপহার দিলেন। পরে সেই রমণী বুদ্ধদেবের শরণাগত হয়ে সত্যধর্ম গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীর মূল ঘটনাটুকু মাত্র নিয়েছেন, কিন্তু কাহিনীর কাঠামো পরিবর্তিত করে কাহিনীর মর্মবাণীকে আরো করুণ আরো মহৎ করে তুলেছেন। প্রেমে করুণায় মাহুষ পরের জন্ত সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে; দয়া, মৈত্রী, প্রেম মাহুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, একথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নতুন ভাবে।

যখন তরুণ তপন মাত্র দেখা দিয়েছে তখন অনাথ পিণ্ড শূন্য রাজপথে একাকী চলেছেন, আব ডেকে ডেকে বলছেন, ‘প্রভুবুদ্ধ লাগি, আমি ভিক্ষা মাগি।’ পুরবাসীরা কত রত্ন কত মনিমাণিক্য থালা ভরা কত সোনা দিতে এল, কিন্তু সেটিকে ভ্রক্ষেপ না করে শূন্য ঝুলি স্বর্গে এগিবে চললেন সেই আশ্চর্য ভিখারী—

সম্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি সধনে—

ওগো পৌরজন, করো অবদান

ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,

দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান যতনে।

কিন্তু কেউ সেই শ্রেষ্ঠ দান দিতে পাবল না,

সমস্ত পুরবাসীর মাথা লজ্জায় অবনত হয়ে গেল—, মহানগরীর প্রান্ত পাব হয়ে সে সম্যাসী প্রবেশ করলেন অবণ্যে। সেখানে এক দীনা নারী ভূতলে শয়না ছিল, সে উঠে সাধুর চরণে প্রণাম কবল এবং আড়ালে গিয়ে—

একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে

বাছটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে—

তখন সেই ভিক্ষুক জয়ধ্বনি করে উঠলেন, “ধন্য মা, আমার সাধ তুমি পূর্ণ করেছ—” এবং সেই ছিন্ন বস্ত্র মাথায় তুলে নিয়ে চললেন ‘শ্রেষ্ঠ দান’ বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করতে।

মূল কাহিনীর শেষের দিক একেবারে বদলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মূলে আছে সকলের দান ভিক্ষু গ্রহণ কবেছেন, দীনা রমণীর দানও, যে দান সর্বশ্র এবং সেই দানেব প্রতিদানে অনেক ধন রত্ন, দান দিলেন দীনা রমণীকে। অবদান শতকের গল্পে স্পষ্টতঃই বৌদ্ধধর্ম মাহাত্ম্য প্রচাবিত হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধনবানের রাজসিক দান গৃহীত হয়নি, ভিত্তিয়ারী তা প্রত্যাখান কবেছেন, বারবাব বলেছেন, ‘দেহো তাবে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান যতনে। ‘যতনে’ অর্থ, শ্রদ্ধা দেয়ম, উভয়া দেয়ম। সংবিদা দেয়ম—ধন ‘গৌরবের যত্নতা সেখানে নেই—মুঠি মুঠি রত্ন কণিকাব’। প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শ্রদ্ধাব, প্রয়োজন প্রীতির, প্রয়োজন ভয়ের—আমাব দান গৃহীত হবে কি? আর ‘শ্রেষ্ঠ দান’ সর্বদান, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের ‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষায়’ দীনরমণী প্রথমে ‘নমিল সাধুর চরণ কমলে’ তার পর তার সর্বশ্র দিয়ে দিল। এখানে দানের প্রতিদান নেই। দানের জন্তেই দান। মূলেব দরিদ্র রমণীও নিজে কোন প্রতিদানের আশা করেননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রতিদানের কথা বাদ দিয়ে দান গৌরবকে মহত্তর করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বৌদ্ধধর্ম মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়নি। হয়েছে মানব-ধর্ম মাহাত্ম্য।

(২)

দ্বিতীয় বৌদ্ধ কবিতা—‘মস্তক বিক্রয়’। এ কবিতার কাহিনী মহাবুদ্ধবদান থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল কাহিনী এইরূপ :—বুদ্ধদেব তাঁর এক পূর্ব জন্মে মিথিলা দেশে বিজিতাবি নামক স্থানের রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতায় রাজ্যের সমস্ত ধন নষ্ট হতে দেখে মন্ত্রীরা তাঁকে নির্বাসিত করলেন। রাজা অতি দুঃখে অরণ্যে কালাতিপাত করতে লাগলেন। একদিন ইন্দ্র তাঁর দানধর্ম পরীক্ষা কববাব জন্তে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে অতিদানের নিন্দা করলেন। এবং তাঁর সামনেই এক নবকের সৃষ্টি করলেন—সেখানে অতি দানীরা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে। এসব দেখে শুনেও কিছু রাজা বিচলিত হলেন না। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—দান কবে যদি নবকে যেতে হয় তাও ভাল। ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং মেঘ সকলকে আদেশ কবলেন মিথিলায় যেন এক ফোটা বৃষ্টি না হয়। ফলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হল এবং তা থেকে রক্ষা পাবার জন্তে মিথিলাবাসীরা তাঁদের পূর্বরাজাকে আবার সিংহাসনে বসাল।

রবীন্দ্রনাথ ‘মস্তক বিক্রয়ে’ মূলকাহিনীর স্বত্রটুকু নিয়েছেন—সে স্বত্র দান-মহিমা। রাজা এখানে কোশলনৃপতি।

তাঁর তুলনা নাহি

জগৎ জুড়ি যশোগাথা

ক্ষীণের তিনি সদা শরণ ঠাই

দীনের তিনি পিতামাতা।

কাশীবাস্তবের প্রজাগণ পর্যন্ত কোশল নৃপতির দানের প্রশংসায় শত মুখ। কাশীরাজের তা সহ হল না। কোশলরাজকে বুদ্ধে পবাস্তিত করলেন।

কোশল রাজ হারি রণে

রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুর লাজে

পলায়ে গেল দূর বনে।

কিন্তু কাশীরাজের মনে শাস্তি নেই কারণ তাঁর প্রজারা

তখনও কোশল নৃপতির প্রশংসা করছে। সুতরাং কাশীরাজ ঘোষণা করলেন—

যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে

কনক শত দিব তারে—।

বনবাসী কোশলরাজও এ ঘোষণা শুনলেন। তারপর একদিন এক মগ্নতরী দুর্ভাগা বণিক বনপথে কোশল রাজকেই কোশলরাজ্যের পথ জিজ্ঞাসা করল। অনাথনাথ দীনের গতি কোশলনৃপতি তার অভাব দূর করবেন। অতি কষ্টে অশ্রুরোধ কবে জটধারী কোশলরাজ সেই বণিককে নিয়ে কাশীরাজ্যের সভায় উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন—

আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ

দেহো তা মোব সাধিটিরে।—

সমস্ত সভাস্থল শ্রদ্ধায় বিষ্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাশীরাজ সিংহাসন থেকে নেমে সেই দানবীরকে বসালেন রাজ্যসনে—

মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে

ধন্য কহে পূবজনে।

মূল কাহিনীর বিজ্ঞিতারির রাজ্যের নির্বাসন এবং দানমহিমার পুত্রটিকে মাত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় নাটকীয় ভঙ্গিমায় এক অপূর্ব রোমান্টিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। আর সমগ্র কবিতার মধ্য থেকে হীরকত্বাতিতে জ্বলে উঠছে অসামান্য মানব শ্রীতি।

(৩)

তৃতীয় বৌদ্ধ কবিতা পূজারিণী। এর মূল অবদানশতকে (কল্পক্ষমাবহানে)। মূল কাহিনী এইরূপ—নৃপতি বিধিসার বুদ্ধদেবের নিকট থেকে সমস্ত জ্ঞান লাভ কবে বুদ্ধদেবের নথ্য এবং কেশ তাঁর অস্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার উপর এক বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করেন। রাজবাড়ীর দাসীরা সেই স্তূপ নিত্য পরিষ্কার করত।

বিধিসারের পুত্র অজাতশত্রু তাব বন্ধু দেবদত্তের প্ররোচনায় পিতৃহত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন

এবং আদেশ জারী করেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি কেউ অহরক্তি দেখালে তাকে হত্যা করা হবে এবং অস্তঃ-পুরস্থিত স্তূপ পরিষ্কার করলেও সেই শাস্তি হবে। শ্রীমতী নামে রাজবাড়ীর এক বুদ্ধভক্ত দাসী সেই আদেশ অমান্য করে স্তূপ পরিষ্কার করলেন এবং প্রদীপমালা জ্বালালেন। অজাতশত্রু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করবার আদেশ দিলেন। মৃত্যুর পূর্বে শ্রীমতী বেণুবনে প্রভু বুদ্ধের সামনে দিবা দেহে উপস্থিত হলেন এবং মানবের পর্বত প্রমাণ দুঃখ সত্যের বজ্র দিয়ে ধ্বংস করে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তব্য বস্তু লাভ করলেন।

অজাতশত্রু পরে অহুতপ্ত হন এবং পোষধ উপবাস করেন। শাক্যসিংহ তাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং কেন তিনি পিতৃহত্যা করেছিলেন তাও বলেন। পূর্বজন্মে বিধিসার একজন বণিক ছিলেন। এক প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখে তিনি বলেন—এই ভবঘূর্বে-দের পা কাটা উচিত। এই অজ্ঞায় পাপ কথা বলার ফলে আব জন্মে তাঁর পুত্র অজাতশত্রু তাব পা কাটেন।

(কোথাও কোথাও উল্লিখিত বুদ্ধভক্ত মহিলা অজাতশত্রুর বিমাতা বলেও কথিত হয়েছেন)

পূজারিণী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীকে প্রায়শঃ অহুসরণ করেছেন। মূল কাহিনীর হত্যার পূর্বে শ্রীমতীর দিবা দেহে বুদ্ধদেবের কাছে আসার ব্যাপ্যাবটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি, কারণ রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে এই লোকজগতের সুখ দুঃখ হাসিকান্নাকেই তাঁর বচনায় প্রকাশ করেছেন। পূজারিণী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক নিষ্ঠাবতী বুদ্ধভক্তা—যুহা পণ ব্রতচারিণীর শাস্তমধুব অথচ বজ্রকঠিন মূর্তি অঙ্কিত করেছেন।

দৌর্দণ্ডপ্রতাপ পিতৃহত্যা নিষ্ঠুর রাজা অজাতশত্রুর আদেশ অমান্য করে প্রভু বুদ্ধের শরণাগত একান্ত ভক্ত দাসী শ্রীমতী পুষ্প প্রদীপ ধালয় সাজিয়ে একদিন স্তূপপূজায় যাবাব জন্মে প্রস্তুত হলেন। তাঁর সেই পূজাবিধী মূর্তি রেখে—রাজমহিষী থেকে আরম্ভ কবে রাজপুত্রবধূ রাজকন্যা সকলেই ভয়ে শিউবে উঠলেন—

রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে?
শ্রীমতী সে নিষেধ শুনলেন না, একটুও ভীত হলেন
না; বরং সবাইকে ডেকে বলতে লাগলেন—

হে পুণ্ডরীক

হয়েছে প্রভুব পূজার সময়—

তার ডাক শুনে কেউ বা ভয়ে শিহবিত হল, কেউ বা
তাকে গালি দিল।

দিনেব শেষে যখন রাজ দেবালয়ে আরতির ঘণ্টা
বেজে উঠল, তখন প্রহরীগণ চমকে উঠে দেখল নিষিদ্ধ
সুপপাদ মূলে কে যেন সাবি সাবি প্রদীপমালা
জালিয়েছে। পুরস্কৃত মুক্ত কৃপাণ হাতে ছুটে এসে
জিজ্ঞেস করল, কে তুই মবতে ভয় করিস নে?—

মধুর কণ্ঠে শুনিল 'শ্রীমতী—

আমি বুদ্ধের দাসী'—

পূজাবিধি কবিতার শেষ স্তবকে রবীন্দ্রনাথ যে
কল্পণভাঙরা ছবি আঁকলেন তা তাঁর স্মৃতি, স্মৃতির
অভূত প্রবণ বোমাস্টিক মনের পক্ষেই সম্ভব—

সেদিন শুভ পাখা ফলকে

পড়িল রক্ত লিখা।

সেদিন শারদ স্ফুট নিশীথে

প্রাসাদ কাননে নীরব নিভতে—

সুপপাদ মূলে নিবিল চকিতে

শেষ আরতির শিখা।

একটি নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার
কত কল্প, কত মহৎ হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনীর বুদ্ধ
পূজার পুরস্কার প্রাপ্তিকে বাদ দিবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর
কাহিনীর কাব্যিক এবং মানসিক আবেদন আরো
বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই কাহিনীরই পূর্ণায়ত সার্থকতার
ট্রাজিক রূপায়ণ ঘটেছে কবির 'নটীর পূজায়'।

(৪)

৪র্থ বৌদ্ধ কবিতা—অভিসার—এর মূল বোধি-
সম্বলদান কল্পিত। কাহিনীটি উপপুস্তক অবদান

নামেও পরিচিত, মূল কাহিনীটি এইরূপ:—মথুরা
পুরবাসী শুশ্রূতা তাঁর পুত্র উপপুস্তকে সোনবাসীর শিষ্য
করতে ইচ্ছা করেছিলেন। উপপুস্তক সোনবাসীর প্রতি
অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

উপপুস্তক খুব সুপুরুষ ছিলেন। বাসবদত্তা নামে
এক বারাকনা তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হয় এবং তাব
দাসীকে উপপুস্তকের কাছে পাঠায়। উপপুস্তক তাকে
বললেন—বারাকনার কাছে যাবার এখনও উপযুক্ত
সময় হয় নি। যথা সময় আমি যাব।

কিছু কাল পবে এই বাসবদত্তা তাব জনৈক
প্রণয়ীর প্রবোচনার আর এক প্রণয়ীকে বিষ প্রয়োগে
হত্যা করে। হত্যাপরোধে তার যন্ত্রণাপূর্ণ মৃত্যু-দণ্ড হয়।
জন্মদ তদনুসারে তার নাক কান চুল নথ সব কেটে
কোলে এবং তাকে পরিচ্ছন্ন করি। 'একটি
বারাকনাকে দেখার এই উপযুক্ত সময় হয়েছে'—এই
ভেবে উপপুস্তক বাসবদত্তার কাছে গেলেন এবং তাকে
স্বর্গ্য মতে দীক্ষিত করলেন। বাসবদত্তা তাতে পরমা-
শান্তি লাভ করলেন। উপপুস্তক নিজেও পরে একজন
অর্হৎ হলেন।

রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীর প্রায় অনুসরণ কবেছেন
শেষের অংশ ছাড়া। কিন্তু অভিসার কবিতায় যে—
অপূর্ব শব্দ গ্রন্থনা ও কলাকৌশলে কাব্যসৌন্দর্য্য সৃষ্টি
হয়েছে তা বিস্ময়কর।

কবিতা আরম্ভ হয়েছে এক স্বপ্নময় রোমান্টিক
পটভূমিকায় রোমান্টিক ঘটনাচক্রের আবর্তনে। নিজিতা
মথুরা পুত্রী—'নিশীথে তার আবেগ গগনে ঘন মেঘে
অবলুপ্ত' সন্ন্যাসী উপপুস্তক এক প্রাচীরের তলায় সুপ্ত।
কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর বক্ষে কার 'নুপুর শিকিত পদ
সহসা বাজিল?' চমকে জেগে উঠলেন সন্ন্যাসী, তাঁর
চোখে দীপের তীব্র আলোক এসে পড়ল। কিন্তু কী
সুন্দর, কমান্দ্রের সেই চোখ। নগরের নটী বাসবদত্তা
অভিসারে চলেছেন। তারই চরণ সুপ্ত সন্ন্যাসীর
গায়ে এসে অকস্মাৎ লেগেছে। চমকে থেমে গেলেন
বাসবদত্তা এবং 'প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন

গৌর কাস্তি।’ আর সেই মুহূর্তে আকৃষ্টা হলেন অভি-
সাবিকা নগবনটী। সঙ্গে সঙ্গে তাব আকর্ষণের
আকৃতি প্রকাশ পেল।

কহিল বমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
‘ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর
দয়া কবে যদি গৃহে চलो মোর,
এ ধবণীভল কঠিন কঠোব
এ নহে তোমার শয্যা।’

একটুও বিকপতা কিংবা বিকার নেই সন্ন্যাসীর
মনে, করুণ বচনে বললেন, এখনও আমাব সময় হয়নি,
যেদিন সময় হবে, ‘আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।’

কাব্যের প্রয়োজনে ববীন্দ্রনাথ মূলকাহিনীর কথা
বাদ দিয়ে উপগুপ্ত এবং বাসবদত্তার সাক্ষাৎ এইভাবে
ঘটালেন। দাসীব মধ্যস্থতা এখানে নেই। কিন্তু
আপাতঃ প্রত্যাখ্যান এবং ভবিষ্যৎ আশ্বাসের সঙ্গে
সঙ্গেই একটি গভীর ইঙ্গিত দিলেন কবি বাসবদত্তাব
ভাবী জীবন সম্পর্কে বঙ্গ বিদ্যাতের প্রতীকিতায়।—

আকাশে বজ্র ঘোব পরিহাসে—

হাসিল অট্টহাস্ত।

মূলকাহিনীর শেষ অংশ ববীন্দ্রনাথ একেবারে
পরিবর্তিত করেছেন। এখানে প্রণয়ী হত্যা এবং
তার ফলে বাসবদত্তার মৃত্যুও প্রতীতি নেই।

কবিতায় আছে বাসবদত্তাব সঙ্গে উপগুপ্তের
সাক্ষাতের পর কিছু কাল কেটে গেছে।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ

এসেছে চৈত্র সঙ্ক্যা।

বাতাস হয়েছে উতলা আকুল।—আব সেই দখিনা
পবনে-ভবা জ্যোৎস্নাবাত্রে নির্জন পথে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
একা চলেছেন,—কোথায় চলেছেন এই সন্ন্যাসী?
‘এত দিন পরে এসেছে কি তাব আজি অভিসাব
রাজি?’

নগবের বাইরে এক পথিকার পারে এসে দাঁড়ালেন
সন্ন্যাসী। সেখানে এক আম্রকাননে নিদারুণ বসন্ত

বোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে নগরের নটী যৌবন
মদমত্তা বাসবদত্তা। সমস্ত দেহ তাব মারীশুটিকায়
ভবে গেছে—সকলে তাকে ঘুণায় ভয়ে ত্যাগ করে
নগবের বাইরে পরিধাব পারে ফেলে দিয়েছে।

সন্ন্যাসী বসি আডষ্ট শিব—
তুলি নিল নিজ অর্ধে।
ঢালি দিল জল শুদ্ধ অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শিব’পবে,
লেপি দিল দেহ আপনার কবে—
শ্রীত চন্দন পঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কুঞ্জিছে কোকিল।
যামিনী জোছনামত্তা।

‘কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়,
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
আজি বজ্রনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।’

মূলকাহিনীর সূত্রাংশ অবলম্বন করে ববীন্দ্রনাথ
সন্ন্যাসী উপগুপ্তের এই অপূর্ব অভিসাব কাহিনী
রচনা করলেন।

মূলে উপগুপ্ত বলেছেন যখন সময় হবে, তখনই
যাব। ববীন্দ্রনাথও ঠিক তাই। তবুও মূলে এবং
কবিতায় প্রচুর প্রভেদ। মূলের বাসবদত্তা শান্তি
পেয়েছে নরহত্যার জন্তে, আব কবিতার বাসবদত্তা
শান্তি পাচ্ছে তাব অশুচি জীবনের জন্তে। এমিলি
জোন্সার ‘নানা’ব কথা ভাবানুধে মনে পড়ে।

তা ছাড়া, মূলে এবং কবিতায় শান্তিরও প্রকাব
ভেদ আছে। কর্ণ নাসা কেশ কর্তন কিংবা নাবীর
পবিচ্ছদ অপসারণ—এ জাতীয় বীভৎস শান্তির কথা
ববীন্দ্রনাথের পবিশীলিত মন কল্পনাও কবতে পাবে না।
তুই কাহিনীতেই—উপগুপ্তের আচরণে বৌদ্ধ প্রেম
মৈত্রী-ক্ষমা প্রতিফলিত। তবু, ববীন্দ্রনাথ কাহিনীর
শেষাংশের পরিবর্তন ঘটয়ে কেবল তাঁব সূক্ষ্ম
কচিবোধের পবিচয়ই দেননি, ভয়ানক রসের বর্জন

এবং করুণ রসের সঞ্চারণ দ্বারা সমগ্র কবিতাকে শুভশ্রীমণ্ডিত করেছেন।

মূল কাহিনীর ফলশ্রুতি অভিসার কবিতার শেষে নেই। আছে পরম প্রেম, পরমা শাস্তি, আর আছে শুচিশুদ্ধ রোমান্টিকতা।

(৫)

৫ম বৌদ্ধ কবিতা পরিশোধ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামার পূর্বরূপ। মূল কাহিনী মহাবল্লভদান থেকে গৃহীত।

কাহিনীটি এইরূপ। তক্ষশিলানিবাসী বণিক বজ্রসেন বারাগসীতে মেলায় অশ্ব বিক্রয় করতে এসেছিল। পথে তার সর্বশ্ব অপহৃত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সে এক মন্দিরে চোব বলে ধৃত হয় এবং তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। নগরের শ্রেষ্ঠা বারাগসী শ্রামা বজ্রসেনকে তখন দেখে এবং তার অপরাধ সৌন্দর্যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রামা বজ্রসেনকে রক্ষা করতে বন্ধপরিকর হয়। তারই ইচ্ছায় তার এক পরিচারিকার কৌশলে বজ্রসেনকে জল্লাদের কাছ থেকে সবিয়ে নেওয়া হয় এবং শ্যামার রূপমুগ্ধ উদ্ভীয় নামক এক শ্রেষ্ঠপুত্রকে সেখানে পাঠানো হয় বজ্রসেনকে খাও দেবার অছিলায়। জল্লাদ সেই শ্রেষ্ঠপুত্রকে বজ্রসেনের পবিত্র হত্যা করে। বজ্রসেন তার মুক্তির জন্তে শ্যামার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল; কিন্তু পরে শ্রেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর কারণ জানাব পর থেকে তার মনে আর শাস্তি ছিল না। সে একদিন শ্যামাকে প্রচুর মদ খাইয়ে মাতাল কবে গলা টিপে জলে ডুবিয়ে বাখল। যখন সে ভাবল শ্যামা মরে গেছে তখন তাকে টেনে তুলে ঘাটের সিঁড়িতে ফেলে পালিয়ে গেল।

কিন্তু শ্রামা মরে নি। তার মা কাছে ছিল তার চেষ্টায় সে বেঁচে উঠল। এবং বেঁচে উঠেই শ্রামা এক ভিক্ষুণীর সাহায্যে বজ্রসেনকে তাব প্রেম নিবেদন করে সাদর আহ্বান জানাল। পূর্ব-জন্মে বুদ্ধই এই বজ্রসেন ছিলেন, এবং যশোধরা শ্রামা ছিলেন।

মূল কাহিনীর কথাবস্তু মোটামুটি নিলেও 'রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' কবিতায় (এবং পরে নৃত্যনাট্য শ্রামায়) তাঁর যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়েছেন কাব্য এবং নাট্য সৃষ্টির প্রয়োজনে।

মূল কাহিনীতে শ্রেষ্ঠপুত্রের প্রাণদণ্ড তার অজ্ঞাতসারে শ্রামার কৌশলে ঘটেছিল। কিন্তু 'পরিশোধ' কবিতায় 'এবং নৃত্যনাট্য শ্রামায় শ্রেষ্ঠপুত্র উদ্ভীয় শ্যামাব অমুবোধ এবং নিজেব বার্থ প্রেমের প্রতিক্রিয়াক্রমেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া, মূল-কাহিনীতে শ্যামার জীবনের পরিণতি দুঃখময় হয়েছিল, এমন কোন ইঙ্গিত নেই। সেখানে দেখা যায় শ্যামাকে হত্যা করার চেষ্টা সফলও শ্রামার প্রেম অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং সে বজ্রসেনকে ক্ষিরে পাবার জন্তে সপ্রেম আহ্বান জানিয়েছে।

'পরিশোধ' কবিতায় শ্যামাব প্রেম ব্যর্থতায় পর্ববসিত হয়েছে। শ্যামার জীবনে ট্রাজিডি নেমে এসেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর মর্ম-স্থলে রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

মূলে শ্যামার প্রতি বজ্রসেনের প্রেম নেই—কৃতজ্ঞতা আছে। কিন্তু যখন শ্রেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর প্রকৃত কাণ্ড জানল, তখন শ্যামার প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে তার ঘৃণা জন্মাল। সে শ্যামাকে তার পাপ-কর্মের জন্তে হত্যা করতে চেষ্টা করল।

'পরিশোধ' কবিতায় মহেন্দ্রনিবাসিত কাস্তি বজ্রসেনের রূপমুগ্ধ শ্রামা বজ্রসেনের মুক্তির পর নৌকায় উঠেই তাব কাছে প্রেম নিবেদন করছে—

'তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি—

সকল বন্ধন টুটি হে স্বদয়স্বামা

জীবন মরণ প্রভু।'

বজ্রসেন সে প্রেম-স্বীকার করেছে, শ্যামার প্রতি সেও অমুরক্ত। সে অমুরাগের সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জড়িয়ে আছে—

প্রোয়দীর মৃধ

দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক

বঙ্কসেন শুধাইল, কহো মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জ্বাণিতে চাহি অগ্নি বিদেশিনী
এ দিন দরিত্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।

কিন্তু ট্রাজিডি ঘনিষে এল যখন বঙ্কসেন উত্তীর্ণ
কাহিনী জানল। শ্যামাকে সে ত্যাগ করে চলে গেল।
প্রেমব্যাকুল শ্যামা বঙ্কসেনের পশ্চাদ্ধাবন করে
তাকে—

বজ্রার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গন—
আর বলল,

তুমি শাস্তি দাও মোরে, কবো মর্মঘাত
শেষ করে দাও মোর হৃৎপুরুষার।
বঙ্কসেন ক্রোধে ঘৃণায় তার শাস রুদ্ধ করল। শ্যামাব
শেষ কাকূতি স্বর 'বারেক' ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত
শ্বাসে' এবং

তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি পরে অসাড় পড়নে।
মূলে বঙ্কসেন শ্যামার গলা টিপে জলে ডুবিয়ে
হত্যা করতে চেঁচা করেছিল। এখানে প্রেমাকুলা
অমৃতপ্তা প্রণয়িনীকে হত্যা করার জন্তে শাসরোধ
কবেছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই হত্যা চেঁচার বীভৎস
বর্ণনা দেননি। তাঁর কবি মন এক ব্যঙ্গনাময় চিত্র সৃষ্টি
করেছে।

তারপবে বঙ্কসেনের অনুতাপ আর প্রেমের
আকৃতি কবি প্রকাশ কবেছেন অপূর্ব কাব্যসুধায়।
বঙ্কসেন শ্যামার পবিত্র নুপুর, তাব নীলাধর বজ্র
বুকে মুখে চেপে প্রিয়ার স্পর্শ অনুভব করতে লাগল।
শ্যামাকে সে আঘাত করেছে, কিন্তু বঙ্কসেন জানে
শ্যামাব প্রেম কত বড়, কত প্রাণবন্ত, প্রেমের জন্তে সে
কী না করতে পারে। এ প্রেমকে গ্রহণ করতে এবং
শ্যামাকে ক্ষমা কবতে না পারাব জন্তে বঙ্কসেনের
অমূল্যোচনা এসেছে। কিন্তু ক্ষমিকের জন্তে। কাবণ
এক পরেই ফিরে এসে যখন—

‘চরণে পড়িল শ্যামা ক্ষম মোরে ক্ষম
গেলনা তো সুকঠিন এ-পর্যায় মম’
তোমার করুণ করে—

তখন বঙ্কসেনের মন এক মুহূর্তের জন্তে প্রেমের
কল্পণায় অমূল্যে কোমল হয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই
সে বজ্রকঠিন হয়ে শ্যামাকে দূরে ঠেলে দিল—
মুদি ছুই আঁখি।

কহিল-কিরিয়ে মুখ—‘যাও যাও ফিরে
মোরে ছেড়ে চলে যাও।’

শ্যামা নত শিবে নীরব রইল একচক্ষুণ এবং
পরক্ষণেই—বঙ্ক সেনকে প্রণাম করে আঁধার বনের
পথে চলে গেল। বঙ্কসেন চরম মর্মান্তিক পরিশোধ
কবল শ্যামার সবত্যাগী সবপ্রাণী প্রেমের।

মূলকাহিনীর সমাপ্তিতে শ্যামা বঙ্কসেনের মিলনের
যে ইঙ্গিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেননি। তিনি
শ্যামা বঙ্কসেনের কাহিনীকে এক চূড়ান্ত ট্রাজিডিতে
রূপান্তরিত করলেন। বঙ্কসেনের মানসিক দ্বন্দ্ব,
শ্যামার সবপ্রাণী প্রেম—যে প্রেম পাপ পুণ্যের বিচার
করে না, প্রেমের জন্তে সব কিছু করতে হবে সব কিছু
হাবাতে প্রস্তুত—এবং সর্বোপরি এই কবিতার চিত্র
কল্প, নাট্যরস ও ভাষার বর্ণাঢ্যতা পাঠককে মুগ্ধ করে।

শ্যামানুতানাতো এ কাহিনীব আরো পরিপূর্ণ
ট্রাজিক রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের এক বিশ্লেষণের সৃষ্টি।

(৩৬)

৩৬ বৌদ্ধ কবিতা—সামান্ত ক্ষতি—মূল কাহিনী
দ্বিবি্যাবদানমালা থেকে গৃহীত। কাহিনীটি এইরূপ—

যখন বুদ্ধ কন্মায়দম্যে ছিলেন তখন মার্কণ্ডিক নামে
এক ঋষি তাঁকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান কবতে ইচ্ছা
কবলেন। কিন্তু বুদ্ধ রাজ্যী হলেন না। তারপর তিনি
বললেন—পূর্বজন্মে এক কর্মকাবের এক কন্যা ছিল।
সেই কর্মকাবের শিক্ষানবিশ ছিল এক যুবক।
কর্মকার যুবককে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে চাইল।
কিন্তু সেই যুবক স্বীকৃত হলেন না। বুদ্ধদেব বললেন,
তিনিটি সেই যুবক এবং এই ঋষি (মার্কণ্ডিক) সেই

কর্মকাব। বুদ্ধদেব মাকণ্ডিক কাহিনীর শেষাংশও বলেছিলেন।—মাকণ্ডিক তারপর কৌশাধীতে গেলেন এবং রাজা উদয়নকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন। তিনি নিজে উদয়নের মন্ত্রী হলেন। একসময়ে রাজা দিম্বিঞ্জয়ে গেলে অহুপমা (মাকণ্ডিকের কন্যা) অস্ত্রপুরে আগুন লাগিয়ে তার পাঁচশত সপত্নীকে হত্যা করল; তাব মধ্যে প্রধানা মহিষী জামাবতীও ছিলেন। উদয়ন যখন প্রভুবুদ্ধকে তাঁর পাঁচশত পত্নীর এই পরিণতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন অতীতে বারানসীতে ব্রহ্মবন্ত রাজা ছিলেন; তাঁর পাঁচশত রাণী ছিলেন। একদা তাঁরা এক বাগান বাড়ীতে যান। সেখানে নিকটে এক নদীতে স্নান করে তাদের শ্রীত লাগে। তখন প্রধানা মহিষী তাঁর দাসীকে নদীতীরে এক কুটীরে আগুন দিতে বলেন যাতে তিনি গা গরম করতে পারেন। দাসী বলল—ওটা এক ঋষির কুটীর। তিনি তবুও তাকে আগুন লাগাতে আদেশ করলেন। ঋষি রক্ষা পেলেন এবং আকাশে উঠে তিনি রাণীকে আশীর্বাদ করলেন। তখন সেই পাঁচশত রাণীই অহুতাপে দহত্ব হয়ে প্রাণনা করলেন—তাঁদের যেন অভিশাপ দেওয়া হয়। এবং তাঁরা যেন পরে পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ঐ পাঁচ শত রাণীই পরজন্মে উদয়নের পাঁচশত পত্নী এবং প্রধান মহিষী জামাবতী হন।

স্নান করার পর শীতার্ভ দেহ তপ্ত করার জন্তে রাজমহিষীর আদেশে ঋষির কুটীরে আগুন লাগানো—মূল কাহিনীর এই মর্মটুকু রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন এবং স্বকীয় মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে এক করুণ বেদনাময় অঞ্চল পরিণামে শুভঙ্কর ইজিতময় কবিতার সৃষ্টি করেছেন। মূলকাহিনীর শেষের দিকে যে অহুতাপের কথা আছে রবীন্দ্রনাথ তা বাদ দিয়ে সচরাচর দৃষ্ট ধনমন্ত উচ্চতলবাসীদের মূঢ় অহঙ্কার রাণীর মুখ দিয়ে অতিরিক্ত এবং নগ্নভাবে প্রকাশ করিয়েছেন।

রুধিয়া কহিল রাজার মহিষী—
গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে শুটি কত জীর্ণ কুটীর—
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত-ধন যায় রাজ মহিষীব—
এক প্রহরের প্রমোদে?

ছোটর দুখকে বড় কোনোদিন দুঃখ বলে ভাবে না—
চিরকালই এই চলেছে। বডব প্রমোদেব জন্তে
ছোটর সর্বনাশে বডর কিছুই আসে যায় না। কিন্তু
রবীন্দ্রনাথের প্রেমমনোভাব তা স্বীকার করে না—

কহিলেন রাজা উদ্যত রোধ —
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—
যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটীরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি
বুঝাব তোমারে নিম্নয়ে।

রাজার আদেশে রাণীকে ভিখারিনীর সাজে
সাজানো হল—

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—
এক প্রহরের শীলায় তোমার
যে-কটি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পার সে-কটি আবার
গডি দিতে হবে তোমারে।
'বৎসর কাল দিলেম সময়,
তারপরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়িয়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া—'

মূলকাহিনীতে যে দাসীটি রাণীকে ঋষির কুটীরে
আগুন লাগাতে নিষেধ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর
কবিতায় তার নাম দিয়েছেন মালতী—। বৌদ্ধ

মহমন্ত নিষ্ঠুর যুবতীদের পাশে এক দীনা দাসীর দবদী
মূর্তি অতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

মূলে এবং কবিতায়—উভয়ত্রই কাশীব মহিষী।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় এই নামকরণ করেছেন
কল্পনা। নামার্থের কী মমস্কন্ধ পরিহাস আমরা মানুষের
জীবনে অহরহ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ
নামকরণ তারই ইঙ্গিতবাহী।

(৭)

৭ম বৌদ্ধ কবিতা—মূল্যপ্রাপ্তি—মূল কাহিনী
অবদান শতক থেকে নেওয়া হয়েছে। কাহিনীটি
এইরূপ :—একদিন প্রভু বুদ্ধ জীবন্তীপুরীর পথ দিয়ে
যাচ্ছিলেন। একটি বালক বাজারের এক মালাকারের
কাছ থেকে একটি পূর্ণ বিকশিত পদ্ম এনে বুদ্ধদেবের
মাথার উপর অর্পণ করে। বুদ্ধদেব একটু হেসে
বললেন,—‘এই পুণ্য কর্মের ফলে ছেলটি খুব বড়
হবে—তার নাম হবে পদ্মোত্তর।’

অত্যাগত বৌদ্ধ কাহিনীর মত এই কাহিনীকেও
রবীন্দ্রনাথ নতুন রূপ দিয়েছেন। বৌদ্ধ কাহিনীগুলির
শেষের দিকে যে ফলশ্রুতি কিংবা অন্মাস্তর বৃত্তান্ত থাকে
রবীন্দ্রনাথ সেগুলো গ্রহণ করেন না। তিনি তাঁর
মনোভাবনার আলোকে সেগুলোকে নতুন দৃষ্টিতে
দেখেন।

রবীন্দ্রনাথ ‘মূল্যপ্রাপ্তি’ কবিতায় মূল-কাহিনীর
নায়ক বালকটিকে বাদ দিয়ে মালাকারকেই কাহিনীর
নায়ক করেছেন। নাম দিয়েছেন তার স্নেহাস।

স্নেহাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
অগ্রভাষণ মাসের শীতকে উপেক্ষা করে যে পদ্মটি ফুটে
উঠল সে-টি রাজার কাছে বেচবার জন্তে সে গেল।
কিন্তু পথে এক পথিক সেই ফুল এক মাষা স্বর্ণ মূল্যে
কিনতে চাইল বুদ্ধের চরণে অর্পণ করবেন বলে।
ইতিমধ্যে রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধপূজার জন্তে বহু
পূজোপকরণ নিয়ে যাবাব পথে সেখানে উপস্থিত
ছিলেন। তিনিও সেই পদ্মফুলটি কিনতে চাইলেন।

পথিক আর রাজার মধ্যে মূল্যবুদ্ধির প্রতিযোগিতা
আবস্ত হল। দুজনেরই আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধদেবের চরণে সেই
ফুল অর্পণ করবেন। তা দেখে—

মালী ভাবে যার তরে এ দোহে বিবাহ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।

এবং অনেক বেশী পাবার আশায় সে ছুটে চলল যে
কাননে প্রভু বুদ্ধ বসে আছেন।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি।

দৃষ্টি হতে শাস্তি ব্যরে, ক্ষুরিছে অধব পরে
করুণার স্নেহাস্র জ্যোতি।

স্নেহাস রহিল চাহি— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।

সহসা ভুজলে পড়ি, পদ্মটি বাধিল ধরি
প্রভুর চরণ পদ্ম পরে।

বরষি অমৃত রানি বুদ্ধ শুধালেন হাসি
‘কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা।’

মূল কাহিনীতে বুদ্ধদেব পদ্মপূজার অর্পণ করায় হেসে
বালকটিকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্ত আশীর্বাদ করেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই আশীর্বাণী নেই। আছে
কেবল ভক্ত হৃদয়ের আকৃতি। মূলের বালকটি কিছু
প্রত্যাশা করে নি। কিন্তু বুদ্ধপূজার পুণ্য কর্মের
ফলেই সে পদ্মোত্তর বুদ্ধত্ব লাভ করেছিল। কবিতার
স্নেহাস বহুদন প্রাপ্তির আশায় বুদ্ধদেবের কাছে ছুটল
গিয়েছিল, কিন্তু যখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল তখন
সেই পরমতম পুরুষটি তার কাছে প্রধান হয়ে
উঠেছিল। পার্থিব বস্তুর মোহ তার কেটে গেছে।
সেই পরম পুরুষের রূপাবিন্দু পাবার জন্ত সে ব্যাকু
হয়ে উঠল, তাই যখন বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন তার
কী প্রার্থনা, সে ব্যগ্র ব্যাকুলতার জ্বালা—

‘প্রভু, আর কিছু নহে,

চরণের ধূলি এক কণা।’

এর চেয়ে বড় মূল্য আর কী হতে পারে ?

আমরা এই প্রবন্ধেব মুখবন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথ মহাযানীয বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও ভক্তির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মূল্য প্রাপ্তি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিজের উত্তমনোভাব—রূপ লাভ করেছে।

৮ম বৌদ্ধ কবিতা—নগরলক্ষ্মী—কল্পক্রমাবদান এবং অবদান শতকে মূলগল্পটি আছে। গল্পটি এইরূপ :—

সুপ্রিয়া অনাথপিণ্ডদেব কহা। জন্মেব সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে একটি গাথা বলল— বৌদ্ধগণকে ভিক্ষা দিবে এবং পবিত্রস্থানে চাঁপা ফুল ছড়িয়ে দিবে।

সুপ্রিয়ার বাল্যকালে তার পিতার গৃহে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাব মনের উপর প্রভাব বিস্তার কবল। সুপ্রিয়া জাতিস্মর ছিল। সাতবৎসর বয়সে সে পিতামাতার অমুমতি নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হল। বুদ্ধের আদেশে গোঁতমী তাকে দীক্ষা দিলেন।

কিছুকাল পরে শ্রাবস্তীপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লাগল। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের বললেন—“মামুষের দুঃখ দূর কববার জন্তে সুপ্রিয়ার দাক্ষিণ্য প্রার্থনা কর।” সুপ্রিয়া তখন নিজ ভিক্ষায় বেরলেন এবং ক্ষুধার্ত-মামুষকে অন্ন বিলোতে লাগলেন।

তিনমাস পরে বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তী হতে রাজগৃহে যাচ্ছেন, পথে এক বনে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা। তার ভিক্ষা পাত্রে কোনো খাদ্য ছিল না। তখন সে প্রার্থনা করল আমার যদি কোনো পুণ্যকাজ থাকে তাহলে যেন আমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হয়। এক বনদেবতা তার প্রার্থনা শুনলেন এবং তার ভিক্ষার পাত্র পূর্ণ হল। বুদ্ধদেব এবং তাঁব শিষ্যরা আহা করলেন। বুদ্ধ সুপ্রিয়াকে অহর্ষ দান করলেন, কাবণ তার অহর্ষ প্রাপ্তির ষোগ্য অনেক সুকর্ম হয়েছে। বুদ্ধ তখন তার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বললেন।— এই সুপ্রিয়া কল্প প্রভুর ভিক্ষা-অটনের সময় এক দাসী ছিল। একদিন তার গৃহপ্রভুর জন্তে পিষ্টক

নিয়ে যাচ্ছিল, পথে কাঞ্চপের সঙ্গে দেখা। সুপ্রিয়া দশহাজার বৎসর ধরে বৌদ্ধ গণকে ভিক্ষা দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ‘নগরলক্ষ্মী’ কবিতায় মূলকাহিনীর সারমর্মটুকু যাত্র গ্রহণ করেছেন—অনাথপিণ্ডদেবতা সুপ্রিয়া ভিক্ষা পাত্র হাতে সমগ্র ক্ষুধার্ত জনতার অন্ন ষোগাড়ের জন্ত ভিক্ষায় বেরোলেন।

প্রেম এবং শুদ্ধসংকল্প মামুষকে কত শক্তিশালী করতে পারে নগরলক্ষ্মী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুভবনীয় ভাষা এবং ভঙ্গীতে তা প্রকাশ করেছেন সমগ্র কাহিনীটিকে একটু নতুন রূপ দিয়ে।

যখন শ্রাবস্তীপুরে হাহাকারে দুর্ভিক্ষ উঠিল তখন বুদ্ধদেব তাঁর উত্তরগণকে জনে জনে জিজ্ঞাসা করলেন—

ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা।

তোমরা লইবে বলো কেবা?—এখন বড় শ্রেষ্ঠী হতে আরম্ভ কবে বড় চাষী গৃহস্থ পর্বস্ত সকলেই মাথা হেঁট করে রইল। সকলেরই মুখে এককথা—এত বড় ক্ষুধার্ত পুরী, কোথায় এত অন্ন?

রহে সবে মুখে মুখে চাহি

কাহারো উত্তর কিছু নাহি।

নির্বাক কে সভাঘরে ব্যথিত নগরী’পরে

বুদ্ধের কক্ষণ আঁধি ছুটি

সন্ধ্যাতারাসম রহে ক্ষুটি।

তখন অনাথপিণ্ডদেবতা সুপ্রিয়া—রক্তভাল লক্ষ্মানব্রশিরে বেদনায় অশ্রুপ্লুতা হয়ে বুদ্ধের চরণধূলি মাখায় নিয়ে নগরীব সকল নিরন্নর অন্ন জোগাবার ভার নিলেন।

কহিল সে নমি সবা কাছে।

‘শুধু এই ভিক্ষা পাত্র আছে।

সুপ্রিয়া দীনহীনা মেয়ে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস তাঁর ‘প্রভু আত্মা হইবে বিজয়া।’ তাই প্রভুর আত্মা শিরোধার্য করে ভিক্ষারিনী বেরোল ভিক্ষায় ক্ষুধিতকে অন্ন দেবার জন্তে। কোথায় তাঁব শক্তি? তাঁর পরদুঃখকাতবতা, শুদ্ধ সংকল্প এবং শুদ্ধভক্তি তাঁর প্রধান সম্বল। তাই সে বলতে পারছে—

‘আমার ভাগ্য আছে ভরে—

তোমা সবাঁকার ঘরে ঘরে

তোমরা পরে চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে

ভিক্ষা-অগ্নে বাঁচাব বন্ধু—

মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।’

—ঠিক এই ভাবেরই একটি প্রতিধ্বনি শুনি কবিকার

একটি কবিতায়—

কে লইবে মোর কার্খ কহে সঙ্ঘ্যারবি।

শুনিয়া জগৎ রহে নিরন্তর ছবি।

মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী

আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

(কর্তব্য গ্রহণ)

দীন সুপ্রিয়া ষপাথই নগরলক্ষ্মী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী বহুকাল দুশ্রুপ্য হয়ে পড়েছে। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে গ্রন্থটি ক্রকাশ কবেছিলেন সেই গ্রন্থান্তর্গত পত্রাবলী এবং আরোও অন্যান্য মহর্ষিরচিত পত্র সংকলিত করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক]

(১)

ঐ

কটক ৬ চৈত্র ১৭৭২ শক

ওগো রাজনারায়ণ বাবু।

তোমাতে আমার প্রীতি পূর্বক নমস্কাব। তুমি সেই বাড়িতে মসাব ঘোঁবাওয়া জন্ত ভাল সুখে নিদ্রা যাইতে পার নাই, আবার তোমার প্রাতঃকালে ঘোর কোয়াশার মধ্যে কেবল একখানি পাতলা চাদর মুড়ি দিয়া সমস্ত অশেষ পথ চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাহাতে তোমাব যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া থাকিবেক ; কিন্তু তজ্জন্ত তোমার যদি শরীবে কোন গ্লানি না হইয়া থাকে তবেই আমি ঝাঁচি। তোমার শরীর কেমন আছে তাহা আমাকে লিখিবে। সে দিন যে হাঁটনটা হাঁটিয়াছিলে, আবার প্রাতঃকালে একাকী কিরিয়া যাইবার সময় তো সে হাঁটনটা হাঁট নাই? আমি নির্বিস্ময়ে ২ চৈত্রে কটকে আসিয়া পছঁছিয়াছি। তুমি যেমন একাকী মেদিনীপুরে আছ, আমিও তেমনি একাকী কটকে আছি। একাকী তো আমরা প্রায় সর্বদাই থাকি।

“একঃ প্রজ্জায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একোরুভুংস্তে সুরুতমেক এবতু দুস্কৃতং ॥”

যখন সেই সঙ্গের সঙ্গিকে দেখিতে পাই তখনই আমরা আর একাকী থাকি না।

যোগরতো বা ভোগরতো বা

সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিন্তো

নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥

(২)

কলিকাতা ২২ পেষ ১৭৭৩

* * *

তোমাব ভ্রাতাদিগের কি প্রকার লেখাপড়া হইতেছে? বোধ হয় তোমারই বিজ্ঞালয়ে তাহারা ভুক্ত হইয়াছে। যে প্রকার তুমি দেখিয়াছ যে, আমি কতক বালককে ব্রাহ্মধর্ম অধ্যাপনা করিতেছি, সেই প্রকার তুমি তোমার ভ্রাতাদিগকে পড়াইলে অনেক উপকাব হয়। অপরা বিজ্ঞার সহিত তাহারদিগকে পরাবিজ্ঞার উপদেশ দিতে অবহেলা করিবে না। বালক কালই বিজ্ঞা শিখিবার মুখ্য কাল। যদি বিবেচনা কব ব্রহ্মবিজ্ঞা অতি কঠিন বিজ্ঞা, ইহা বালকের শিখিবাব উপযুক্ত নহে, তবে পরে ইহার জন্ত সম্ভাপ কবিতে হইবে। যখন মনে নিকট বৃত্তিসকল প্রবল হইবে, কাম ক্রোধাদি বলবান হইবে, যখন ঘোবনের তবঙ্গ করালমূর্ত্তি ধারণ করিবেক; যখন তাহাতে সেতুবন্ধনের চেষ্টা অবশ্য বিফল হইবে—তখন তাহাতে উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে উন্নত করিবার যত্ন অবশ্য বুধা হইবে। সেই ঘোবন কালের পূর্বে, সেই তরঙ্গ উঠিবার পূর্বে

সেতু বন্ধন করা আবশ্যিক। ‘পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ।’ ঈশ্বরেতে প্রীতি-বৃত্তির পোষকতা, ধর্মবৃত্তি সকলের পোষকতা বালক কাল অবধি যদি মানবজাতি না পায়, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত, রাজকীয় বিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র পূর্বকাল ছাত্র বিদ্যমান বহিরাছে। অতএব আমাব বিবেচনায় ১১।১২ বৎসর অবধি বালককে সহজে সহজে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রদান করা উচিত। আমি এখানে ব্রাহ্মধর্ম বালকদিগকে পড়াইবার যে নিয়ম করিয়াছি তাহা অবশ্য তুমি অবগত আছ। প্রতি রবিবারে অতি প্রত্যুষ হইতে দশঘণ্টা পর্যন্ত পড়ান হয়; ইহাতে এখানে ১২।১৩জন ছাত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মন্দ কি? ক্রমে ছাত্রবৃদ্ধি হইবারও সম্ভাবনা আছে। এইক্ষণে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি, ইহার প্রতি আমার বিশেষ নির্ভর হইয়াছে। কাল গোণে আমাব কোন খেদ নাই; উত্তম পত্তন হইলেই সুখের হয়। আমি অতি আহলাদ পূর্বক অবগত হইলাম যে, তুমি সেখানে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছ। সকল বিষয়েবই আবশ্যই ‘ছোট্ট খাটো’, তজ্জন নিরাশ হইবে না। *

(৩)

কলিকাতা ৫ আশ্বিন ১৭৭৪

ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্য দেখিয়া তোমার মন হইতে যে সকল মিষ্ট ভাব উদ্ভিষ্ট আছে তাহা তোমাতেই আছে, তাহা আর অজ্ঞ আমি প্রাপ্ত হইনা। বিশেষতঃ “প্রাণোহ্যেবঃ” এই শ্রুতিতে যে তাৎপর্য অধিক করিয়া দিতে লিখিয়াছে তাহা অমূল্য। পরমেশ্বরেতে যাহার এ প্রকার মনের ভাব নাই তাহাকে কি তাহার উপাসক বলা যাইতে পারে? “য এবং বেদ মহান্ ভবতি প্রজ্ঞয়া পশুভি ব্রহ্মচর্চসেন মহান্ কীর্ত্যো” “যিনি পরমেশ্বকে এই প্রকারে জ্ঞানেন তিনি সন্তান দ্বারা, পশুদি দ্বারা, ব্রহ্মতেজ দ্বারা মহান্ হইবেন এবং কীর্তিদ্বারা মহান্ হইবেন।”

আমি যখন দুঃখে থাকি, তখন তোমার সুখে থাকার সংবাদ পাইলে সে দুঃখের অনেক শাস্তি হয় এবং মনে হয়, ভাল, আমি এই পৃথিবীতে যাহার সুখের জন্ত আকাঙ্ক্ষা করি, সে তো ভাল আছে এবং সুখে আছে। তোমার মৈত্র্যেরীকে আমি আমাব কন্যা-তুল্য দেখি, সে অতি সুশীলা হইয়াছে সুনিয়া তাহার জন্ত এবং তোমাব জন্ত পবন সন্তোষ লাভ করিলাম। তাহার আত্মা এইক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইলে ব্রহ্মপ্রীতি রসেতে আত্ম হইলে যে তাহার কি শোভা হইবে, সে শোভার সহিত কি কোন শোভার তুলনা হইতে পারে? স্বর্গময় অলঙ্কারে তাহার কি প্রয়োজন? সুন্দর শরীবের মধ্যে যদি মন সুন্দর হয় এবং সেই মন যদি পূর্ণ সুন্দরকে ধারণ করে, তবে সে সৌন্দর্যের নিকটে কি অল্প কোন সৌন্দর্য লক্ষ্য হয়।

(৪)

কলিকাতা ৭ মাঘ ১৭৭৪

প্রাপ্ত সময় পাইলেই তোমার মৈত্র্যেরীকে তুমি উপদেশ দিতে থাকিলে, কালে তিনি অবশ্যই জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে ভাবিতে পারিবেন। তুমি জীবাত্মার উপমার দ্বারা যে পরমাত্মাকে নিরাকার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিবাক্য পবনেশ্বরের অদৃষ্ট স্বরূপ বুঝাইবার আর কি উত্তম উপায় আছে? * * * ৭ পৌষ অবশ্যই শুভদিন, সেই দিবসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয়। স্বর্ণলতাকে ব্রাহ্মধর্ম উত্তম রূপে শিখাইতে হইবেক।

(৫)

শিলাইদহ ২৭ মাঘ ১৭৭৪

* * * আবার আমি ঘটনা শ্রোতে এই কুমারখালি অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার আর ভ্রমণের শেষ নাই। এবার আমি যেখানে আছি

তাহাব সম্মুখে মাঠ, পশ্চাতে মাঠ; উত্তরে মাঠ, দক্ষিণে মাঠ, লোকালয় মাত্র নাই, নির্জনের একশেষ, গ্রাম ও বসতি তাহাব বহুদূরে। এইক্ষণে প্রাতঃকাল, চতুর্দিকে পক্ষীর কলরব মাত্র শুনা যাইতেছে। পদ্মানদী হইতে স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে এবং শ্যামল তৃণচ্ছাদিত ক্ষেত্র অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

স্বর্ণলতা দিন দিন বাড়িতেছেন এবং স্বচ্ছন্দ শরীরে আছেন তাহাব আর সন্দেহ নাই। “মাঠ আজ আওর কাল আওর, দিন প্রতি আওর আওর।” নূতন আর এক গান শ্রবণ করিয়াছি, তাহা গত সাঙ্ঘসবিক সমাজে গীত হইয়াছিল। তাহা এই ধ্রুবপদ—

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে।

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রস পান,

প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে ॥

ধন্য সাধু স্ত্রী সেই যে আপন মন আসনে, রাশিতে তাঁরে পারে; ইন্দ্রিয় বিগ্রহ, পাপত্যাগ; শ্রায় সত্য ক্ষমা দয়া যার তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম ॥ *

(৬)

* * আমি ঢাকায় আসিয়া তোমার পত্র পাইয়া হুট হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র এখানকার সমাজের প্রাণস্বরূপ এবং অতি ভদ্রলোক। ব্রাহ্ম সমাজে অনেকগুলীন বিশিষ্ট লোক আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে তথায় রাখিয়া আইলাম। শিরোমণি অতি উৎকৃষ্ট রূপে উপসনা প্রণালী পাঠ করিয়া থাকেন এবং গত দিবসেব সমাজেও তদ্রূপ পাঠ করিলেন। যদিও এখানকার সমাজ প্রতি বুধবারে হইয়া থাকে তথাপি আমি সে পর্যন্ত এখানে থাকিলে প্রত্যাগমনেব কাল বিলম্ব হয় এজ্জ গত দিবসেই এক অস্ত্রিবেক সমাজ হইয়াছিল। শিরোমণি মহাশয় দ্বারা উপাসনা কার্য সমাধা হইলে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছিল। তাঁহার মনে যে

ঈশ্বর প্রেম রূপ অগ্নি আছে তাহা তাঁহার মুখ হইতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব হইতে হরচন্দ্রের স্বভাবও এখন অনেক ভাল হইয়াছে।

“অপিচেন্দ্র সুচুরাচারো ভজতে যামনম্ভ ডাকু”

“ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শশচ্ছাস্তিঃ নিয়চ্ছতি।”

কিন্তু তাহাব পান দোষ এখনও সম্যক্রূপে যায় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র তাহাব জন্ত বিস্তর আক্ষেপ করলেন। আমি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বসুকে নির্জনে ডাকিয়া তাঁহাকে পানদোষ হইতে আপনাব স্বভাবকে নিম্মুক্ত করিতে বলিলাম। ইহাতে তিনি আপন দোষ স্বীকার কবিতা ভবিষ্যতের জন্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহার যদি পানদোষ যায়, তবে তাহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পক্ষে বিস্তর উপকার হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্রকে এবং হরচন্দ্র বসুকে তোমার নমস্কার জানাইলাম। আমি এখানে রবিবারে আসিয়া পহুছিলাম। সোমবারে এখানে ব্রাহ্মসমাজ হইল। অজ্ঞ মঙ্গলবার ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে এই পত্র তোমাকে লিখিলাম। সর্ব বিষয় বিনাশন যে প্রকার আমাকে নির্বিঘ্নে ঢাকায় পহুছিয়া দিয়াছেন কলিকাতায়ও সেই প্রকার পহুছাইয়া দিবেন এবং সংসার সমুদ্র হইতেও সেই প্রকার উত্তীর্ণ করিবেন।

(৭)

পলতার বাগান

১২ ভাদ্র ১৭৭৫

তোমার উজ্জল ঈশ্বর প্রেমাভিযুক্ত শাস্ত্র মনের ভাব, উপহাব দস্ত বক্তৃতা মধ্যে পাইয়া অমৃত-সিক্ত হইলাম। এমত ভাব আর কোথাও পাই না। যিনি আমাদের পরাগতি তাঁহার সহবাসের সুখের দ্বার মনের অনন্ত আশাকে পূর্ণ কবিত্তে অভিলাষী পাওয়া অতি আশ্চর্য। চিন্ত মোহেতেই লোক সকল বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে। বিবেক ও শাস্তি ও তপস্যা ও

সাধুসঙ্গ কোথায়? তুমি আমাকে এই বক্তৃতা যে (৯)

উপহার দিয়াছ, ইহাতে আমি বহু করিয়া মানিলাম।

আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশকে পাইবে না, ইহা মৃত সঞ্জীবনী দৈববাণী। এই বাক্য প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহা অতি অমূল্যধন; ইহার শোধ নাই।

* *

(৮)

পলতার বাগান

১৭ ভাদ্র ১৭৭৫

* তোমার মৈত্রেয়ী ও স্বর্ণলতাকে পূর্বেই এখানে পাঠাইয়া দিয়াছ; এইক্ষণে তুমি তথায় অরণ্যে বাস করিতেছে। কবে তুমি এখানে আসিতে পারিবে? তোমাদিগের ইস্কুল কবে বন্ধ হইবে? তুমি কতদিন এবাব আমাদিগের সঙ্গে এখানে থাকিতে পারিবে। সেই তোমার প্রদত্ত জ্বিলাপী কচুরি লইয়া পালকিতে আরোহণ করিলাম, ডাক বাঙলা ছাড়িলাম, আর সেই অবধি তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, এ প্রকার যে ঘটনা হইবে তাহা কে জানে? পলতার বাগানে মল্লশ্যুর কার্য বড় নাই, চতুর্দিকে কেবল দেব-কার্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখানে আমার যে প্রিয় বাস্তুবেরা আছেন, তাঁহারা বড় মল্লশ্যুর বিষয়ে তৎপর নহেন এবং বড় মল্লশ্যুর ধার ধাবেন না, কেবল সেই দেবতার মহিমা লইয়াই আছেন। আমার সহিত যে সকল গ্রন্থ আছে তাহারা একবাক্যে ঈশ্বরের গুণ কীর্তন করিতেছে। সমুদ্রে গঙ্গা নদী শ্রোতো বহাং, চতুর্দিকে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া, অন্তরীক্ষে স্তম্ভ বায়ুর হিল্লোল, মধ্যে ইষ্টকালধর রূপ আশ্রয়, ঈশ্বরে মনোনিবেশ কবিবার স্থান বটে। পলতার বাগানের শোভা এই পর্যন্ত তাহা সকল মল্লশ্যুর গোচর নহে। তোমার সহিত এইখানে নির্জনে নিবিঘ্নে পবন প্রিয় অন্তরতর অদৃশ্য নিরঞ্জন নিরাময়ের প্রসঙ্গ হইবে এই আশ্বাসেই আছি।

২ আশ্বিন ১৭৭৫

* তুমি এখান হইতে আমার যাত্রার পূর্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে পারিবে না এবং এ বৎসর এ সময়ে এখানে আসাই হয় কি না তাহাব সংশয়, এই সাংঘাতিক সমাচার তোমার পত্র দ্বারা পাইয়া আমার লম্বনের যে উৎসাহ তাহার অনেক ন্যূন হইল। মনে করিয়াছিলাম যে তোমাব সহিত একত্র হইয়া আমারদিগের প্রিয়তমের নদী ও নদীতীরেব শোভা সন্দর্শন কবিব, তাহা সম্প্রতি হইল না। আমারদিগের প্রিয়তমের কথায় সায় পাওয়া অতি দুর্লভ। মন খুলে তাঁহার কথা বলা যায় এমনত লোক পাওয়া কঠিন। তাঁহার কথা কেহ মন খুলে বলে এমনত লোক পাওয়াও কঠিন। এইবার মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে একবার মন খুলে তাঁহার কথা বলিব এবং একবার মন খুলে তাঁহার কথা শুনিব, কিন্তু ঘটনা-সূত্রে তাহা হইল না, কি করা যায়। আমার ১ অক্টোবরে যাত্রা করিবার ক্ষণ এখানে সকল প্রস্তুত, তুমি এখানে এ সময় আসিতে পারিলে সম্যক প্রস্তুত বোধ হইত। *

(১০)

২৬শে ফাল্গুন ১৭৭৫

* ক্রমাগত তোমার পত্র পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। বিশেষতঃ গতবাবের মেদিনীপুরের ত্রাস সমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমাব বাস্তুব মণ্ডলী মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম স্তুতী হইয়াছি। ইহাব মধ্যে জ্ঞানের উজ্জলতা, ভক্তির প্রগাঢ়তা, উৎসাহেব প্রবলতা, ভাবের সবলতা দীপ্যমান রহিয়াছে। এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাহারা শুনিলেন তাঁহারা ই পরিতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ যোগ্য বোধ করিলেন না। কতক শুভান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে

বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই। কিন্তু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, উক্ত বক্তৃতা আশু বা বিলম্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অবশ্য প্রকাশিত হইবেক। তোমাব উপহার প্রদত্ত গ্রন্থ পাঠ কাবয়া অনেক জ্ঞান ও বিপুল সুখ লাভ করিয়াছি। মুক্তির পথ যেন আবও পরিষ্কার বোধ হইতেছে, বিষয় সুখকে যেন আবও তুচ্ছ বোধ হইতেছে। যাহা চাই, তাহাই পাইয়াছি, সাধুর সহিত বন্ধুতার গুণ এই। * ।

(১১)

চাম্পারণ ১১ আশ্বিন ১৭৭৬

* আমি এবাব পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছি। যাত্রার সময়ে ব্যস্ততাক্রমে তোমাকে লিখিতে পাবি নাই। অতঃপ্রাতে আসিয়া পছন্দিয়াছি। তোমাকে এই পত্র লিখিবার অবকাশ কাল পাইয়াছি। ডাকে যাওয়ায় স্নান-হারেরও প্রশস্ত সময় পাওয়া যায় না। গত দুই দিবস অবধি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি এ অঞ্চলে হইতেছে, তাহাতে পথিকদিগের সম্বন্ধে যথার্থই দুর্ধোগ। সাত বৎসর হইল লালা সাহেবের (১) সঙ্গে এই পথ দিয়া গিয়াছি; এইক্ষণে লালা সাহেব কোথায় গিয়াছেন তাহার সংবাদ কে আনয়ন করিতে পারে। বুধ্‌বুধ্‌ ছাড়াইলেই উচ্চ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাবাখারের নদী পার হইলেই দুই পার্শ্বে পর্বত শ্রেণী; সেই সকল নানা জাতীয় বৃক্ষেতে পবিপূর্ণ, অতি উত্তম স্থান। আমি কলিকাতায় আবার কবে পুনঃবাগমন করি, তাহা এইক্ষণে বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত বিভালঙ্কার উপাচার্য মহাশয় তোমাব বক্তৃতা বর্ণনাক্রমে সকল দেখিয়া দিবেন এবং শ্রীযুক্ত বেণীবাবু মুদ্রাকরের নিকট হইতে শুদ্ধিপত্র লইয়া তোমাব নিকট পাঠাইতে থাকিবেন। আমি সেখানে নাই বলিয়া তোমার বক্তৃতা মুদ্রাক্ষিতের ব্যাঘাত হইবেক

না। যাত্রার পূর্ব দিবসে বুধবারে তোমার প্রিয় ছাত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার যাত্রার সংবাদ তোমাকে দিতে তাঁহাকে বলিয়াছি। তাঁহার দ্বারা সে সংবাদ এ পর্যন্ত পাইয়া থাকিবে। এ পত্র পাইয়া আমাকে যদি পত্র লিখিতে ইচ্ছা কর, তবে দিল্লীর ডাক আড্ডাতে পাঠাইবে। তাহাতে যেন লেখা থাকে যে সেই পত্র ডাকঘরে থাকিবে, আমি তথায় পছন্দিয়া তাহা লইব।

(১২)

দিল্লী ২৬ আশ্বিন ১৭৭৬

আমি দিল্লীতে আসিয়া একদিন পরে তোমার পত্র পাইলাম। দিল্লী অতি পুরাতন নগর। সাহজাহান ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এ নগর চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত এবং রাজ্য ভবনও উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত, ইহা কেবল ভয়ের চিহ্ন। কাশ্মীরে এবার যে যাওয়া হয় এমত বুদ্ধি না। ব্রাহ্মধর্মদীপিকা অত্যন্ত গুরুতর গ্রন্থ, ইহাতে কাল বিলম্বই উপযুক্ত। যাহা বহুদিন স্থায়ী তাহা বহুদিনেই হয়। এই পত্র পাইয়া আমাকে যে পত্র লিখিবে তাহা আলাহাবাদ ঠিকানায় লিখিলে বোধ হয় আমি পাইতে পারিব। আমি কুশলে আছি। তোমাদিগের শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

(১৩)

কলিকাতা

১০ অগ্রহায়ণ ১৭৭৬

* আমি আবার স্বচ্ছন্দ শরীরে কলিকাতায় আসিয়া পছন্দিয়াছি। এই কথা তোমাকে পত্রে না জানাইয়া মুখে জানাইতে পারিলে কি সন্তোষের

বিষয়ই না হইত। দিল্লীতে যাইবার সময়ে গাড়ীর ডাকে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমনের সময়ে গাড়ীর ডাকে আলাহালাদ পর্য্যন্ত আসিবা তথা হইতে ষ্টীমারে কলিকাতায় আগমন হইল। মর্ত্য লোকে কি তৃপ্তির অভাব? যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন মনে হইতেছিল যে বাটি যাইতে পারিলে হয়, আবাব বাটিতে কিছুদিন থাকিলে মনে হয় দেশ ভ্রমণের ছাষ সুখের কারণ নাই। দেশেই থাক আর বিদেশেই থাক ইহাতে কিছু সুখ নাই, ব্রহ্মধাম যে স্বকীয় ধাম তাহা অন্বেষণ করিয়া পাইলেই সর্বত্রই সর্বাবস্থাতেই গচ্ছন তিষ্ঠন সুখে থাকা যায়। সুখের সন্ধেত এই নিশ্চয় আমি জানিয়াছি যে সুখের আর স্থান নাই। যিনি সুখের আকর তিনিই সুখের স্থান, তাঁহাতে সংযুক্ত থাকিলে মন দুঃখাবস্থাতেও সুখ হইতে বিযুক্ত থাকে না। তাঁহা হইতে বিযুক্ত থাকিলে সংসারকে কেবল এক বৃদ্ধাবানল বোধ হয়। সেই অনির্দেশ্য পরম সুখকে যে ভাগ্যবান পাইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত ঘাঁহার নিত্য সম্বন্ধ হইয়াছে তিনিই সুখী, তদ্ব্যতীত আব কেহ সুখী নহে। তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

(১৪)

২৩ বৈশাখ ১৭৭৭

* তোমার ১৫ বৈশাখের মধুরময় পত্র সহিত ধর্মতত্ত্বদীপিকার কতিপয় অধ্যায় প্রাপ্ত হইয়া এ বিষয়ের কথোপকথন হয়; পত্র দ্বারা তাহা সমাধা হওয়া বড়ই কঠিন। সম্প্রতি আমি শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুকে দেখিতে দিব, তাহার পরে উচিত ব্যবস্থা হইবেক। ফলে আমার এই কথা মনে পড়িয়াছে।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলঃ

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলঃ

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলঃ

পাশ নাশ হেতুরেব

নতু বিচার বাঞ্চলং

দর্শনশ্চ দর্শনেন

নো মনোহ নির্মলং

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলঃ

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলঃ

আমার শারীরিক স্তম্ভতা পূর্বকার তায়ই আছে। তোমাদিগের সকলের শারীরিক কুশল সংবাদ পাইয়া পরমালাদিত হইলাম। উপাচার্য মহাশয়কে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার।

(১৫)

চন্দননগর

৭ আষাঢ় ১৭৭৭

তোমার ৪ আষাঢ়ের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আহা! এই ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে কি মনের তৃপ্তিকর কথাই লিখিয়াছ। যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু পদার্থকে না জানিয়াও মধুগর্ভ পুষ্প প্রতি ধাবমান হইয়া তাহা হইতে মধুপান করে, তজ্জপ মন নিরতিশয় মহৎ পুরুষকে না জানিয়াও প্রবৃত্তিগত অমুরাগ সহকারে তাঁহার অমুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়। আমি ইহাতে আবও এই অধিক লিখিতে চাই যে, অমুসন্ধান করিয়া যখন তাহাব দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে তিনি আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তখন সে তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহা হইতে অমৃত রস পান করিতে থাকে। স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় এবং বিজ্ঞান মূলক আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ এই বোধ হয় যে, আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যয় করা ভ্রম কি না এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত না করিয়া যে ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে সেই স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, আর যাহার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় কদাপি ভ্রমমূলক নহে। সেই বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে। দুইই আত্মপ্রত্যয়। যদি স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় না থাকিত তবে বিজ্ঞান দ্বারা তাহার প্রমাণ কদাপি হইত না।

বাহ্য বিষয় আছে, ইহা আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ, যে পর্যন্ত এই সত্যের প্রতি কেহ সংশয় আনে নাই, সে পর্যন্ত কোন বিচার না করিয়াও বাহ্য বিষয়ে প্রত্যয় করিয়া আসিতেছিল। তাহার পরে যখন বাহ্য বিষয়ের প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল, তখন সে সংশয় নিরাকরণ করিবার জন্ত অনেক প্রমাণ অল্পসঙ্কলন করিতে লাগিল, পরে বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছুই হইল না যে, এক আত্মপ্রত্যয় ইহার প্রমাণ। আমি যে একজন আছি, এ আত্মপ্রত্যয়ের উপর কে সংশয় আনিতে পারে? কিন্তু ইহার পরেও সংশয় উপস্থিত হইয়া শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, এক আত্মপ্রত্যয়ই আমার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ। তদ্রূপ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, নিরতিশয় ও মহান সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ সকল কারণের একজন কারণ একজন নিয়ন্তা যে আছেন এ প্রত্যয় সকলেরই হৃদয়ে জাগরুক আছে। এ প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় আসিলে তখন বিচার উপস্থিত হয় বিচাবের শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমি কখনও আপনি হই নাই, এ শরীর ও মনোরূপ কোশল আমার কৃত নহে। আর এখানে জন্মিবার পূর্বেও এই বার, তিথি, মাস, সপ্তসরের দিন আমি যখন এখান হইতে প্রস্থান করিব তখনও এই বার তিথি মাস সপ্তসর থাকিবেক, আমি ইচ্ছা করিলে সকল বস্তু লাভ করিতে পারি না। কত সঙ্কল্প করিতেছি, সে সঙ্কল্প ভঙ্গ হইতেছে। আমার যৌবনকে আমি ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না। এই সকল আলোচনা করিয়া আমার মনেতে এমন প্রত্যয় উপস্থিত হইতেছে যে আমার কারণ ও নিয়ন্তা একজন পূর্ণ পুরুষ আছেন। এ প্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়, ইহা প্রতি সংশয় আরোপ করিলে যুক্তি বিরুদ্ধ হয় এবং মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। যখন এই সিদ্ধান্ত হয় তখন আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয় এবং ব্রহ্ম

সংস্পর্শ লাভ হয়। জগতের অপূর্ণ ভাব দেখিয়া যে কেবল পূর্ণ ভাবকে মনে কল্পনা করিতে পারি এমত নহে, কিন্তু এখানকার অপূর্ণভাব দেখিয়া বুদ্ধি নিশ্চয়রূপে আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত কবে যে একজন পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।

তোমার সহিত অচিরাত্ম সাক্ষাৎ হইবাব কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমার দুর্বল লেখনী মনের ভাব প্রকাশ করিতে যথোচিত যত্ন করিয়া এইটুকু নির্গত কবিলেন; ইহাতে তোমার নয়ন নিপাত হইলে ইহার পরিশ্রম সার্থক হয় এই মাত্র উৎসাহ।

(১৬)

চন্দননগর ২২ বৈশাখ ১৭৭৮

দশ বৎসর পূর্বে এই ফরাসডাক্তারে তোমার সহিত বাস করিয়া যে সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম তাহা জাজল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তুমি উপনিষৎ ইংরাজী ভাষাতে অমূল্যবাদ করিয়া একরাত্রি এমন নিদ্রাগত অভিভূত হইয়াছিলে যে, রাত্রিকালে যে আহার করিলে তাহা প্রাতঃকালে আমরা বলিলেও তোমার তাহা স্বপ্ন হইল না। নৃপেন্দ্রবাবু কোথায় গেলেন, তিনিও সে বৎসর আমারদিগের সহিত তথায় ছিলেন। এ দশ বৎসরের মধ্যে কতই পরিবর্তন হইয়াছে। তোমার বক্তৃতা যাহা পাইয়াছি, তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বোদাস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিলাম। তোমার অমূল্য বিষাদ সম্যকরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কিনা? তোমারদিগের উপাচার্য যদি আসিয়া থাকেন তবে কলিকাতাতে আমার দেখা পান নাই। আমি ভাল আছি।

ইতি

পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। কোন সময়ে পিতৃদেব সাহেবগঞ্জে গঙ্গাবক্ষে বজ্রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোন বিষয়কর্ম উপলক্ষে সেই সময় তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বজ্রার মধ্যে গিয়া দেখি, টেবিলের উপর ছই চারিখানা বাঁধান ফরাসী গ্রন্থ, আর একখানি ফরাসী-ইংরাজি অভিধান রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলি Victor Cousin-ব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “Le Vrai, le beau, le bien”—অর্থাৎ “সত্য, সুলভ, মঙ্গল।” উহাব ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে ফরাসী মূলগ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েক কাপি বিলাত হইতে আনা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক কাপি প্রতি পৃষ্ঠার মধ্যে সাদা কাগজ গ্রথিত করিয়া বাঁধাইয়া লইয়া ছিলেন। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরাজী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া, অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে, যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্পবয়সী ফরাসী জানি। তাঁহার বাধ্যকে এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আমার উৎসুক হইলেও সে সময়ে আমি পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ কীটদষ্ট গ্রন্থ, বোলপুরের লাইব্রেরী হইতে আনা হইয়া পাঠ করি ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।

২। একদিন আমাদের বাড়ির পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া ভালপাতায় কথ প্রভৃতি

অক্ষবে দাগা বলাইতেছিলাম বোধ হয় আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসর—সেই সময় পিতৃদেব আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। গুরুমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দাঁড়াইলাম না। তিনি কিরিয়া আসিয়া আমাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আদব কায়দার প্রতি এমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

৩। তিনি সাহিত্যাহুরাগী ছিলেন। আমার প্রণীত পুঙ্খবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমাণ্ডী নাটক প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন, সেই পত্রগুলি সহজে বক্ষা করি নাই বলিয়া এখন দুঃখ হয়।

৪। তিনি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। যখনই বাড়ি আসিতেন, তিনি আমাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। তাঁহার তেতালার বসিবার ঘরে, দিনকতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকভাবে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার ছই একজন বাহিরের শিষ্যও উপস্থিত থাকিতেন। আমার সেজদাদা গণেশঠাকুরের কাজ করিতেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার সমস্ত কথা টুকিয়া লইতেন। তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেজদাদা কাগজ পেঙ্গিল লইয়া সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কি ব্রাহ্মসমাজে, কি পারিবারিক উপদেশমণ্ডপে, যেখানেই পিতৃদেব বক্তৃতা করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তিনি যতদূর সম্ভব তাহা অবিকল টুকিয়া লইতেন। পরে পরীক্ষার করিয়া লিখিতেন। এমন কি পিতৃদেব ঘরে বসিয়া সহজভাবে বাক্যালাপ

করিতেছেন, তাহাও তিনি টুকিতে ছাড়িতেন না। আমরা এখন পিতৃদেবের যে সকল ব্যাখ্যান দেখিতে পাই, উহার অধিকাংশ তাঁহাবই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। সেজ্জাদাব পূর্বে মেজ্জাদাও এইরূপ পিতৃদেবের বক্তৃতা সকল টুকিয়া লইতেন। পরিস্কার করিয়া লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি কোন কোন অংশ সংশোধন করিয়া দিতেন।

৫। আমাদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কুস্তি শিখাইবার জ্ঞান হীরা সিং নামক একজন শিখ পালোয়ানকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই হীরা সিংয়ের নিকট প্রসিদ্ধ পালোয়ান অম্বু স্ত্রহও শিক্ষা কবিতেন। আমাদের বাড়িতে কুস্তির একটা আখড়া ছিল, আমি তখন শিশু ছিলাম। আমি ইহাতে যোগ দিই নাই। তাইদের মধ্যে আমার সেজ্জাদা (৬হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ব্যায়াম চর্চায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রীতিমতো পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। হীরা সিংয়ের নিকট তলোয়ার, গংকা, লাঠি সব রকমই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙালীর মধ্যে আমার সেজ্জাদা ও অম্বুস্ত্রহ সেই সময় এই বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব যখন বাড়ি আসিতেন, তিনি আমাদের সকলকে লইয়া আহারে বসিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, অন্ন ব্যঞ্জনের পর শেষে চাপাটি ও সন্দেশ আসিত। বোধহয় পিতৃদেব মনে করিতেন, ভাতে যথেষ্ট দৈহিক পুষ্টি হয় না। আবার দিনকতক কাশী হইতে একজন হালুইকর আনাইয়াছিলেন। সেই হালুইকর রাজে নানাবিধ উৎকৃষ্ট নিমকি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত।

৬। পিতৃদেব যখন দেবাদুনে ছিলেন, আমি কোন বিষয়কর্ম উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি ৬সীতানাথ ঘোষের পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, “বেচারি বড় কষ্টে পড়েছে।” এই বলিয়া সীতানাথকে ৭০০০ টাকা

দিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। শুনিলাম সীতানাথবাবু অত টাকা পাইবেন বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা কবেন নাই। এইরূপ আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত আছে। পিতৃদেব যখন দান কবিতেন এইরূপেই যুক্তহস্তে দান করিতেন। এই প্রসঙ্গে সীতানাথবাবুর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি তড়িৎ চিকিৎসার জ্ঞান এক প্রকার নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। হিন্দু তড়িৎ-জ্ঞান সন্মুখে গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৭। কলিকাতায় আমাব বড়দিদিমার একখানা বাড়ি ছিল। দিদিমার এক পালিত কন্যামাত্র ছিল। পিতৃদেব ছাড়া তাঁহাব প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিল না। দিদিমার মৃত্যু হইলে সেই বাড়ির স্বত্ত্ব আমার পিতৃদেবে আসিয়া বর্তিল। সেই বাড়ি দখল করিবার কথা উঠিল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই বাড়ির উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বাড়িটি বেশ বড়। মূল্য ২০।৩০ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু পিতৃদেব ঐ বাড়ি দিদিমার পালিত কন্যাকেই দান করিলেন। এইরূপ তাঁহাব দয়া ও উদারতা ছিল।

৮। বিষ্ণু সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৬বিষ্ণু চক্রবর্তী আমাদের বাড়ির বেতনভূক গায়ক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাব পর তিনি বিষ্ণুর গান শুনিতেন। মাসিক বেতন পাইলেও গান শুনিবার পর, প্রত্যেকবারে ২ টাকা করিয়া বিষ্ণুকে পারিতোষিক দিতেন। তিনি ভাল ভাল গায়ককে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। তন্মধ্যে শ্রীবমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যতু ভট্ট, শান্তিপুত্রের প্রসিদ্ধ জমিদার মতিবাবুর ভ্রাতা রামচন্দ্রবাবু— ইহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া আমরা অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছি। সর্বপ্রথমে মেজ্জাদা বড়দাদা বিষ্ণু গান

ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। কিছুকাল পরে বড়দাদা সেজ্জদাদা ও আমি—আমরা নানা ভাবে ও তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহার যেদিন বচনা হইত, পিতৃদেব সেই রচিত গান সম্ভার পব শুনিতে। তাঁহাব ভাল লাগিলে আমরা উৎসাহিত হইতাম। যখন আমি সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা হইবে শুনিয়া তিনি ১০০০ টাকা টাকা স্বাক্ষর করিতে আমাকে অমুমতি করেন।

২। প্রায়ই দুই একজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভাব তিনি বহন করিতেন। তন্মধ্যে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র—এখন ডাক্তার—আমাদের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হইলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতা থাকেন। দুই একজন বন্ধুর পুত্রকেও কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র উত্তম ঘর ও উত্তম আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন।

১০। তিনি অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি যেখানে বসিতেন তাঁহার সম্মুখস্থ টিপায়ে একটি জেব-ঘড়ি খোলা থাকিত। তিনি ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিতেন। কখন তাহার ব্যতিক্রম হইত না। কেবল যখন কাহার সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কথাবার্তা হইত তখন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার জীবনের ঘটনায় ঈশ্বরের করুণার কত নিদর্শন পাইয়াছেন, এক এক দিন আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন; বর্ণনা করিতে কবিতা তিনি যেন একেবারে মাতিয়া উঠিতেন—তাঁহার মুখে উৎসাহ ও আনন্দের একটা স্বর্ণীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিত। তখন আব কিছুই হুঁস থাকিত না। যখন হুঁস হইত, তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিতেন।

১১। তাঁহার ‘রাশ ভারী’ ছিল। তিনি যখন বাড়ি থাকিতেন তখন যেন বাড়ি গমগম করিত। পাছে

কোন কর্তব্যের ক্রটি হয়, চাকর বাকর সকলেই সর্বদা সশঙ্ক থাকিত। সব কাজ ঠিক নিয়মে চলিত। তিনি কাহাকেও শাসন কবিতেন না, অথচ সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইত। তিনি যখন বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতেন তখন চাকরবাকবদিগের মন হইতে যেন একটা পাষণ্ড ভার নামিয়া যাইত। ইণ্ডিয়ান মিররের লেখক ক্যাপ্টেন পামার কখন কখন আমাদের বাড়িতে আসিতেন। পিতৃদেব বিদেশ চলিয়া গেলে পামার সাহেব বাড়ির ভাবান্তর লক্ষ্য কবিতা একদিন বলিয়াছিলেন—“When the cat is away the mice will play.”

১২। আমাদের কাহারও কোন দোষ ক্রটি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময় উপাসনা-মণ্ডপে সাধারণ উপদেশে এমন ভাবে বলিতেন যে, দোষী ব্যক্তি তাহার মর্মে উপলব্ধি কবিতা লজ্জিত হইত।

১৩। আমি যখন শিশু ছিলাম, পিতৃদেব তাঁহাব এক বন্ধু বেণীবাবুর সহিত কখন কখন দাবা খেলিতেন। কিন্তু তাস খেলিতে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই।

১৪। পিতৃদেব জ্যৈষ্ঠশিক্ষাব পক্ষপাতী ছিলেন। আমার শৈশবকালে দেখিতাম, একজন তিলক কাটা বৈষ্ণব ঠাকরুণ আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসিতেন। তারপর মিস গোমিস প্রভৃতি খৃষ্টান মেয়েরা বাঙ্গালা শিখাইতে আসিতেন। “এইরূপে আমরা মুখ ধুই, মুখ ধুই, তা দেখাইবাব পূর্বে” (অর্থাৎ মুখ দেখাইবার পূর্বে)—“একবাব নাহি পাব পুনর্বাব লাগো, দাধ্যাত চেষ্টা কব পুনর্বাব লাগো”—এই সকল বাক্য অভ্যাস করান হইত আমার মনে পড়ে। তারপর পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতেন। ইহাই বিশুদ্ধ শিক্ষা। যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়, তখন পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন।

১৫। পিতৃদেব আমাদের সকলকেই একে একে ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক পাঠ করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন। হ্রস্ব দীর্ঘ বক্ষা করিয়া বিস্তৃত উচ্চারণ—সহকারে টানা-সুরে আমাদিগকে শ্লোক পাঠ করাইতেন। এত অল্প বয়সে উপনিষদেব গভীর তত্ত্বসকল বুঝিতে পারিব না বলিয়াই বোধহয় তিনি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন না। তবে তখন হইতে ঐ সকল শ্লোক আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া থাকিলে, ভবিষ্যতে আমরা উহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিব, ইহাই বোধহয় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। আমাদের সময় আমি ও আমার খুড়তুতো ভ্রাতা ৬শুগেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমরা দুইজনে প্রতিদিন প্রাতে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করিতাম। কিছুকাল ৩রমাঙ্গসাদ রায়ের পুত্রদ্বয় তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম পাঠ শিক্ষা করিতে আসিতেন। পরে, ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার জন্ত আমাদের বাড়ির পুঞ্জের দালানে একটি ছোটখাটো পাঠশালাও খোলা হয়। এই পাঠশালায় বাহিরের চারি পাঁচজন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করাইজেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমতো পরীক্ষাও হইত। আমার বালাবন্ধু ৬অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের

এ্যাটর্নি “ভারতীর” সাহিত্য সমালোচক, সুলেখক, সূকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একথানা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন। আমার দীক্ষার কিছুদিন পূর্বে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা করিবার জন্ত পিতৃদেব প্রতিদিন তাঁহার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। আমাব উপনয়নের সময় পিতৃদেব বাড়ি ছিলেন না। আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা অনুসারেই হইয়াছিল। আমাব দীক্ষা ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোধহয়, অন্তর্গত পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অন্তর্গত।

১৬। একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে ষেষ্ণপ মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে বাহার কাছে বাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৬কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ-হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।

[১৩১৮ সালের মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে সৌদামিনী দেবীর পিতৃস্মৃতি ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

সম্পাদক]

রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনা ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

নন্দরাণী চৌধুরী

১৮৯০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদকতায় “সাহিত্য” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র এই পত্রিকায় তৎকালীন সাহিত্যের সমালোচনা করতেন। তাঁর বোধ বুদ্ধি অলুঘায়ী সার্থক রচনাকে অভিনন্দন জানাতে বা অক্ষম বচনকে কশাঘাতে জঙ্ঘরিত করতে তিনি চেষ্টা করতেন। তাঁর বিজ্ঞপের ভাষা ছিল তীক্ষ্ণ, কখনও কখনও প্রায় তা কটু স্ক্রি, এবং সময়ে সময়ে শোভনতা বা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো তাঁর বক্তব্য। এর ফলে তাঁকে সুনাম ও ছন্দ মিম দুই-ই সঙ্ঘ করতে বা বহন করতে হয়েছিল। সাধারণ পাঠক তাঁর বক্তব্যের সাবভাগের চাইতেও বেশী পছন্দ করত তাঁর বাচনভঙ্গীর ধার বা তীব্র স্বাদটুকু। কিন্তু রুচিমান পাঠকেরা তাঁর মাত্রা-হাবানো কটুকৃতিতে অনেক সময়েই বিরক্ত হ’তেন। বিরুদ্ধ কথাকে যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে বলতে পারার মত শাসন-সংঘত জিহ্বা বা পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় সুরেশচন্দ্রের সমালোচনায় পাওয়া যায় না। কবির লড়াই বা উতোব কাটাকাটব নামে যে নিয়রুচি বিশিষ্ট বাগ্-বিতণ্ডাকে বোঝায়, সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ-সমালোচনাগুলির মধ্যে অনেকটা সেই জাতের বাক্-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের সমালোচনায় সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন অপেক্ষা ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিদ্বেষ-প্রচাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করতেন অনেক চিন্তাশীল লেখক ও পাঠক। কিন্তু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির তাতে চৈতন্য উদয় হয় নি, তিনি সদৃশে স্বীকার করতেন যে “মোসাহেবী সমালোচনা” বা “বসওয়েলী উপাসনা”

তাঁর ধাতুগত ছিল না। সমালোচনাব পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট গর্বিত ছিলেন, কোনও সতর্কই তিনি রীতি-পরিবর্তনাব পক্ষপাতী ছিলেন না।

এই একটি ক্রটি তাঁকে সমালোচক হিসাবে সর্বাংশে ব্যর্থ করেছে। সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে সাহিত্যিককে বিচার করা বা আক্রমণ করার মত মারাত্মক ভুল করেছিলেন সুরেশচন্দ্র, আর এক্সল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তাঁর মনে হয়েছে দুর্বোধ্য সেখানে রবীন্দ্রনাথকে অপনামে এবং অপভাষায় কলঙ্কিত করে নিজে যে কত ছোট হয়েছেন, কত মর্দাণ হারিয়েছেন তা অবর্ণনীয়। তাঁর সাহিত্য-চিন্তা বা সাহিত্য-আত্মদ ক্ষমতাই যে ‘সাহিত্য’ বিচারের শেষ কথা নয় এ বোধ তাঁর ছিলনা আর ছিল না বলেই রক্ষণশীল চিন্তাপদ্ধতির ধারক ও প্রচাবক সুরেশচন্দ্র গত যুগের ভ্রমস্থাপে পরিণত হয়েছেন। কেবলমাত্র সাহিত্যসেবীদের কাছেই সুরেশচন্দ্র কিছুটা পরিচিত এবং তাও রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচক হিসেবেই পরিচিত। আর সেই সমস্ত বিরুদ্ধ-সমালোচনা গুলিও সার্থক। সমালোচনা হিসাবে চিরস্থায়ী মূল্য পাবার মত নয়, সেগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে তারা “বিরুদ্ধ”।

সাহিত্যের এই বিরুদ্ধ সমালোচনারও মূল্য আছে নিশ্চয়ই, এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাব ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিরুদ্ধ কথাকে শোভন ও সুন্দর ভাবে বলতে পারাব দৃষ্টান্ত খুব কম সাহিত্যেই আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকের মনোভাব বন্ধুর মত নয়, শত্রুর মত। সেখানে লেখনীর ধার তলোয়ারের

মত; লেখা ও লেখক কে তা সমান ভাবে কাটে। এই শ্রেণীর আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ লিখতেন বুকানন, রসেটিকে আক্রমণ করেছিলেন,—“The Fleishy school of Poetry” বলে। বলা বাহুল্য এ শ্রেণীর সমালোচনারও পক্ষপাতী ছিলেন অনেকেই। তাঁদের মতে যখন “কোয়ান্টারি রিভিউ” “এভিনিউ রিভিউ” প্রভৃতি পত্রের তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হোত তখন ইংরাজী সাহিত্যে যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তেমন আব কখনও হয় নি। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে এমন ধারণাও আছে যে কোয়ান্টারির অতিরিক্ত তীব্র সমালোচনাই কীটসের অকালমৃত্যুর কারণ। আলেকজান্ডার ডুমা থেকে সুরু কবে অনেকে পর্যন্ত সকল ফরাসী ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধেই তীব্র সমালোচনা হয়েছে। আমেরিকার হুইটম্যানের সমালোচনা হ’ল এই ভাষায় “He is disgusting. He is an exceedingly nauseating pill.” বায়রণ শেলী কী কইই না বহন করেছিলেন কবিতায় নোতুন চিন্তা বপন করতে গিয়ে, হৃদযাবগকে ভালোবাসাব ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে। এই সমস্ত সমালোচনায় সাহিত্যিকদের জীবনে এনে দিত নিরাশা, যন্ত্রণা ও দ্বিধা। প্রতিভা বাদের মৃত্যুঞ্জয়ী নয় তারা বিকাশ-প্রাপ্তির পূর্বেই সমালোচনাব তাড়নায় অকালে লুপ্ত হয়ে যেত। শুধু সাময়িক ঝড়ের তাণ্ডব যত তীব্রই হোক না কেন তাকে উপেক্ষা কবে চিরকালের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ধ্রুবতারকাব জ্যোতি নিয়ে বায়রণ শেলী কীটস্ আব সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ।

সুতরাং দেখায়, সাহিত্যের ইতিহাসে বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল, আছে এবং থাকবেও। হয়তো তার চণ্ড বদলাবে, আক্রমণের ধাব ও ধাবা বদলাবে কিন্তু লুপ্ত হবার কোনও কারণ নেই। যে কোনও সাহিত্যে ঠিক স্বরূপটি জানতে হলে তাব স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সব মন্তব্যই সতর্কভাবে সঙ্গে অনুশীলন করতে

হবে। সুতরাং বিরুদ্ধ সমালোচনার সাহিত্য-বিচারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সাবধান হতে হবে বিরুদ্ধ সমালোচনা যেন ব্যক্তিগত আক্রমণের নামান্তর মাত্র না হয়; লেখক ও সমালোচকের মতাস্তব যেন মনান্তর এবং হীনমন্ত্যায় পরিণত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল, তাই তাঁর সমালোচনায় বড়ো বেশী ব্যঙ্গ, দাঘিভ্রষ্টানহীন মন্তব্য ও অশোভন কটু-কাটব্যের ভীড়। এই ধরনের সমালোচনা সাহিত্যেব কোনও কল্যাণ সাধনই করে না, তা শত্রু বৃদ্ধি করে মাত্র। শব্দচন্দ্র বলেছিলেন—সমাজপতির “বলায় কোন ফল হয় না। কেন না, তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালি গালাজ—প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছররাও থাকে না।” এই ধরনের সমালোচনা সুরেশচন্দ্র বহু করেছিলেন—যা মূলতঃ নিন্দা, যা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ঠাকুরবাড়ীর সমালোচনা, কিন্তু কোন দিক দিয়েই সাহিত্য সমালোচনা নয়। এই সমস্ত রচনায় তাঁর পবলীকাতর, অসহিষ্ণু মন অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সইতে পারেন নি, সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে এত অভাবনীয়তা এত উদ্ভাবন, এত আলোর জোয়ার তিনি সহ করতে পারেন নি। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন কেমন করে জেগে উঠছে, বিপর্যস্ত হচ্ছে রক্ষনশীল চিন্তাধারা, নবযুগের ভাব-বিপ্লবের প্রবল নাড়ায় আচ্ছন্ন-চেতনার ঘুম-ভাঙছে। সুরেশচন্দ্র ও তাঁর দল ভয় পেয়েছিলেন—বুঝতে পেরেছিলেন বস্তার মুখে বাগির বাঁধ ভেঙে চুরে ভেসে চলে যাবে। সেই সঙ্গে তাঁদের আচারিত ও প্রচারিত মত ও পথের ঠিকানা আব নিশানা ছুই-ই হাবাবে। তাই শেষ চেষ্টার মত সাহিত্য চিন্তায়, ভাষানির্মাণে প্রগতিকের তাঁরা প্রাণপণে রুখতে চেয়েছিলেন। গতানু-গতিকের প্রতি আত্মগত্য ও আধুনিকতায় অনাস্থা নিয়ে তিনি তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাব গড়ে তুলেছিলেন।

সুরেশচন্দ্র যে নিজেই শেষে ঘোরতর রবীন্দ্রবিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন তাই নয়। রবীন্দ্রবিদ্বেষী হয়ে উঠতে তিনি কোন কোন লেখককে প্ররোচিত করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখায় বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে রবীন্দ্রবিবোধী হয়ে পড়েছিলেন তার কাণে সুরেশচন্দ্রের প্ররোচনা হওয়া অসম্ভব নয়। ‘যাঁদের দেখেছি’ গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার বলছেন, “দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে হঠাৎ তাঁর অমুবাগী রবীন্দ্রনাথের উপবে ক্রুদ্ধ হয়ে ‘প্রবাসী’ এবং ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় তাঁকে তীব্র ও অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করে তখনকার সাহিত্যসমাজে প্রবল এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, অনেকেরই কাছে সেটা রহস্যের মতই হয়ে আছে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ওর মূলে ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি জনকয়েক বন্ধুর প্ররোচনা। কারণ আমি তাঁদের স্বকণে উদ্ভাসি দিতে শুনেছি।”

সুরেশচন্দ্র নিজে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে বাংলাদেশের দীর্ঘ প্রচারিত একটি পত্রের সম্পাদক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সে সুনাম দীর্ঘস্থায়ী হলোনা। কারণ ‘সাহিত্য’ পত্রিকা তখনকার দিনে বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠলেও সেই পত্রিকার পাতায় বিশেষ কোন নতুন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়নি। ফলে তাঁর মনের মধ্যে একটা নিছক ঈর্ষা ও পরজ্ঞা-কাতরতা প্রবল হয়ে উঠেছিল সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রসাহিত্য যে কত নতুন নতুন ক্রম্বর্থে বাংলাসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হবে তুলবে তাব ইঙ্গিত সুরেশচন্দ্র পেয়েছিলেন কিন্তু দেখতে না চাওয়াব অঙ্কতায় সে সম্ভাবনা তিনি স্বীকার করেন নি। বাংলা দেশের সাহিত্য জগতে তিনি রবীন্দ্রবিবোধী বলেই টিকে থাকতে পারেন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় তাঁব নেই।

তাঁব বিকল্প সমালোচনার কয়েকটি উদাহরণ ঙ্গাধাণেব অবগতির জ্ঞত উদ্ধৃত হোল—

সাহিত্য, ২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

‘পাওয়া ও হওয়া’ নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাকে, ভাবকে, বক্তব্যকে নির্দয়ভাবে পাক দিয়া, জড়াইয়া, মোচড়াইয়া যে জটিল প্রহেলিকাব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত। বিবাহ-সভায় প্রস্তাব করা যায়,—‘সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত’ কি? তাহা হইলে বোধ হয় জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননকেও মোনব্রত ধারণ কবিত্তা পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কতখানি ন্যায়ের ফাঁকি, কতখানি সত্য, কতখানি কবিত্ব, কতখানি কথাব প্যাচ, কতখানি ঢেঁকির কচকচি মিশাইয়া রবীন্দ্রবাবু এই ‘পাওয়া ও হওয়া’ব জগা-খিঁচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা কে বলিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—‘একটু বস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়।’ সে কথা সত্য। ‘একটু চিন্তা’ ব্রহ্ম হইলে আমরা তাঁহাকে দূব হইতে নমস্কার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে ‘একটু চিন্তা’ ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ না হইয়া বিঘম প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে; অগত্যা আমাদের মত দুর্ভাগ্য পাঠককে ‘বিপত্তো’ মধুসূদনকে স্মরণ করিতে হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু আজকাল ধর্মোপদেশ্যের কুমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাহার উপদেশগুলি মানববুদ্ধির অতীত হইয়া উঠিতেছে। যতদিন রবীন্দ্র-স্বত্বের ভাণ্ড প্রকাশিত না হয়, ততদিন পাঠকেব পক্ষে ‘গোলক ধাঁধায় নিরুদ্ধেশ-যাত্রা’ অনিবাধ।

সাহিত্য ২১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

আষাঢ় ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নিশীথে’ নামক কবিতায় যে বিনিদ্র বজ্রনীব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত ভয়ংকর। তখন বিশ্ব নিদ্রামগ্ন; অবস্মাৎ কে কবির বীণায় ঝঙ্কার দিল, এবং ‘নয়নে ঘুম নিল কেড়ে!’

নয়নে ঘুম অর্থাৎ নয়নের ঘুম? ‘ঘুম’ পরে থাকিলে নয়নের ‘র’ লুপ্ত হয়।—ইতি ইম্পাতরামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তারপর কবি ‘শয়ন ছেড়ে’ উঠিয়া বসিলেন। ‘আঁখি মেলি চেয়ে থাকি’ তার দেখা পাইলেন না!—কবি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। এ রোগে আঁখি মেলিয়া সারা রাত্রি চাহিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ঘুমের দেখা পাওয়া যায় না। ইহা Insomnia অর্থাৎ অনিদ্রারোগের কথা। আমরা পড়িয়াছি আর কাদিয়াছি। সাধারণ মানবের অনিদ্রারোগে অবসাদ ও যন্ত্রণা ভিন্ন আর কোনও লাভ নাই। কিন্তু কবির Insomnia বন্ধ্য হইতে পারে না। তাই তাঁর ‘গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পুরে,’—অথচ ‘কোন্ বিপুল বাণী ব্যাকুল সুরে বাজিতে’ লাগিল, তাহা কবি বুঝিতে পারিলেন না। সুতবাং ব্যাপারটি গুরুতর ‘কবিতা’ হইয়া উঠিল। অনিদ্রার যন্ত্রণার উপর অনির্বচনীয় বেদনা। অগত্যা কবি বলিলেন,—‘কোন্ বেদনায় বুঝি নারে হৃদয় ভরা অশ্রুভারে’র অর্থ বা অর্থ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পাবিলাম না। অশ্রুভারে’ হৃদয় ভরে না। ‘হৃদয় ভরা অশ্রুভার’ কি তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। অথচ অশ্রু, হৃদয় ও ভরা, এই তিনের সংযোগে দিবা কল্পনরস উৎপলিয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার সমালোচনায় সুরেশচন্দ্র লিখেছেন—

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দেনা পাওনা”—শালতামামীর গান; চৈত্রের উপযোগী বটে। এ ক্ষেত্রে মহাজন সার রবীন্দ্রনাথ, খাতক-হুর্ভাগ্য শ্রীমান্ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। কবি বলিতেছেন,—

“পাণীয়ে দিয়েছে গান, গায় সেই গান,

তার বেশী করে না সে দান।

আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তারো বেশী করি দান,

আমি গাই গান।”

খুব বদান্ততা, সন্দেহ কি? কিন্তু কবির অম্লকরণে, বিধাতা যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, সে যদি তাহার অতিরিক্ত দান করিতে চাহে, তাহা হইলে দুনিয়ার অবস্থাটা সম্ভবতঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলিতেছেন,—

“বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,

সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।

আমারে দিয়েছ বোঝা

তাই নিয়ে চলি পথে কতু বাঁকা, কতু সোজা।”

কিন্তু আমাদের মনে হয় কবিবরের বাতাসের উপর হিংসা করিবার কোনও কারণ নাই। নিজের চলনটুকু যখন লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন তাহার কাবণ-টুকু তলাইয়া দেখিলে আর এতটা আক্ষেপের অবকাশ থাকিত না।

আজকাল ‘ঘরে বাইরে’ তাহার কবিদেব ধরুপ বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে—ঘরের লোক না হউক—বাহিরের অনেকেই বুঝিয়াছে, যিনি ‘আলোকে আঁধারে মিলাইয়া এ ধরবীরে’ গড়িয়াছেন, তিনি সম্প্রতি কেবল ‘একটি স্বাধীন বাতাসেরে’ নয়—উনপঞ্চাশটি বায়ুকেই তাহার কবিদেব ও সংস্কারের শিখমতে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই গানেই তাহার প্রমাণ আছে।

“আর সকলেরে তুমি দাও।

শুধু মোর কাছে তুমি চাও।।

তোমাকে, আমাকে, তাহাকে, ইহাকে, উহাকে—সকলকে খয়রাৎ করিয়া, ককীর হইয়া, জগৎ-পাতা অবশেষে সার রবীন্দ্রনাথের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, ‘জয় রাধে কৃষ্ণ! ছুটি ভিক্ষু পাই বাবা’! সাধকের এমন স্পর্ধা ভারতের তপোবনের অন্তর্গত বঙ্গনামক শাস্ত্রসাসম্পদ আশ্রমপদেই সম্ভব। এই বাদলার হালিসহরে জুড়লে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন বা চাহিয়াছিলেন,—

“আমায় দাঁও মা তবিলদারী।”

যেমন সাধক, তেমনই প্রার্থনা। এই কয়েক বৎসরে বাঙ্গালী সাধনাব ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দিন দুনিয়াব মালিক ‘সিংহাসন হতে নেমে’ নাইট দাতাব দান লইয়া যাইতেছেন। আর তাই কি সোজা দান?—এক রাশি সবুজপত্র। বাস্তবিক এই বহুধাপী বিধাতাব উপর রাগ হয়। এই শস্ত্রশ্রামল দেশের সমস্ত সবুজপত্রে পেট ভরিল না, হ্যাংলাব মত, ক্যাংলাব মত কতকগুলি অকালপক্ক কৃষ্ণেব জীবের একমাত্র ভবসা—খোবাক সবুজ-পত্র ভিক্ষা করিতে আসেন! যাহা হউক, এতদিনে সার্ব রবীন্দ্রনাথের হাত খুলিয়াছে।

(সাহিত্য বৈশাখ, ১৩২০)

সবুজপত্র তথা রবীন্দ্রনাথের কবিতাব আব একটি সমালোচনা দেখুন—

‘সবুজপত্র’ রবীন্দ্রনাথের খাসমহল, তাই ইহাতে রবীন্দ্রনাথের খাস খোস-খেয়ালের এত ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ আজকাল প্রহেলিকায় সিদ্ধ হইয়াছেন। যা লেখেন, তাই প্রায় হেঁয়ালী হইয়া যায়। সর্বত্রই এইরূপ, কিন্তু খাসমহলের হেঁয়ালী সকলের সেরা। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের ‘নববর্ষেব আশীর্বাদ’ পড়িয়া মনে হয়, যেন বর্ধমানের গোলাপবাগেব গোলক ধাঁধায় ঢুকিয়াছি।

‘দূর হ’তে দূরে

বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,

যেন পথহাবা

কেন বৈরাগীর একতারা!’

পথ বাজিতেছে। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, বাঁয়া বাজে, তবলা বাজে; কাড়া বাজে; নাকাড়া বাজে, মাদোল বাজে, দামামা বাজে; পথ বাজিবে না কেন? সানাই বাজে, বাঁশী বাজে; তুরী বাজে ভেরী বাজে; সাপুড়ের তুবড়ী বাজে; রবীন্দ্রনাথের ‘পথ’ বাজিবে নী কেন? বেহালা বাজে, ডাম্ বাজে; সেতার

বাজে, সুরবাহার বাজে, আজকাল হাবমোনিয়ম বাজে, পিয়ানো বাজে; বাউল রবীন্দ্রের পথ,— জলপথ ও স্থলপথ ও ব্যোমপথ বাজিবে না কেন? দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পথও বেতলা বাজিয়াছে! কবি সুর বলিয়া দিয়াছেন,—তাহাব নাম ‘দীর্ঘতান’! কিন্তু তালটি খ্যামটা, না কাওয়ালী, না ঠুংবী, অথবা দশকুশী, তাহা প্রকাশ নাই। এই ‘দীর্ঘতান’ সুরের বাজনা ‘দীর্ঘকর্ণ’ শ্রোতাদেব কর্ণে মধু ঢালিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।—পথ ত বাজিতে লাগিল, সুরতঃ কোন বৈরাগীর একতারা পথ হাবাইল’। অনেক উৎকট সমস্তা শোনা গিয়াছে, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনা রবীন্দ্রনাথের অথর্ববেদেও ইতিপূর্বে দেখি নাই।—‘চলাব অঞ্চলে ত্রোব ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আববি’ যে বুকিতে না পাবিবে তাহার কঙ্গী কি অটুট থাকিবে?—‘নহে প্রেমসীব অশ্র-চোখ’। অর্থাৎ কখনও নৌকার উপর গাড়ী, কখনও গাড়ীর উপর নৌকা। এত দিন চোখে অশ্র ঝরিত এখন অশ্র চোখ ফুটিল। রবীন্দ্রনাথ যে ছেলে বেলাষ লিখিয়াছিলেন,—“জানই আমার সকল কাজে originality” তাহা সত্য। আশ্চর্য এই যে, প্রমথ নাথের মত শ্যেনদৃষ্টি সমালোচকও এই “আশীর্বাদ” শিরোধার্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবের দৈন্ত ভাষাব দৈন্ত, বচনায় কষ্ট কল্পনাব প্রাচুর্য দেখিয়া দুঃখ হয়। মনে হয়, এ যেন তাঁহার পথ নথ।

(সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধাব বিবরণে সুরেশ চন্দ্র লিখেছেন—

“ইংলণ্ডে সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধনা”য় দেখিতেছি,—“ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতেব কোন দেশে নাই।”—আহলাদেব কথা নয়? তবে দেশেব লোকে এতদিন তাহা বুকিতে পাবে নাই;

কারণ, 'চেবাগের নীচেই অন্ধকার।' আর, ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ভক্তবৃন্দের বগলেই বিরাজ করেন, দর্শন দুর্ঘট। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র,—প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। কোন্ কোন্ সুধী এই জগদ্ব্যাপী কবি জরীপেব সার্ভেয়ার ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। ষাঁহারা আমাদের ধন্য কবিলেন, তাঁহারাও ধন্য।

(সাহিত্য কাল্পনিক ১৩১৯)

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় এই জাতীয় ধর-উক্তি শর-বর্ষণের প্রায় সমস্ত উদাহরণই 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ'র ১ম বর্ষের ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংখ্যায় এবং ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায়, সাহিত্য পত্রিকা থেকে পুনরুদ্ধৃত হয়েছে। কৌতুহলী পাঠক সেগুলি থেকে সুরেশচন্দ্রের রসাল, ধারাল, বাচাল ভঙ্গী ব প্রচুর প্রমাণ পেতে পারবেন। এই সমস্ত সমালোচনায় বস্তু কিছু নেই এমনকি অবাস্তব, প্রসঙ্গ বহির্ভূত বহু বিষয় অকারণে আলোচনা

কবেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের মনোবিকারের মাত্রাধিক্যও লক্ষ্যণীয়।

সুরেশচন্দ্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কেবল বিদ্বেষ বা বিবোদ্ধার করেন নি। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার স্তম্ভর সমালোচনার উদাহরণও তিনি বহু রেখে গেছেন। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের বিরোধী সমালোচক' নামে তাঁর যশ বা অপযশ তাঁর একাধিক সার্থক সমালোচনাকেও আচ্ছন্ন করে লোকচক্ষুর অগোচরে নির্বাসিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের বা বক্তৃতার ভাষা বা ভাব নিয়ে যুক্তি সংগত স্তম্ভ আলোচনার স্বত্বপাতও তিনি কবেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সমস্ত পরিচয়ই তাঁর রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনাগুলির জ্বালা ও তিক্ততার কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। সুরেশচন্দ্র তাই সমালোচনার, সম্পাদনার অধিকারী হয়েও হারিয়ে গেছেন বিশেষ কালের বিশেষ মানসিকতার গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন বলেই চিরন্তন সাহিত্যের দরবারে রসজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সমালোচকের মানপত্র তিনি পেলেন না।

আ লো চ না

গোরার বয়স কত ?

গোরা উপন্যাস যে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এ কথা সন্দেহ সমালোচক ও পাঠকেরা প্রায় এক মত। গোবার প্রচণ্ড ভাবোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব গল্পের খুঁটিনাটি ভুলে যাবাব বহু পরেও মনেব মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গাঁথা থাকে। তার বলাব কথাটার জোর যত, বলার ভঙ্গীটার জোর তার চেয়ে বেশি। অনেক সময় নিজের বিশ্বাস না থাকলেও গোরা একপক্ষে থেকে লড়তে লড়তে কথার পর কথা গেঁথে নিজের মতামত নতুন করে গড়ে তুলেছে। তার প্রচণ্ড বুদ্ধি, স্বাদেশিকতা, অনর্গল অনায়াস বাক্যবিহ্বাস তাকে জনপ্রিয় করে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক গঠনের পরিণতির স্তরেরও একটা নির্দেশ দেয়। সাধারণ পাঠকদের গল্প পড়ার পর ধারণা হয় গোরার বয়স পঁচিশ। সবদিকের বিচারে মনে হয় গোরায় বয়স ঐ রকমই হওয়া উচিত। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, গোরার বয়স পঁচিশ এবং বাস্তবের দিক থেকে বিচার করলে ঘটনাকালকে ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে ধরতে হয়। গোরার বয়স যে পঁচিশ এ ধারণা মোটামুটি সফলেরই কিন্তু ঘটনাকাল ১৮৮২।৮৩ বলে প্রমাণিত হলে তবেই গোরার বয়স পঁচিশ হয়।

সুতরাং মূল প্রশ্ন গিয়ে দাঁড়ালো গোরা কোন সময়কাল গল্প। প্রভাতকুমার যে গোরাব কাল ১৮৮২।৩ বলেছেন তা গল্পের ভিতরের সাক্ষ্য টিকবে না। রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র সুনিশ্চিত কাল

আমাদের ইঙ্গিত করেছেন—তা হলো ১৮৫৭ সাল, গোরার জন্মের বৎসর। তাবপর গল্পের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলিকে পবপর সাজালে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা শক্ত হয়ে পড়বে।

বিনয় এবং গোরা দুজনেই এম. এ পাশ। স্বভাবতঃই তার থেকে বয়সের কোঠায় তাদের ২০।২১।২২ এই পর্যায়ে ফেলতে হয়। কিন্তু কত বয়সে এম. এ পাশ তা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, সুতরাং সে দিক থেকে কোন সাহায্য হচ্ছে না।

কিন্তু গোরায় প্রথম যে কালগত ইঙ্গিত পাচ্ছি তা হলো এই—“সেই সময়ে দুই একজন মাত্র বাঙালি সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন।” ‘দুই একজন’ কথাটিকে যদি কিছুমাত্র গুরুত্ব দিতে হয় তা হলে তারিখ ধরতে হয় ১৮৭০। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনবিহারী গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস পাশ করে আসেন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে সত্য যদি ১৮৭০ সালেও ধরে নিই তাহলে কি দাঁড়ায়? গোবার বয়স তেরো। বলা বাহুল্য ঘটনাটা এতই অসম্ভব যে এই ঘটনা সংস্থানকে অগ্রমনস্কতার ফল বলে ধবে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পাশবাবু সূচরিতাকে বিয়ে করতে পারছেন না কারণ সূচরিতার বয়স আঠাবো হয় নি। গোরা, গল্পের খাতিরই নিশ্চয়ই সূচরিতার চেয়ে কিছু বড়।

সুচরিতার আঠারো না হলেও, হতে বেশী ধেরী নেই সে কথা গল্পে খুব স্পষ্ট করে বলা আছে। সুতরাং গোরার বয়স ২৪:৫ হলেই মানায়। সেক্ষেত্রে বিনয়ের সঙ্গে ললিতাব বয়সের পার্থক্যটা কিছু বেড়ে যায় কারণ ললিতা লাংগোর চেয়ে বছর দুয়ের ছোট হওয়াই সম্ভব আবার লাংগ্য সুচরিতার সমবয়সী। কিন্তু এই হিসাবের বাধা স্বরূপ একটা ঘটনা রয়েছে উপন্যাসের মধ্যেই। সেটি হলো এই—“বিনয় নতুন প্রকাশিত বন্ধিমের বঙ্গদর্শন লইয়া আনন্দময়ীকে স্তনাইতেছিল।” তাহলে বন্ধিমের বঙ্গদর্শনের কালই গোরার কাহিনীর কাল বা অতিসংলগ্ন কাল। বন্ধিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রকাশ কাল ১৮৭২-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। যদি শেষ বছরটিও ধরি তাহলে গোরার বয়স কোন মতেই ১৮:১২-এর বেশি নয়। এবং এই বঙ্গদর্শনের উল্লেখ সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করছে যে গোরার উপন্যাসের কাল ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। যত নীচে নামব গোরার বয়স ততই কমবে সুতরাং গ্রন্থান্তর্গত সাক্ষ্য থেকে গোরার ঘটনাকাল ১৮৭৬ খৃঃ ধরা উচিত এবং গোরার বয়স ১২ ধরা অসম্ভব নয়।

গ্রন্থমধ্যে কেশবচন্দ্রের উল্লেখ আছে। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজপতি তা বোঝা যায়। ১৮৬৬ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ছেড়ে নতুন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের উল্লেখ কালের দিক থেকে কোন সমস্তার সৃষ্টি করে নি।

গ্রন্থগত ঘটনাকে ভিত্তি করে যে বয়স পাওয়া গেল তা কখনোও গোরার বয়স নয়। গোরার মন উনিশ বছরের মন নয়। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে উনিবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছেলেদের মন শিক্ষার স্পর্শমণিতে উনিশ কুড়িতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। একবার সত্যতা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় কিন্তু ঐ কথার জোবে গোরার মানসিক পরিণতির প্রতি অন্ধ ধাক্কাও চলে না। শৈল্পপীঠের সমালোচক ব্রাউলে হ্যামলেটের বয়স নিরূপণ করতে গিয়ে জোর দিচ্ছেন তার মনের গড়নের ওপরই। প্রফেসর

ডাউডেনের সঙ্গে একমত হয়ে ব্রাউলে বলছেন, “On the whole I agree with Professor Dowden that, apart from the statements in v.i. one would naturally take Hamlet to be a man of about five and twenty.” একথা বলা বাহুল্য যে পাঠকেরা যখন উপন্যাস পড়েন তখন কোন সময়ে বঙ্গদর্শন লেখা সে কথা হিসেব করে পড়েন না। তারিখের ভুল বা মিসের মাই তাৎপর্য হোক পাঠকের মনে আপনা থেকেই যে ধারণা গড়ে উঠবে সেই ধারণাতেই গল্পের রস পাঠক পেতে পারেন।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে নায়কদের এবং নায়িকাদের বয়স রবীন্দ্রউপন্যাসে ধারায় বদলেছে। চোখের বালির মহিম কলেজের ছাত্র, গোরার গোরা আর বিনয় কলেজ সবে পার হয়েছে। অতীন আর অমিত কলেজের পড়া বেশ কিছুদিন শেষ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়িকাদেরও বয়স বদলেছে; আশা বা হেমন্তিনী বা সুচরিতার বয়স নিশ্চয়ই এলা বা লাংগ্যর চেয়ে বেশ কিছু কম কারণ শেখোক্ত হুজুর মুনিভাণ্ডারি শেষ পড়া অনেক দিন হলো শেষ করেছে।

শিবাজীর চরিত্র বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজীর ভূমিকা কি ছিল তা রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। শরৎকুমার রায়ের ‘শিখগুরু ও শিখজাতি’ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি রচনা করে দেন তা বর্তমানে ‘ইতিহাস’ নামে গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি, কিন্তু ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি যখন আলোচনা করতেন এবং লিখতেন তখনই অসম্ভব করা যেতো যে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ঘটনাবিন্যাসের অন্তরালে প্রবাহিত বহুতর সত্য দেখতে পেতো—অন্ততঃ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনত্ব নতুন করে পাঠক সমাজকে চিন্তিত করেছে।

শিবাজীর সম্পর্কে একাধিক কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মহারাষ্ট্রের ইতিহাস সম্পর্ক তাঁর গভীর কোঁতুল এবং ঐশ্বর্য্য ছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কালে, আবঙ্গজেবের বাঙ্গলকাল থেকেই নানা জায়গায় ছোটখাটো বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগলো। এই সব বিদ্রোহের নেতারা অধিকাংশই দস্যুজাতীয়, তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশি ছিলনা। স্থানীয় এলাকার মধ্যে লুটপাট করে মোগল প্রতিনিধিকে বিপন্ন কবেই তাদের কাজ ফুটিয়েছে। বলাবাহুল্য শিবাজী তা ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধে শিবাজীর যা মহত্ব তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়েছেন :—

“শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে সুপরিষ্কৃত করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাত্মক জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন ; তিনি দেশজয় শত্রুবিনাশ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাপী একটি বৃহৎ সঙ্কল্পের অঙ্গ ছিল।”

রবীন্দ্রনাথ দেখাবার চেষ্টা করেছেন কেমন করে শিবাজীব আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। দাক্ষিণাত্যে ধর্মগুরুরা সে কাজ কবেছিলেন। হিন্দুধর্মকেই ভিত্তি করে শিবাজীর সংগঠন এবং মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ রচনা করার জন্য তার ব্যাকুল চেষ্টা।

কিন্তু শিবাজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ কথা নয়। তিনি সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন যে (১) হিন্দুধর্ম নিজের মধ্যেই বহু আচার বিচার গত বিচ্ছেদের বীজ লালন করছে। (২) ভাবতবর্ষের ছিন্নপূর্ণ সমাজে কোন ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না, অল্পদিনেই নির্জীব আচার বিচারে ভাবের ক্ষেত্র অধিকার করে। (৩) শিবাজী হিন্দুসমাজের এই ছিন্নগুলিকে ঢেকে দিতে পারে

এমন কোন ভাবেব আশ্রয় নেননি। (৪) হিন্দুধর্ম বাইরে থেকে পীড়িত এই কথাটাই শিবাজী খুব জোবেব সঙ্গে বুঝেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন, ভিতরে যে বাধা মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করছে সেদিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেন নি।

শিবাজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ঐতিহাসিক ভক্তির বমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত জয়ন্তী উৎসর্গ গ্রন্থে রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধটি ‘রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের অভিমত এই যে শিবাজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ইতিহাস সম্মত নয়। রমেশচন্দ্র বলেন—

“রবীন্দ্রনাথের এই সমুদয় উক্তি আদর্শের দিক দিয়া খুব উচ্চতরের সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ঘাচাই করিলে তাহাব মূল্য কতটুকু দাঁড়ায় তাহা বিচার করা উচিত। শিবাজীব পূর্বে মহাবাহু অনেক সমাজ ও ধর্মসংস্কারক জন্মিয়াছিলেন। শিবাজী যদি কেবলমাত্র তাঁহাদের দলবৃদ্ধি করিতেন তাহা হইলে মারাত্মকদের অবস্থা যে পূর্বাপেক্ষা বেশি উন্নত হইত এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কাণ নাই। বিজাপুর আহমদনগর অথবা মুঘলের পদানত হইয়াই তাহাদের জীবন কাটিত। এই অবস্থায় মারাত্মকদের দাসসুলভ মনোবৃত্তি সমাজের বড় বড় ছিন্নগুলিকে বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইত অথবা এরূপ প্রয়াসে সফল হইত, ভাবতের অন্যান্য প্রদেশগুলির দিকে তাকাইলে তাহা মনে হয় না।

ভক্তির রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই অভিমত খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন যে শিবাজী সমাজের ছিন্ন পূর্ণ করেন নি এ কথা ঠিক কিন্তু বাস্তবিক অর্থেই ছিন্ন পূর্ণ কবে

সমাজেব ছিন্ন পূর্ণেব সরঞ্জাম যুগিয়েছিলেন। মোগলবাজ্যেব ধ্বংসস্তূপের উপর শিবাজী যে ছিন্নবি-
 ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে এক কবে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপন
 কবেছিলেন, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের মতে, “তাহাই
 ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাব পথ জুগম করিয়া
 দিযাছিল।” রমেশচন্দ্রের আশঙ্কা শিবাজীর উদ্ভব না
 হলে বৃটিশ যুগে গাযকোয়াব, সিদ্ধিযা, হোলকাব,
 ভোঁসলে, ঝাঁসী প্রভৃতি বাস্তবে দেখা পাওযা যেত না,
 বরং “নিজামের অধীনস্থ হায়দ্রাবাদের গ্রায় বহু মুসলমান
 বাস্তু দেখিতাম এবং এই সমুদয় স্থানে বলপূর্বক
 উর্দুভাষাব প্রচলনে ইসলামীয় সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি
 ও হিন্দু সভ্যতার যথেষ্ট সংকোচ হইত।” রমেশচন্দ্রের
 এই দৃষ্টিভঙ্গী যে ববীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে
 একেবারে পৃথক সে কথা ব্যাখ্যা করাব দরকাব নেই।
 রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে হিন্দুধর্মেব আচার
 বিচারগত খণ্ডাংশগুলিকে কোন বৃহৎ ভাবের ঐক্যে
 শিবাজী গ্রথিত কবে তুলতে পাবেন নি, রমেশচন্দ্রের
 বক্তব্য এই যে তবু শিবাজী ছিলেন বলেই না দক্ষিণ
 ভারতে ইসলামেব প্রসাবে ঠেকানো গেল।
 ববীন্দ্রনাথের অভিমত ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই
 করলে কি মূল্য পাবে সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যথেষ্ট
 সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন।

রমেশচন্দ্র আবও বলেছেন যে মাবার্ঠা শিখ ও
 জাতীয়তাবাদেব আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সিদ্ধান্ত
 করেছেন তা “ভারতবাসী সমর্থন করে নাই—কখনও
 কবিরে এক্রপ সম্ভাবনাও কম।”

কিন্তু ভাবতবর্ষের বর্তমান যুগেব শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক
 যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অত্যুৎকৃষ্ট। রমেশচন্দ্র
 বলেছেন রবীন্দ্রনাথের মাবার্ঠা জাতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত
 ‘ভারতবাসী সমর্থন করে নাই’—এই মন্তব্য অর্থহীন
 একদেশদর্শী বলে মনে হয় যখন দেখি রবীন্দ্রনাথের
 অভিমত সমর্থন করছেন আচার্য যদুনাথ সরকার।
 তাঁব শিবাজী সম্পর্কিত গ্রন্থে আচার্য যদুনাথ যুক্তি
 পবম্পূরায় প্রমাণ কবেছেন হিন্দুসমাজের বহুধা খণ্ডিত

কপকে শিবাজী কোন ঐক্যতন্ত্রে বান্ধতে পারেন নি।
 তিনি ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখিযেছেন যে রবীন্দ্রনাথের
 অভিমত সত্য।

আচার্য যদুনাথ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদেব প্রবল কলহকে
 মারাঠা বাজ্যের পতনের কারণ বলে দেখিযেছেন।
 শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থ নয়, ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কৌকনবাসী,
 চিৎপাবন, পুণা অঞ্চলেব দেশস্থ, গোয়া অঞ্চলেব গোঁড
 সাবস্থত প্রভৃতি শাখার মধ্যে তুমুল বিরোধ। বাষ্ট্রীয়
 ঐক্য শিবাজীর জীবিতকালেরই ঘটনা। তাঁর মৃত্যুব
 পর, “জাতের সঙ্গে জাত, এমন কি একই জাতের
 মধ্যে এক শাখাব সঙ্গে অপব শাখা, বিবাদ করিতে
 লাগিল; সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, বাষ্ট্রীয় একতা
 লোপ পাইল, শিবাজীর অমুঠান ধূলিসাৎ হইল।”

রমেশচন্দ্র বলেন শিবাজী “হিন্দুর রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের
 ছিন্ন কতকটা পূর্ণ করিয়া সমাজের ছিন্ন পূর্ণ করিবার
 সরঞ্জাম যোগাইয়াছিলেন,” আর আচার্য যদুনাথ
 বলেন; “সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, রাষ্ট্রীয় একতা
 লোপ পাইল।”

মারাঠা বাজ্যের পতনেব কারণকে আর একটু
 বিশ্লেষণ করে আচার্য যদুনাথ বলেন, “মারাঠাবা রাজ্য
 হারাইয়াছে, তাহাদের ভারতব্যাপী প্রাধান্ত লোপ
 পাইয়াছে, তাহাদের আবার বিজ্ঞাতির পদানত হইতে
 হইয়াছে, তবুও তাহাদের চৈতন্য হয় নাই, তাহাদের
 মধ্যে এই জাতে জাতে বিবাদ আজও চলিয়াছে—
 জাতিভেদের বিষ এতই ভীষণ।”

নিজের বক্তব্য শুধু কতকগুলি মনোগত মন্তব্যে
 সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি যথেষ্ট যুক্তিব অবতারণা
 কবেছেন। শেষে রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে
 দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিযে নিজের মত সমর্থন করেছেন।
 ভারতবাসী সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথেব শিবাজী
 সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ধাবণাকে সমর্থন কবলো কি না
 করলো তাতে কিছু যায আসে না, কিন্তু আচার্য যদুনাথ
 রবীন্দ্রনাথেব মতামতকেই ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থিত
 বলে স্বীকাব কবেছেন।

রবীন্দ্রনাথের যে মতামত নিয়ে এই তর্কের উদ্ভব তা হলো এই,—“শিবাজী যে হিন্দু সমাজকে মোষণ আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচার বিচারগত বিভাগ বিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিষ। সেই বিভাগমূলক ধর্ম সমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা—ইহাই অসাধ্য সাধন।

“শিবাজী এমন কোন ভাবকে আশ্রয় ও প্রচাৰ করেন নাই যাহা হিন্দু সমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবাব নহে ; কারণ ধর্ম সেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরেই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলি বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া এমন কি সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধমবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া সেই শতদীর্ঘ ধর্ম সমাজের স্বরাজ্য এই সুরহং ভারত-বর্ষে স্থাপন করা কোন মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধান সঙ্গত হইতে পাবে না।”

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি রেকর্ড প্রসঙ্গে

কিছুদিন পূর্বে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে দুটি রেকর্ড শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। বেকর্ড দুটি হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্-এর। রবীন্দ্রনাথের গান দুটি যথাক্রমে ‘সুব ভুলে সেই ঘুরে বেড়াই’ (HSB 6998) এবং ‘আজি যত তারা আকাশে’ (HSB 6999)। রেকর্ড দুটির নীচের দিকে বিশ্বভারতী প্রতীক

রয়েছে এবং Viswabharati (Society) Music Board এর সহযোগিতায় ‘recorded’ হয়েছে বলে উল্লিখিত আছে।

গান দুটি শুনে মর্মাহত হয়েছি। এ কারণে নয় যে রেকর্ডিং খারাপ হয়েছে, অথবা এও নয় যে শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের গান ভালো হয়নি (যদিও স্বীকার্য শ্রী বিশ্বাস একসময় এর চেয়ে অনেক ভালো গাইতেন)। মর্মাহত হয়েছি এইকথা ভেবে যে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে কিছু সংখ্যক শুনী সঙ্গীতজ্ঞ থাকে সত্ত্বেও কি করে এই গানটিতে এমন ‘উৎকট’ আবহসঙ্গীত ব্যবহৃত হল। যাবাই এই রেকর্ডটি শুনবেন, তাদের যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান নাও থাকে, তবু রীতিমত আঁতকে উঠবেন এই ভেবে যে সস্তা বোম্বেমার্কা ফিল্মের আবহসঙ্গীত এই গান দুটির সঙ্গে কি করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি কি করে তারা রেকর্ড কোম্পানীকে এই আবহ-সঙ্গীতযুক্ত গান দুইটির রেকর্ডিং-এর অনুমতি দিলেন। আরও আশ্চর্য হচ্ছি, দেবব্রতবাবুর মত নিষ্ঠাবান শিল্পী কি কবে এই রেকর্ড করতে রাজী হলেন। যে আবহ সঙ্গীত গান দুটিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অতি নিকৃষ্ট আধুনিক ফিল্মের সঙ্গীতেও তা কদাচিৎ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রেকর্ড কোম্পানী ব্যবসা করতেই বসেছেন—তাদের কাছে আমরা আদর্শবাদ আশা করি না। যে গান যেভাবে পবিবেশিত হলে আর্থিক আনুকূল্য আসবে তারা সে গান সেভাবেই পরিবেশন করবেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান শিল্পীদেব এবং বহু শুনীজন সমন্বিত বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডকে আবার এ বিষয়ে ভাবতে বলি। তাদের সামনে নিশ্চয়ই কিছুটা আদর্শবোধ এখনো রয়েছে। তাই নয় কি ? বিশেষ করে যেখানে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত। *

অরুণ ভট্টাচার্য।

* (উদ্ভব সুরী’র সৌজন্তে)

গ্ন হা লো চ না

Boundless Sky—Rabindranath Tagore.
Viswa Bharati. Price 14.50

প্রধানতঃ অবাদ্দালী পাঠকদের কথা মনে রেখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরাজী রচনা সংকলন প্রকাশ করেছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতার এই সংকলন সাহিত্যরসিক পাঠকদের আকৃষ্ট করবে এ কথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থ শেষে টীকা সংযোজিত হয়েছে। রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকদের রসগ্রহণে সহায়ক হবে। ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথের রচনা অবাদ্দালীদের হাতে পৌঁছানোর দরকার আছে। কারণ ইতিমধ্যেই কোন কোন পল্লবগ্রাহী অবাদ্দালী পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের বিকৃত ব্যাখ্যা স্রু করেছেন। একথা কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা কবীর নানক প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্ত সাধুদের দুর্বল অনুকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যচর্চার বিরাট পটভূমির সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার ফলেই এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরাজীর মাধ্যমে অবাদ্দালীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজন অল্প নয়। ‘বাউগ্লেস স্বাই’ সেই প্রচেষ্টার ফল।

যে রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি অধিকাংশই সুপরিচিত। কিন্তু এই সংকলনের পক্ষে সবগুলিই যে সুনির্বাচিত এমন কথা বলা বোধহয় কঠিন হবে। নাটক অংশে নটর পূজার অনুবাদ এই সংকলনের উপযোগী বলে আমাদের মনে হয় নি।

নটর পূজার একটি সার্বজনীন আবেদন আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলি শুধু বিষয়বস্তুর গোঁরবে নয় আঙ্গিকের বিচারেও তাঁর নিজস্ব সেইগুলির যথা রাজা, মুক্তধারা প্রভৃতির যে কোন একটি স্থান পেলে ভাল হতো। প্রবন্ধ সংকলনেও কালান্তর গ্রন্থ থেকে আরও ছ’একটি প্রবন্ধ স্থান পেলে সংকলনের সম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পেতো। ‘মহাত্মা গান্ধী’ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি অন্ততঃ রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও এণ্ড্রুজ সাহেবের সম্বন্ধে রচনার অনুবাদ থাকা উচিত ছিল।

পিছনে যে টীকাগুলি সংযোজিত হয়েছে সেগুলিও কোথাও কোথাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। Worshippers of Buddha, পত্রপুটের কবিতা, কেবল এই কথাটুকুই লেখা আছে। এই কবিতা জাপানের মুদ্রসজ্জিত সৈন্ত-দলের প্রতি যে এক তীব্র বাদ্য এ কথা লেখা উচিত ছিল, কারণ কবি নিজেই এই কবিতার পাঠান্তরের উপর ছলাইনের একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন। সেইটুকু না পেলে এ কবিতার রসের গাঢ়তা অনুভব করা হয়তো কঠিন হবে। কবিতাগুলির সঙ্গে মূল রচনার তারিখ যেখানে যেখানে থাকা সম্ভব থাকা উচিত ছিল। কবিতাগুলির কালগত ব্যবধান জানা না থাকলে পাঠকের পক্ষে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

গ্রন্থের বাহ্যিক আবরণের চাকচিক্য কোন কোন পিউরিটান পাঠকের ভাল লাগে নি। কিন্তু গ্রন্থের প্রচ্ছদ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হলে তাতে আপত্তির কি আছে। সেক্সপীয়ারের কত বিচিত্র সংস্করণ আবরণের ঐচ্ছল্যে দীপ্ত। তাতে কাউকে আপত্তি করতে শুধুনি,

অথচ রবীন্দ্রনাথকে সাজিয়ে শুছিয়ে কেন অবাকালী পাঠকেব কাছে উপস্থিত করতে হবে এই ধবনের ক্ষোভ প্রকাশ হতে দেখেছি। মতামতের তর্ক তুলে লাভ নেই। বর্তমান সমালোচকের অস্তিত্ব এই যে বইয়ের প্রচ্ছদপট সুসজ্জিত হওয়া ভাল, যেখানে সাহিত্যমূল্য ইতিপূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

—সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়—শচীন সেন।

বীডাস কর্ণাব। মূল্য ১১.০০ টাকা।

বর্তমানে এই গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ চলিতেছে, স্মৃতিরাং বিস্তৃত সমালোচনার অবকাশ নাই। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৬ সালে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত। লেখক কবির প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন এবং কবি সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্য, উপন্যাস ও ছোট গল্প এবং নাটকের গ্রন্থসমূহ ধারাবাহিক আলোচনা আছে কিন্তু কবিতা বিষয়বস্তুগত আলোচনার ধারায় গ্রথিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের সমগ্র পরিচয় একটি খণ্ডেব মনে দেওয়া অসম্ভব। লেখক প্রবন্ধগুলিকে বাদ দিয়াছেন কিন্তু যেগুলি আলোচনার জন্ত লইয়াছেন সেগুলি একটি মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সব মতামতই গ্রাহ্য হইবে এমন কথা নাই কিন্তু আলোচনার ধারায় বসগ্রাহীতার যে পরিচয় আছে তাহাতে পাঠকেরও রস গ্রহণে সহায়তা হইবে।

শচীনন্দন সিংহ

মনীষী রবীন্দ্রনাথ। লেখক—শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। দাম—৩.৫০ পয়সা।

মনীষী রবীন্দ্রনাথ বইখানি গবেষণামূলক পুস্তক নয়। অতি সহজ ও সরল ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মানস-প্রকৃতির অনবদ্য আলেখ্য এতে চিত্রিত হয়েছে। লেখক ইনিয়-বিনিয় ব্যক্তিগত কোন

কথা বলাব চেষ্টা করেন নি। তিনি জানিয়েছেন, “শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও মনীষা কিছু জানাব সুযোগ হয়। তাঁর শিক্ষা-প্রয়াস ও সমাজসেবা-প্রচেষ্টার চিত্রণ চোখে পড়ে। এই সামান্য বচন তারই ফল।”

লেখক যা চোখে দেখে জেনেছেন, তাকেই তিনি এই গ্রন্থে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্ত কোন কথা ফুলিয়ে-ফাপিয়ে বা অস্পষ্ট ক’বে বলেন নি। ইচ্ছে ক’রলে তা তিনি ক’রতে পারতেন, কারণ পণ্ডিত বলে শিক্ষিত সমাজে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বহুদিন তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিজি সাহিত্যের সর্বোচ্চ অধ্যাপক-রূপে কাজ কবেছিলেন। পবে শান্তিনিকেতনেও কিছুকাল সুখ্যাতিব সঙ্গে অধ্যাপনা করেছেন। স্মৃতিবাং তাঁব কাছ থেকে একখানি দুর্লভ তত্ত্ব দর্শনে ভারাক্রান্ত দুর্বোধ্য গ্রন্থ-আমবা পেতে পারতাম, কিন্তু তিনি আনন্দের তা দেন নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পাঠ ক’বে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে, তাঁব মনে যে শ্রদ্ধা জেগেছিল, অপরূপ ভাষায় তাকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের অর্থ স্বরূপ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মনীষা বলতে লেখক যা বুঝেছেন তা হ’চ্ছে, রবীন্দ্রনাথের আন্তর সত্তাব বিকাশ অর্থাৎ তাঁব ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই এনে দেয় অসীমের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি একটি বিশিষ্ট ক্রিয়া—এতে সৃষ্টির আনন্দ বিজ্ঞমান। অসীমের সত্তা ক্ষুদ্র নয়, খণ্ড নয়, সামগ্রিক। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সামগ্রিক সত্তা কি ভাবে বিকাশ লাভ ক’বে সৃষ্টির আনন্দে পূর্ণ হ’য়েছিল, তাবই চিত্রলিপি রচনা কবেছেন লেখক।

মনীষীরা চিবকালই অসম্ভব ও অজ্ঞাত জিনিসের অল্পসম্মানে ব্যস্ত থাকেন। রবীন্দ্র-প্রতিভাও এই অনিশ্চিতের পথেই অগ্রসব হয়ে মুক্ত হ’বেছে। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে উল্লঙ্ঘন ক’বে, বাসনাকে অভিক্রম কবে, অন্তবকে সীমার বাইরে ব্যাপ্ত ক’বে

দিয়েছিলেন। এতেই তাঁর জীবন-সাধনাব সার্থকতা ঘটেছে।

কিন্তু তাহ'লেও একথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই বেদান্তের নিগূর্ণ ব্রহ্মকে মেনে নেননি। তিনি প্রচার কবেছেন, তাঁর ব্রহ্মাত্মত্বটি মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। যিনি তাঁর উপাস্ত তিনি মানুষ, তিনিই ঈশ্বর। যিনি একেব অন্তরে আছেন, তিনিই সকলের অন্তরে বর্তমান। তাঁকে অহমিকা মুক্ত চিং শক্তির দ্বারা গ্রহণ ক'রতে হয়। মানবিকতার এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র। এইভাবে প্রকৃতি হয়েছে তাঁর পবনাস্ত্রী, ধর্ম হয়েছে প্রাণের জিনিস। আর প্রেম অর্থে তিনি বুঝেছেন আত্মার বিস্তার প্রেমেব ভেতর দিয়ে শ্রেয়ো বোধ। বাক্যে এককথায় বলা যায় অবিশিষ্ট কল্যাণ-ভাবনা। এই কল্যাণভাবনাব জগতই তিনি সারাবিশ্বের মানুষের কাছে আস্ত্রীয় হয়ে উঠেছিলেন।

লেখক তাঁর 'মনীষী রবীন্দ্রনাথ' বইখানিতে এ-সব কথা অতি সুন্দরভাবে আলোচনা ক'বেছেন। ছ'-টি অধ্যায়ে বইখানি সমাপ্ত হয়েছে। প্রথমে তিনি কবির আবির্ভাব-কালকে সমকালীন দেশ ও সমাজেব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রেছেন। পরে প্রথম ইউরোপ যাত্রাব সময় থেকে তাঁর মনের বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল তা দেখিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর শিক্ষার আদর্শ, জাতীয়তাবাদ এবং সাহিত্য সৃষ্টির মূল ভাবনাগুলিব বিষয়ে সুনিপুণ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থশেষে প্রাচ্য-সংস্কৃতিব বাহক ও মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি উপায়ে অল্পভাবনা সংযোজন করেছেন।

সমকালীন-দেশ ও সমাজ অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ—এই তিন সংস্কৃতির মিলনে গড়ে উঠেছিল। গোড়া থেকেই ঠাকুরবাড়ীর লোকেরা মুসলমানী পোষাক পরিচ্ছদ ও আভিজাত্যে কেতা-

দ্রুস্ত ছিলেন। তাঁরা ধুতি-চাদরবেব পবিবর্তে পরন্তেন পায়জামা, আচকান, পাগুড়ি। আরও অনেক বিষয়ে মুসলমানী রীতিনীতি মেনে চলতেন। অল্পদিকে ব্রিটিশবাণিজ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রচলনও তাঁদের মধ্যে ছিল। ক্রমে ইউরোপীয় শিক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্লান ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রলে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বণিক-বৃত্তি ও যান্ত্রিক সভ্যতাকে ধিকাব দিয়েছিলেন। তবে একথাও তিনি ব'লেছিলেন যে, পূর্ব-পশ্চিমের যা কিছু ভাল, তার আদান-প্রদান ক'রতে হবে। এইভাবে নতুন ভারতের গোড়াপত্তনে রবীন্দ্রনাথ সাহায্য করেছিলেন।

প্রথম বয়সে বিলাত গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু শিখেছিলেন। লণ্ডনের কর্মচঞ্চল জনস্রোত তাঁর মনে অসীম বিশ্বাসের সৃষ্টি ক'রেছিল। সাহিত্যেব বিশ্ব-জনীনতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই বিলাত থেকেই জন্মেছিল। বিলাতেব সাহিত্য তাঁকে দেশকালেব বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কৈশোরের ইউরোপ-বাস ও ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্ম, বিশ্বমানবের মন নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবনৈতিক আন্দোলন আবস্ত করার আগে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাব প্রয়োজন বোধ করেছিলেন অধিক। তাঁর মতে, যেখানে মন পঙ্কু সেখানে কর্ম ব্যর্থ হবেই হবে। তাই তাঁর শিক্ষার আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ এক স্বতন্ত্র পথ ধবেই পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তিনি ব'লেছিলেন, আমদানী করা শিক্ষা ভারতবাসীর চিত্তকে অন্ধকরণ-প্রিয় ক'রে তুলছে, মনন শক্তি ও ভাবপ্রবণতায় উদ্বুদ্ধ ক'রছে না। যা থেকে মনেব মুক্তি হয়, তা যদি শিক্ষা হয়, তবে তা বিদেশীর আনীত শিক্ষা থেকে হবে না। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে মাতৃভাষাকে শাস্তিনিকেতনের বিভাগেব শিক্ষার বাহন কবেছিলেন। আজ সারা ভারতে তাঁরই আদর্শ গৃহীত হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদেরও অভিনবত্ব আছে। তিনি সংস্কাবিহীন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ কোন দিনই কল্পনা করেন নি। মামুলি রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর জাতীয়তাবাদ, মানবিকতার সঙ্গে, সম্পৃক্ত ছিল ক্রুব সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যলিপ্সা ও সামরিক শক্তির আশ্ফালনকে পৃথিবীর শাস্তির অন্তরায় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি চেয়েছিলেন আপন-জ্ঞান থেকে আত্মীয়জ্ঞান, তার থেকেই সমাজজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান। এই বিশ্বাত্মত্বটিই তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল নূতন জাতীয়তাবাদ, নূতন মানবপ্রীতির ধারণা।

এ সব কথা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী অলৌকিক প্রতিভাও এমন স্বচ্ছন্দ আলোচনা আমবা খুব কমই পড়েছি। বইখানি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি নূতন সম্পদ বলে গৃহীত হবে। এমন বইয়ের বহুল প্রচাব বাঞ্ছনীয়, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও বিদ্যাস-শোভাতেও বইখানি প্রশংসনীয়।

শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী

কবিশঙ্কর—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬। মূল্য—৪.৫০ টাকা

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের এই রচনাটি বাংলা-সাহিত্যের পার্থক্যবর্গের নিকট দশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া পরিচিত। 'অমূল্যধন ছান্দসিক হিসাবে যে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন তাহাই যে তাঁহার শেষ পবিচয় নহে এই গ্রন্থ তাহারই প্রমাণ। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আমরা যত গ্রন্থ দেখি তাহার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অতি খণ্ডিত ধারণা দেয়। তিনি কোথাও বৈষ্ণব, কোথাও প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমবিলাসী কোথাও জাতীয়তার গুরু—এই জাতীয় ঋণ ঋণ ধারণার রবীন্দ্রনাথকেই অধিকাংশ গ্রন্থে আমরা আবিষ্কার করি।

অমূল্যধনের কবিশঙ্কর সেই জাতীয় গ্রন্থ যাহা

সংস্কারমুক্ত উদার স্বচ্ছ জীবনাদর্শের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে দেখিতে সাহায্য করে। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথকে ভাবের দিক হইতেই দেখেন নাই। চিন্তায় মননে কবি রবীন্দ্রনাথ যে ভাবতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ একথা তিনি সম্যক্ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রজীবনাদর্শ বিশ্লেষণে লেখক রবীন্দ্রনাথের সাধনায় মানব প্রবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধনার সমন্বয় লক্ষ্য করিয়াছেন। সমাজে ও ধর্ম ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ কখনো কখনো সমন্বয়ের চেষ্টা করিবাছে কিন্তু বস্তুজগত ও ভাবজগতের যে বিরোধ মানুষকে বহুকাল ধরিয়া পীড়িত করিয়া আসিতেছে তার একটা সমন্বয়ের নির্দেশ যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে লেখক সে কথা নিপুণ ভাবে বলিতে পাবিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বাবুয়ানির নামে শুষ্ক বৈরাগ্য রবীন্দ্রনাথ কখনো সমর্থন করেন নি। তিনি যে কেবলমাত্র কোমলতা ও লাগিত্যের কবি লেখক এ অভিযোগের তীব্র উত্তর দিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, “বিষয়কে তিনি বর্জন করেন নাই, আবাব তাহাকে ঝাঁকড়াইয়াও ধরেন নাই, ছুৎকে তিনি ভয় করেন নাই, অশাস্তিতে তিনি বিচলিত হন নাই।” অমূল্যধন রবীন্দ্রনাথকে নবধর্মের প্রচাবক বলিয়াছেন, যে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো

১) আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি
২) বাস্তব জগত ও সাংসারিক সত্যের প্রতি আগ্রহ
৩) সুস্থ সহজ সংস্কারে প্রতীত সুন্দর ও মহৎকে অঙ্গীকরণ। রবীন্দ্রজীবনাদর্শের এই মূল খসড়াটি ধরিয়ে দিয়ে লেখক সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে গভীর যোগ থাকায় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে একটা তুলনামূলক পটভূমি পবিপ্রেক্ষিতে রেখে লেখক বিচার করতে পেরেছেন। এ গ্রন্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যমুরাগী পার্থক ও ছাত্রদেব কাছে অবশ্যপাঠ্য বলে পরিগণিত হোক।

স্মৃতিকথা—শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

বৈতানিক প্রকাশনী ৪ নং এলগিন রোড।

কলকাতা-২০।

দাম ১.৫০।

একটি দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক

উন্নয়নে একটি মাত্র পরিবার কতভাবে এবং কত দিকে অসামান্য অবদান রেখে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম আর একটি পরিবারেরও সাক্ষাৎ মেলে না যেখানে এতগুলি প্রতিভাধর এক সংগে এসে জন্মেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কিরণে অন্তরা সাধারণের চোখে অনেকটা ঝাপসা হয়ে গেলেও স্বভাবভাবে তাঁদের যদি দেখা যায়, তবে তাঁদেরও প্রতিভার স্ফুল্বে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এই সব মনীষীকে নিয়ে বহু আলোচনা এখানেই হয়েছে এবং আরো হবার সম্ভাব্য অবকাশ রয়েছে।

মার্কসের যেমন রয়েছে একটি সামাজিকরূপ, তেমনি রয়েছে একটি ব্যক্তিগত পারিবারিকরূপ। সমাজ-জীবনে ঠাকুরবাড়ীর প্রতিভাধরদের অবদান নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় তাঁদের ব্যক্তিরূপের আলোচনা ততটা হয় নি। অথচ, এই সব মহৎ ব্যক্তির তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে চলতেন, তাঁদের সাংসারিক জীবনদর্শন কি ছিল, চিন্তা এবং চর্চায় তাঁদের ঐক্য ছিল কিনা—এই সব জ্ঞানবীর জন্ত সাধারণ পাঠকের রয়েছে অসীম কৌতূহল। তাঁদের সম্বন্ধে একটা অখণ্ড ধারণা লাভ করতে হলে জীবনের রংগমঞ্চে সামাজিক এবং পারিবারিক উভয়বিধ ভূমিকাতেই তাঁদের অভিনয় সুষ্ঠুভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। এই মনীষী-মণ্ডলীর অখণ্ড ভাবমূর্তি যদি আমাদের দেখতে হয়, তাঁদের চরিত্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন যদি আমাদের করতে হয়, তাহলে তাঁদের পারিবারিক অন্তরংগ রূপটিও আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। এই কাজটি করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা তাঁদের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং স্নেহ পেয়েছেন। কলে মহতের স্নেহমগ্ন ব্যক্তিদের স্মৃতিকথার মধ্যে মেলে তাঁদের অন্তরংগ পারিবারিক রূপটি। তাই স্মরণীয় পুরুষদের স্নেহমগ্ন ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা সেই বরেন্দ্র পুরুষদেরই ব্যক্তি-জীবনের পরিচয়বহু অমূল্য দলিল। এই হিসাবে

বর্তমান আলোচ্য “স্মৃতিকথা” গ্রন্থ ঠাকুর পরিবারের চারজন বরেন্দ্র মনীষীর অপূর্ব জীবনালেখ্যসম্বিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কল্পা সৌদামিনী দেবী লিখেছেন তাঁর পিতৃদেবের কথা। বাংলা সাহিত্যের অকালে বয়ে পড়া প্রতিভাকুসুম বলেদ্রনাথের কথা লিখেছেন তাঁর মা স্বামীপুত্রহারী দৈবদুঃখিনী প্রফুল্লময়ী দেবী। ঋষিকল্প মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের আত্মভোলা সরল মধুর রূপটি উজ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরই পুত্রবধূ হেমলতা দেবী। আর রবীন্দ্রনাথের সংসার এবং আন্তর জীবনের কথা লিখেছেন ভ্রাতৃপুত্র বধূ হেমলতা দেবী এবং ভ্রাতৃপুত্রী ইন্দির দেবী।

এই লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে সরল সহজ কথায় বিরাট পুরুষগুলির অন্তরংগ চিত্র তথা ঘরোয়া রূপ। মনীষায় এবং প্রতিভায় যুগন্ধর এই পুরুষদের যে সংসার-জীবন-ভঙ্গায়, সৌজন্মে, আন্তরিকতায় মনুষ্যত্বের অপকল্প ছিল, সেই স্নিগ্ধ স্নন্দর জীবনের আকর্ষণীয় পরিচয় মেলে এই লেখাগুলিতে। লোকোত্তর প্রতিভাশালী এই ব্যক্তিদের অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা, ছোট ছোট ভালোমন্দের বোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেয়াল, লৌকিক বিবাহাদির কাহিনী প্রভৃতি প্রাত্যহিক সংসার জীবনের বিচিত্র ঘটনার মধ্যেও তাঁদের মহৎ কিভাবে ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় পাই এই গ্রন্থে। তাতে লোকসমাজে তাঁদের পরিচিত জীবনের সংগে এই অপরিচিত জীবনটুকুও সংযুক্ত করে তাঁদের একটি অখণ্ড ভাবমূর্তি আমরা অনায়াসে গঠন করে নিতে পারি। এইভাবে অখণ্ড রূপে মানুষকে দেখাই সত্যিকারের দেখা।

বর্তমান লেখাগুলিতে রয়েছে একটি শান্ত আত্ম-নিবেদনের সুর। লেখিকাদের নিজের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে গেলেও কোথাও নেই তাঁদের আত্মপ্রচারের অশোভন প্রয়াস। বিরাট পুরুষের সম্পর্কে এসে, তাঁদের সংগে নানা সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে জীবন যে তাঁদের পুণ্য হল, ধন্য হল, সেই কথাই যেন বারবার

লেখার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠছে। বর্তমানে কবি-গুরুকে অবলম্বন করে, তাঁর কত সামান্য পরিচিত ব্যক্তিও শ্রুতিমন্ডনের ছলে নিজেকে জাহি কবুতে উদগ্র হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে কবি এবং আলোচিত ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ আশ্রয়জন হয়েও এই লেখিকাদের আত্মসংযম এবং আত্মপ্রচারকূঠা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

ঠাকুরবাড়ীর অধিবাসীদের একটি বিশেষ সৌভাগ্য এই যে তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীয় প্রতিভার বিকাশে বাটার পরিজনদের প্রভূত আশ্রয় লাভ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিভা বিকাশে পরস্পর সহযোগিতা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। তাঁরা একে অপরের ছিলেন ষপার্থ সমজ্জদার। তারও অনেক পবিচয় “জীবনস্মৃতির” মতো এই লেখাগুলি-তেও মেলে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশুদ্ধ বিশ্লেষণে “বৈতানিকের” “রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালার” প্রকাশ বিশেষ নমনীয়। রবীন্দ্রভাবগঙ্গার ষপাষপ পরিবেশনে এই সংস্থার কুতিস্ব অনুস্মিকরণীয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা-বিশ্লেষণে এবং তদ্বিষয়ক নব নব গ্রন্থ প্রকাশনে এই সংস্থাব প্রয়াসও উস্তরোস্তর বর্ধিত হোক—এই কামনা। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সুলিখিত “গ্রন্থ পরিচয়”টি অত্যন্ত সমুচিত হ’য়েছে। বিশেষ ক’রে লেখিকাদের পরিচয়ও অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। তাঁদের আরো একটু বিস্তৃত পবিচয় পেলে এবং প্রুফ-সংশোধন আরো ক্রটিমুক্ত হলে আবারো ভালো হ’ত। যেমন ৪৫ পৃষ্ঠায় ২য় অনুচ্ছেদে “সৌদামিনী দেবীর পুত্র রূপে সারদা-প্রসাদের জন্ম ১৮৫২এ ছাপা হ’য়েছে। সারদাপ্রসাদ সৌদামিনী দেবীর স্বামী। পুত্র হ’চ্ছেন সত্যপ্রসাদ, এই রকম গর্হিত ভুল এই ধরনের গ্রন্থে বর্জনীয়। ৪৫ পৃষ্ঠায় ৩য় অনুচ্ছেদের শেষেব দিকে লেখা হয়েছে “শ্রেষ্ঠতম” পুরুষ। বছর মধ্যে সেরাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ব্যাকরণের নিয়মামুসারে “তম” ষোগ করা এখানে অপ্ৰয়ো-

জনীয়। আর গ্রন্থের আকারটিও পত্রিকার মতো না ক’বে সাধারণ প্রচলিত গ্রন্থের মতো করলে পাঠকদের ব্যবহারে সুবিধা হত বলে মনে হয়।

যাহোক, রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ প্রচাবে দস্তচিহ্ন শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসুর সসম্পাদনায় এই ধরনের আরো গ্রন্থ আমবা আশা করি। তাঁর এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় জীবনী ও প্রবন্ধ সাহিত্যে একট প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন।

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র বীক্ষা—সম্পাদনা নীলরতন সেন। এশিয়া পাবলিশিং হাউস—কলিকাতা-১২। মূল্য—১২.০০।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর বছরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন রচনার একাধিক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র বীক্ষা তারই অন্ততম। সম্পাদক এই সংকলন-টিকে পূর্বভাগ ও উস্তবভাগে দ্বিখণ্ডিত করেছেন পূর্বভাগে রবীন্দ্রনাথের চম্পাপা রচনা সংকলন মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের লেখা ও বন্ধিম-দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র ধর্মবিভর্কের মূল রচনাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। উস্তবভাগে রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধেব সংকলন।

সম্পাদক শ্রীনীলরতন সেন ষে পরিকল্পনায় এই লেখাগুলি সাজিয়েছেন তার পূর্ণ পরিচয় ‘সম্পাদকের নিবেদনে’ আছে। এই আলোচনা ষ সেই অংশ থেকে উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন ষে প্রত্যেকটি রচনা নির্বাচনের পিছনে সম্পাদক যুক্তি দিয়েছেন, কেন সে বচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। ফলে সংকলনটিব একটা ভাবগত সম্পূর্ণতা লক্ষ্য কবা যাবে।

রবীন্দ্রবিষয়ক বচনায় ষাঁদেব লেখা সংকলিত হয়েছে তাঁরা সকলেই বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এই লেখাগুলি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন জাগে। কোন্ লেখা এই সংকলনের জন্ত লেখা আর কোন্ কোন্ রচনা পুরানো সম্পাদক তা উল্লেখ করেন নি। অণ্চ বহু পূর্বে লেখা একাধিক রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থ পূর্বের জ্ঞেপা

পুনর্মুদ্রণের যোগ্য ক্ষেত্র কিনা বিচার্য। অবশ্য রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বাদীপ পরিচয় দিতে গেলে এই বহুগুণী প্রতিভার নানা বিষয়ে নতুন নতুন লেখা সংগ্রহ করা শক্ত। কিন্তু তবুও নামকরা লেখকদের লেখা দেবার জন্তই যখন পুরানো লেখা ছাপা হয় তখন গ্রন্থের সাংকলনিক কোলীন্স যে কিয়দংশে ধর্য হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এ জাতীয় সংকলন থেকে কেউ প্রত্যাশা করেন না। স্মৃতিবাং রচনাগুলির ব্যষ্টিগত মূল্যের উপরে সমষ্টির মূল্য নির্ভব করে। সে বিচাবে প্রায় সবকটি লেখাই যে অতিশয় মূল্যবান তা রবীন্দ্রসমালোচক পাঠকেরা জানেন।

সংকলনটিব অঙ্গসজ্জা, ছাপা, বাঁধাই মোটামুটি ভালই। তবে নানারকমের কাগজ ব্যবহার আর ছাপার অত্যধিক ভুল প্রকাশকের স্মরণ করে না।

নন্দরাণী চৌধুরী

ছোট্ট রবি—শ্রীমামিনীকান্ত সোম। রীডাস' কর্ণার—কলকাতা-৬। মূল্য—১.৪০ টাকা।

শ্রীমামিনীকান্ত সোমের এই ছোট্ট বইখানি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ধর্মচিন্তা, রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীও বড়দের জন্ত রচিত হয়েছে। কিন্তু ছোট্টদের উপযোগী রবীন্দ্রজীবনী আমাদের দেশে বেশি নেই। যে দু'একখানি আছে ছোট্টরবি বইটি তারই অন্ততম। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল গল্পাকারে বর্ণিত হয়েছে। সন তারিখের ঝামেলা নেই। ছোট্টদের পড়ে শোনাবার পক্ষে বেশ সরস ও সহজ করে লেখা। তবে গ্রন্থের বহিরঙ্গ নিতান্তই জুলপাঠ্য টেক্সটবুকের মতো, আর একটু বড় আয়তনে, উজ্জলতর চিত্র-সমাবেশে শোভিত হলে সুন্দর হতো। তবু আরও ভাল হলে কি হতো সে কথা বাদ দিয়েই বলতে হবে এ গ্রন্থের বহুল প্রকার কাম্য। প্রশান্ত মিত্র

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমকালীন জগৎ

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১২ সালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে ভাষণ কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“মাহুষ যে শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তা’তে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে।”

বিশ্বের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি একান্তভাবে কল্পনা রাজ্যে বাস করার মানি থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান এমনি করে আমাদের জানিয়েছিলেন। জীবনের বিচিত্র প্রবর্তনা ও সমস্যার ডাকে সাড়া দিতে হবে। নইলে মাহুষ পূর্ণতা লাভ করতে পাবে না। দেশকেও তিনি শুধু কল্পনার সামগ্রী কবেন নি। যিনি ভাবতের রূপ বর্ণনা উচ্ছ্বসিত হয়ে গেয়েছেন—‘অগ্নি ভুবনমনমোহিনী’ তিনিই আগাব ভাবতকে যথার্থ ভাবে দেখতে হলে কি ভাবে দেখা উচিত সেটার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—“ভাবতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপর শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণমুখে বীণা বাজাইজেছেন এ কথা ধ্যান করা নেশা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পান। পুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্নীহাবোগীকে লইয়া তাহার পথের জন্ত আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।” (ছাত্রদের প্রতি ভাষণ)

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ মহাকবি দেখেছেন আমাদের গ্রামগুলিতে। “মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামেব মধ্যেই, এইখানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন গ্রহণ কবেন। সেই আসন অনেক কাল প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে সহরের যক্ষপুতীতে। শ্রীকে তাহাব

অঙ্গক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমবা অনেক কাল তুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে স্বাস্থ্য গেল। বিজ্ঞা গেল, আনন্দ গেল। প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজ বন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কথাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর কবিয়া তুলিতেছে।”

বলছেন কবি—বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিষে আমাদের যে দেশ সেই দেশেব মনোভূমিতে রসের যোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসেব উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণ নাশা মরু অগ্রসর হয়ে ভূমায় অজগর সাপেব মতো পাকে পাকে গ্রাস কবতে থাকবে এই গ্রামে গাঁথা দেশকে।” (শিক্ষার বিকীরণ)

তাঁর প্রাণের মাতৃভূমিকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্ত তিনি আমাদের আহ্বান কবেছেন। ১৩১৩ সালের ৪ঠা কাতিক তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি লেখেন—“তোমবা বাঁচাও এই দেশকে। অন্ন দাও, শিক্ষা দাও, ধর্ম দাও।...দেশে যখন কিরে আসবে তখন দেখতে পাবে এখানে কববার জিনিস অনেক আছে কিন্তু করবার পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়, এখানকার হাওয়া আলস্য জডতার বীজে পূর্ণ।..... দেশব্যাপী ক্ষুদ্রতার ভারাক্রমণ অত্যন্ত প্রবল। এখানে সমাজেব মধ্যে উৎসাহের সঞ্চয় নেই—নিজের ভিতর থেকে কল্যাণেব উৎসকে উৎসাবিত কবতে হবে।

এই ক্ষুধার সপ্তরথী বেঠেনেব মধ্যে পড়ে হতাশ হোয়ো না। প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে যখন আশু সকলতার লক্ষণ দেখতে পাবে না তখন যেন নিজের বা বিধাতার উপর রাগ করে হাল ছেড়ে দিও না। মনে এ কথা স্থির বোধো যে, সিদ্ধিই যে একমাত্র লাভ তা নয়, সাধনাও মস্ত লাভ।”

কি কবে আমবা দেশকে ত্রাণ করবো এই দুর্গতি থেকে, আমাদের চবিত্তের কোম গলদ থেকে নিষ্কেষেব মুক্ত করতে হবে তাবও নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তিনি বলছেন—“দেশকে জয় করে নিতে হবে পবেব হাত থেকে নয়, নিজের নৈকর্ম থেকে।” (সত্যোব আহ্বান) তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে শুধু জ্ঞানের বড়াই করে দেশকে বাঁচানো যাবে না। তাঁর কথায়—“কেবলমাত্র নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজেব স্তিমিস নয়। কোনো উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ কবে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।”

আর সেই জ্ঞান উদ্বেগ ও কর্ম সবই নিফল হয়ে যায় যদি মানবপ্রেম হৃদয়ে না থাকে। প্রেমের দ্বারা অল্পপ্রাণিত নয় যে কর্ম সে কর্ম কখনো মানুষেব কল্যাণ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “পক্ষে উপকাব করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই।……প্রীতিব দানে কোনো অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতাব দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত কবা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।” (লোকহিত)

এই দরদহীন দাতাগিবির মনোভাব একান্ত অশ্রদ্ধের। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—“যদি তোমার গ্রামের লোকেরা দেখতে পায়, অন্তরে অনুভব করে তাহলেই ওরাও হৃদয় দিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারবে। কুকুরকে যেমন দূর থেকে হাড় ফেলে দেয় সে রকম যেন না ঘটে। একেবারে বুক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়।”

দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তখন তারা যে চোখে দেখে তার বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন “তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ স্তূপম করবে”—এই ভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।” (গ্রামবাসীদের প্রতি) বলেছেন—“এখানে চালের কল আছে। সেই কলদানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে কবে? তাদের স্তূপ দুঃখের কি হিসেব আছে! প্রতিদিনের পাওনা স্তূপে দিয়ে ভাব কাছে কষে বক্ত স্তূপে কাজ আদায় কবে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, স্তূপও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—মানবত্ব। দয়ামায়, পবম্পরের সহজ আলুকুলা, দরদ—কিছু থাকে না।” (গ্রামবাসীদের প্রতি) তাই একান্ত দরদহীন উপর-ভলার-মানুষদের-পরিচালিত এই-সমাজ-ও-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নেই। এটা ঘটতে বাধ্য কেন না রবীন্দ্রনাথের-কথায় “ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্ততার বাঁচানো যায় না। দয়ার উপব নির্ভর কবার দীনতা আমি দেখতে পারিনে।”

বাই উল্লাসিক দাতাগিবির মনোভাব সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে যদি আমরা মানুষের কল্যাণ সাধনকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করি। মানব-প্রেমের উৎস থেকে যে কর্মের দ্বারা প্রবাহিত হয়নি সে কর্ম ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য, সে কর্মের ফসলে পোকা ধরবেই ধরবে। তাই মানব-প্রেমকে অন্তরেব মধ্যে আগ্রহ করে তারি সুরে কর্মের স্তব বেঁধে নিতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে প্রবন্ধ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কর্মীদের হৃদয়ব করে দেবার জন্তে বলেন—“যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মত করে যা হয় একটা গোঁয়ো ব্যবস্থা কবলেই চলবে। গ্রামেব প্রতি এমন অশ্রদ্ধা যেন আমরা না কবি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর করে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কি পল্লী, কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোকরা থাকুক তাদের ভূত, প্রেত, ওরা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্তে শিক্ষার একটুখানি যে কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষা করা চাই।”

অধিকাংশ কর্মীদের কাছে দেশ হৃদয়-আবেগের বস্তু, ভাবালুতার সামগ্রী থেকে যায়। দেশের মানুষদের জীবন-ধাৰা যে বিচিত্র প্রবাহে বয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বলেই চলে। গ্রামেব ছড়া, গান, পূজো পার্বণ প্রচলিত কিম্বদন্তী আচার প্রভৃতি থেকে গ্রামবাসীদের জীবন-ধারার যে ইতিহাস জ্ঞান যায়, তার সংগে শিক্ষিত সমাজেব কোনো যোগ নেই। সেই ইতিহাস থেকে যে অনেক কিছু জ্ঞানবার ও বোঝবার আছে সেটা শিক্ষিত সমাজের লোকেবা স্বীকাৰই করে না। জ্ঞানের অভাবকে ঢাকা দেয় তাবা সব কিছুকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে। এই কেতাব-দুরন্ত মনোভাব নিয়ে যে দেশের কোনো কল্যাণই কবা সম্ভব নয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুগুণ আগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—“যুবোপের দিকে আমবা চেয়ে আছি আমাদের দেশকে জ্ঞানার জন্ত। তাদের গল্প, নাটক, কাব্য সাহিত্য পড়ে তাদের সমাজ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়। আমাদের দেশে যাবা যা বস্তু ওলাবিবিব আজায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে যে তথ্য-কথিত ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ খুব উপরে উঠেছে তা নয়—তাদের থেকে দূরে সবে গেছে। পাশেব গ্রামেব লোকের আচার, বিচার

বিধিব্যবস্থা জ্ঞানার জন্ত যুরোপীয় পণ্ডিতদের দিকে চেয়ে আছে শিক্ষিত জন। বিরাট দেশ যে সমাজ-বিজ্ঞানের বৃহৎ নিকেতন এ কথা আমাদের চিন্তায় নেই। আজ আমাদের দেশেব ডিগ্রীধারীরা পল্লীব কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্ত অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এই রকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোক আমাদের বিদেশী।” (পল্লীসেবা)

তাই মঞ্চাশ্রমী অতি মুখর দেশাত্মবোধের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সন্দেহ পোষণ করতেন। নবজীবনের উদ্ভব নীবব সাধনার যুক্তিকা থেকে। কোলাহলে ও উত্তেজনায় যদি সব শক্তি ব্যয়ই হয়ে যায় তাহলে সৃষ্টির জন্তে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। স্বদেশীয়গুণে রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর দেশবাসীদের গ্রামের দিকে ও নীচের তলার অগণিত মানুষের দিকে মুখ ফেরাতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রাজ-দরবারে আবেদন-নিবেদনে যে শক্তির আমরা অপব্যয় করছি সেই শক্তি যদি আমাদের ক্ষেতের আগাছা তুলতে আমরা নিয়োগ করি তাহলে দেশের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হবে। এই কথাই তিনি পাবনা কন্ফারেন্সে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। তাঁর কথা সেদিন উপেক্ষিত হয়েছিলো। পাবনা কন্ফারেন্সের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা স্মরণযোগ্য—“পাবনা কন্ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন বাষ্ট্র-নেতাকে বলেছিলুম আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ কবতে হবে। তিনি সে কথাটিকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে আমাদের দেশাত্মবোধীবা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশেব পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশেব মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন নি সেই পাবনা কন্ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা

বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি—শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে—কিন্তু যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয়—সেইখানেই সেই অর্থও আবৃত্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না” (রাশিয়ার চিঠি)

গভীর বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে “দেশের দুঃখ দূর করবার জন্তে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হন, দেশের মানুষের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্যকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস নেই। ইংরেজের অভ্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়বার শক্তিকেই দেশের জন্তে ‘হাতে কলমে’ কাজ বলেন”। (হাতে কলমে)

১৩১৭ সালের ১৭ই পৌষ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রামেব কাজ সম্বন্ধে লিখলেন—“আসল কথা, আমাদের এখনকার কর্তব্য আমাদের দেশের নীচের স্তর থেকে শিক্ষার কাজ আরম্ভ করা—সেই সব সাধারণ লোকদের মধ্যে দল বেঁধে তাহিগকে নিজেদের হিতসাধন ব্যাপারে অভ্যস্ত করা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বক্তৃতা বায়ু উদ্ভাস হয়ে উঠেছে এবং ঘেঁষা হিংসার চেউও উদ্ভাস হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে অবগো রোদন করে কোনো কল নেই।”

রবীন্দ্রনাথ নিজেই পল্লী-সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন এই বক্তৃতা বায়ুতরঙ্গিত শিক্ষিত সমাজের আওতা থেকে সবে গিয়ে। ১৩১৩ সালে তাঁর এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে এই সময়ে তাঁর চিন্তা-ও-কর্মের ধাৰা কোন দিকে বইছিল তার হৃদয় পাই। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—“কিছুদিন হইতে আমি ‘পল্লীসমিতি’ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমাদের পল্লীর patriotisms জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি প্রতি পল্লীর সকল অভাব মোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি।..... আত্মশক্তি চালনা করিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার

জন্ত এই রূপ পল্লীসমিতিতে আমাদের এখন হইতেই হাতে ধড়ি করিতে হইবে।”

কিন্তু এই আত্মশক্তি চালনা কোন পথ ধরে চলবে? গ্রাম্যজীবনের পক্ষি জলাশয়ে নবজীবনের স্রোত কোন দিক থেকে আসবে? চাব—যে প্রণালীতে এত দিন চলে আসছে সেই প্রণালী বজায় রেখে, গ্রাম্য-শিক্ষণগুলি যে নির্মাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে যুগযুগান্ত ধরে সেই প্রণালী ও নির্মাণ-পদ্ধতি অটুট রেখে কি গ্রামের জীবনে সত্যিকার পরিবর্তন আনা সম্ভব? পল্লী-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পল্লীর জীবনকে মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সামগ্রী হিসেবে দেখেন নি। পরিবর্তন আনতেই হবে গ্রামের জীবনে আর সে পরিবর্তনের স্রোতে জীবধারণ প্রণালীর বহু সংস্কার ভেসে যাবে। ওয়া, মাতুলী, বনবিবি, দক্ষিণা রায়—এই সব ভাসিয়ে না দিতে পারলে সত্যি কয়ে কোনো সংস্কার সম্ভব নয় গ্রাম্য জীবনের। যা কিছু পুরাতন তা সবই অপূর্ব ও সেগুলি সবই ভারতব জীবন-নিয়ন্ত্রণ-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক—এই রোম্যান্টিক অজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমকে কখনো কলুষিত করে নি। যেখানে দেশবাসীর অর বস্ত্র-শিক্ষার সমস্তা সমাধানের প্রশ্ন উঠেছে সেখানে তাঁর মন একেবারেই কল্পনাশ্রয়ী কবির মন নয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি এই সব সমস্তার সমাধান কববার জন্তে দেশবাসীদের আহ্বান করেছেন।

তিনি বলছেন—“এ কথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে ফেলে হাত চালিয়ে দেশেব বিপুল দারিদ্র্য কিছুতেই দূর হতে পারে না। মানুষেব জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতো বড়ো কুলিগিরির সাধনা আর নেই।” ১৩১৩ সালে শিলাইদহের চাবীদের মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞানেব সিদ্ধান্তগুলি ছড়িয়ে দেবার উপদেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিভাগেব শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র বায়কে লেখা একটি চিঠিতে

বলেন—“প্রজাদের বাস্তুবাড়ি ক্ষেত্রে আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য; শিমূল, আম্র প্রভৃতি গাছ বেড়ার কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কি রূপ খাত্ত বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে.....কৃষি বিজ্ঞানের উপদেশ মতো চেষ্টা করিবে।”

জমিদারী প্রথা যে চাষীদের উন্নতির অল্পতম বাধা সৃষ্টি করছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো সংশয় ছিলো না। ১৩১৪ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“নিজের কর্মশক্তির উপর নিজে নির্ভর করবার মতো শিক্ষা আমরা বাল্যকাল হতে পাই নাই সেইজন্য আজ এমন পঙ্গু হয়ে আছি—সেইজন্য নিজে কোনো কর্ম না কবে প্রজাদের কাজ থেকে বাজনা আনার করে পৃথিবীর parasite-এর মত জীবন যাপন কবচি, হাতে আব কোনো উপায় নেই—এই জীবিকায় আমার তাই দিক্কার জন্মেছে।” ১৩১৫ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“রথীরা ফিরে এলে তারপরে ওদের কর্মক্ষেত্র ঠিক করে দেবার একটা ব্যবস্থা কবতে হবে। আমাব ইচ্ছা এখানে প্রজাদের মধ্যে থেকে ও কাজ করে। কারণ এই প্রজারাই ওকে শিক্ষার খরচ জুগিয়েছে, সেই ক্ষণ ওর শোধ করে দেওয়া কর্তব্য। আমাব খুব ইচ্ছা, এদের সঙ্গে রথী co-operative systemএ কাজ কবে। প্রজাবা তাদের জমি এক করে মিলিয়ে রথীকে নিয়ে যদি বড় রকম চাষে প্রবৃত্ত হয় তো আমি খুব খুসি হই। এরা প্রতি বিষায় গড়-পড়তায় যত লাভ করে যদি প্রতি বৎসর আমরা লাভ হোক লোকসান হোক সেই টাকা এদের নিশ্চিত বেঁধে দিই এবং তাব উপরে যে বছরে লাভ হবে তার উপযুক্ত

অংশ তাদের দিই তাহলে নিশ্চয়ই এরা জমি দিতে কৃত্তিত হবে না। যে বছর গড়পড়তার চেয়েও কম উৎপন্ন হবে সে বারে ক্ষতিপূরণ কবতে বেশী লোকসান হবে না—কারণ, তাদের labour ত জমির সঙ্গেই এই সর্তে পাওয়া যাবে—সে জন্তে তো আর বেশী দিতে হবে না—তাদের দিয়ে তাদের জমি চাষ করার কেবল তাদের সুবিধে এই হবে যে দুর্বৎসরের জন্তে তাদের ভাবতে হবে না এবং হাল গরু বীজ শোবাকীর জন্তে মহাজনের দ্বারে তাদের দাঁড়াতে হবে না। জমিদারের বাজনাও কম্পানি থেকে দেওয়া হবে—মামলা মকদ্দমা অত্যাচার উপদ্রব কিছুই থাকবে না।”

আমেরিকায় কৃষি-বিজ্ঞান-অধ্যয়ন-রত রবীন্দ্রনাথকে ১৩১৫ সালের ৭ই আষাঢ় তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্র নাথ লেখেন—“দেশে ফেরবার আগে একবার তোকে আমেরিকায় southern statesগুলো ঘরে আসতে হবে। তারপরে intensive culture study করবার জন্তে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও পর্যবেক্ষণ কবে আসতে হবে। আমেরিকাতে জমির অভাব নেই—সেখানে বড় বড় ক্ষেত্রে বড় রকমের চাষ হয়—আমাদের দেশে অতবড় ক্ষেত্রে কোনো এক জায়গায় এক সংলগ্ন পাওয়া অসম্ভব। অতএব এখানে চাষাদের শিক্ষা দিতে গেলে ছোট ছোট ভূমিখণ্ড কি করলে দুই একজনকে চেষ্টাও যথার্থ সম্ভব অধিক ফসল কলাতে পারে তারই পরীক্ষা কবা চাই। যত্নতন্ত্রও খুব সাদা সিধে রকমের না হলে আমাদের চাষাদের কাজে লাগবে না। তবে চাষারা অনেকে সমবেত হয়ে যদি কাজ করতে পারে তাহলেই নানা হিসাবে ভালো হয় কিন্তু আমাদের দেশের হাওয়ায় কি চাষা কি ভদ্রলোক কোনোমতে সমবেত হতে জানে না।..... ইতিমধ্যে আমি আমাদের জমিদারীকে পাঁচ ছ’টা মণ্ডলীতে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলীতে পল্লীসমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা কবচি।”

রবীন্দ্রনাথের লেখা যে তিনটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলুম সেগুলি সবই ছাপা, সাতাশ বৎসর

আগে লেখা। তাই, নতুন প্রণালীতে ও নতুন চিন্তা-ধারার ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গঠনের সমস্ত ধারণার উৎস ১৯১৭ সালের পরবর্তী কালের রাশিয়ার চিন্তাধারায় যারা খুঁজতে ব্যস্ত ও সেই রাশিয়া সমকালীন চিন্তাধারার উৎস প্রমাণ করতে উদগ্রীব, সেই রাশিয়-বরদারদের নিরাশ হতে হবে। ষাট সত্তর বছর আগের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামের উন্নতি সাধনের সমস্তা গভীর ভাবে ভেবেছিলেন ও হাতে কলমে সেই সমস্তার সমাধানের কাজে লেগেছিলেন। কো-অপারেটিভ কৃষি-ব্যবস্থার কথা তিনি ভেবেছিলেন এবং গ্রামে শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ধরনের হবে সে নিয়ে তিনি যে শুধু আলোচনা করেছিলেন তা নয়, শিলাইদহে চাষীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্তে শিক্ষায়তন পত্তন করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের কুটার-শিল্প সুরু করিয়ে দিয়েছিলেন এলাকায় বিশেষ অবস্থার সন্ধানে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে। কর্মী রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কর্মের মধ্যে ভাবালু আবিষ্কার চিরু মাত্র নেই। তথ্য নিষ্ঠা, বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সমস্তার বিচার ও স্বল্প পরিদর্শন মধ্যে নীবে তব পবীক্ষা—এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের কর্ম-রীতি।

তার জমিদারীতে ‘সাধারণ ফণ্ড’ নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফণ্ডের সমস্ত টাকাটা জমিদার দিতেন কিন্তু এই ফণ্ড পরিচালনা করতেন চাষীরা। এইভাবে চাষীদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগিয়ে, তাদের কর্ম-শক্তির স্বাস্থ্য ঘুচিয়ে, গ্রামবাসীদের মনে খাঁটি পল্লী-প্রীতি-উদ্ভূত কবে গ্রাম-উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব বহন কববার উপযুক্ত করে তাদের তৈরী করে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একমাত্র এই উপায়েই গ্রামা-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পাবে এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের মত। নিজে জমিদার-পরিবার তুচ্ছ হলেও জমিদারী পেশার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের যে কি রকম বিতৃষ্ণা ছিলো তা আগেই দেখিয়েছি। আরো দু-একটি নজীর পেশ করছি এই

প্রসঙ্গে। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা সঙ্ক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেন—“স্বেচ্ছাচার শক্তিকে কেবলি বাধা হীন করিতে থাকা, আর ভাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অগ্নি বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করিবে।”

প্রথম চৌধুরী লিখিত ‘রায়তের কথা’ বইটির ভূমিকায় জমিদার জীবনটিকে সঙ্ক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—“জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পবাস্রিত জীব। যারা বীর্ধেব দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমাদের আমাদেব মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গোববও নেই।”

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারী দ্বেষের ভার গুস্ত করেছিলেন। গ্রাম্যজীবনের নানান দিক খুঁটিয়ে দেখবাব সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে। মাহুঘের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের প্রতি জমিদার ও জমিদারের আমলাদের পশুবৎ আচরণ সঙ্ক্ষে খুবই গুয়াকিবহাল ছিলেন। এ সঙ্ক্ষে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর জমিদারীর কর্মচারীদের সেটা উদ্ধৃত কবি—“তারিণী চলে গেলে, তিনি ম্যানেজারের সামনেই আমিনকে উপদেশ দিলেন—“প্রজাদের মান দ্বিষ্টেই জমিদারের মান। দেখো, নিজের ঘোষে, কোনো কারণেই যেন প্রজার প্রতি অসৌজন্ত প্রকাশ কোর না।” (জমিদার রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা দিক সঙ্ক্ষে যিনি খুবই গুয়াকিবহাল ছিলেন সেই প্রথম চৌধুরী তাই লিখেছিলেন—“রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্তে আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি। কেন না তাঁর সেবেস্তায় আমিও কিছুদিন আমাদের কাজ

করেছি।...রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেমন, জমিদার হিসাবেও তেমনি unique।” (রায়তের কথা)

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদেব কাছে দেশের কাজ যখন শুধু শহরে বসে থিওরি আওড়ানোর নামাস্তর ছিলো, তখন রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ সালে তাঁদের স্বরণ করিয়ে দিলেন যে, কেবল মাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।.....আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করছি।” (পল্লীব উন্নতি)

আর ‘রসালসজ্জড়’-র সর্বশেষে বীধন থেকে দেশবাসীদের মুক্তিসাধন করাবার জন্তে ১৩২১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—“কর্মের মন্বন দণ্ডেব তাড়নায় তবেই আমাদের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব, তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। কাজে লাগলেই তর্ক-কীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাবে।”

আমাদের দেশেব সমস্তাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিলো এবং কি ভাবে সেই সব সমস্তাব সমাধান করতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি। এখন সেই আলোচনার পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া যাক, দেশের সীমানাকে মিলিয়ে দেওয়া যাক পৃথিবীর সীমানার সঙ্গে। সমকালীন জগতের স্বরূপ ও তার সমস্তাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি ভেবেছেন ও বলেছেন সে দিকে নজর দেওয়া যাক।

সাদা দেখে নেওয়ার চোখে সমকালীন সমাজেব কিরূপ ধরা পড়ছে? চোখে পড়ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের নিষ্ঠুর উদাসীনতা, রাক্ষসী শোলুপতার কাছে মানুষ-বলি আর ধনপতিদের মূর্ত্য-বাঁধা সমাজ-ও-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—“আজকাল চলছে যা কিছু সব ধনপতির হাতেই, এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটা বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার। তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে ঠিক জায়গায় বাজে না বৃকে। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন, সামনে পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর-মূর্তি।” (কালের যাত্রা)

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের সমাজপতিদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এরা “যন্ত্র-বেদীর উপর তুষা-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা কববে। মানুষ-বলি চায়।”

ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ উৎপাদনের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আব এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অগ্নে প্রাণধারণ করে। তাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অম্ল পিঠে আলো, এ সেই রকম। এক দিকে দৈহ্য মানুষকে পঙ্গু করেছে, অম্ল দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনেব প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অগ্নির উৎপাদন হয় পল্লীতে আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত। স্বভাবত সেখানেই আরাম, আবোগ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্য দান করে। পল্লীতে সেই ভোগেব উচ্ছিন্নতা যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তাব বাসা বেশী দিন টিকতেই পারে না।”

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মুখের উপর থেকে মেকী সভ্যতার চিকন ঘোঁটাটি টেনে তুলে দিয়ে কবি বলেছেন—“মুনাকার লোভে, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের সত্য আঙ্গ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনোই হয় নি।” (বাকী)

জগৎ জোড়া মানুষের দুঃখের যে রূপ তাঁর মনকে পীড়িত করেছে সে সম্বন্ধে বলছেন—“যে দুঃখের কথাটা বলছি এই জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, আজ মূনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্তা বাহ্যগ্রস্ত। এই জটিল মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবচাব কবা, তাকে বন্ধন কবা, এতো সহজ হল।..... মানুষের ফুল-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপ-সে-যাওয়া স্বপ্ন পড়েছে চাপা। সর্বভূক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আব কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।” (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী)

এই মূনাফা-লোভী সর্বভূক পেটুকতা মানুষ সম্বন্ধে একান্ত ভাবে দবদহীন না হতে পারলে মানুষকে শুধু মূনাফা-তৈবীর যন্ত্র হিসেবে দেখা কি কখনো সম্ভব হোতে পারতো? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—“লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার ধলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বডো বডো হিসাবেব খাতা ছাড়া তাব আর কিছু নেই, তাব সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গডখাই হবে তাব মধ্যে সে বসে আছে। সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়!” (গ্রামবাসীদের প্রতি)

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মোডলবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছে, লক্ষ্য তাদের মূনাফা লোটা সেটা স্বৈচ্ছাচারতান্ত্রিক উপায়েই হোক আব তথা-কথিত গণতান্ত্রিক উপায়েই হোক। গণতন্ত্রের মোহ-বাষ্প দিবে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে এই বীভৎস লুটতরাঙ্গ আরো স্তনিপুণ ভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চালানো চলে। চলছেও তাই পৃথিবী জুড়ে। তার ফলটা কি হচ্ছে? ফলটা হচ্ছে মানব-সমাজে বৈপরীত্যের ক্রম বর্ধমান ক্ষৌতি—একদিকে কতিপয়ের আরাম, সুখস্বচ্ছন্দ, কুৎসিত ভোগ ও বিশাস, অন্যদিকে কোটি কোটি লোকের ভাগ্যে অর্ধাহার, অনাহার, স্বাস্থ্যহীন অস্তিত্ব। কিন্তু মানুষের এই দুর্ভোগের কারণ প্রাকৃতিক নয়,

সামাজিক। মূনাফা-ধর্মীদেব হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র থাকায় তারা কৃষিজাত শস্ত ও কাবখান-জাত সব দ্রব্য খুসি গতো আটক করে রেখেছে। রাজ্যেব শস্যের ও দ্রব্যের সংখ্যা কমাচ্ছে ও বাড়াচ্ছে মূনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে।

যে ফসল ও কারখানা-জাত-পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে সারা পৃথিবীতে সেটা যদি ঠিক ভাবে বন্টন করা হোতো মানুষের কল্যাণের দিকে নজর বেপে তাহলে পৃথিবীর কোনো দেশে মানুষ অনাহারে কষ্ট পেতো না কিংবা মরতো না। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে ভাবে প্রকৃতির নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করেছে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে স্ববশে এনে কাজে লাগিয়েছে সেই বিজ্ঞান-জ্ঞান লব্ধ শক্তি যদি পকেট-ধর্মী মূনাফাবাজ সমাজপতিদের হাতে না থেকে মানব কল্যাণরতী মানুষদের হাতে থাকতো, তাহলে কি অম্মরকমই না হোতো এই পৃথিবীর চেহারা! দৈহিক তাড়নার দৈনন্দিন কশাঘাত থেকে মানুষ মুক্ত হোতো, মানুষের আত্মিক-সৃষ্টির শ্রোতে সব গ্লানি ধুয়ে যেতো পৃথিবী থেকে, পৃথিবীর মুখ এতো পাত্তর ও বিষন্ন থাকতো না, আনন্দ-উচ্ছল হোতো আমাদের এই পৃথিবী। মানুষের দুর্দশার এই সামাজিক কারণ দর্শাতে গিয়ে আমরা কতো কথাই না বলে থাকি! রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথা দিয়ে মানুষের উপবাসের কারণ যে সামাজিক সেটা কি চমৎকার করেই না আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—“ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেছে উপবাস।” (কালের যাত্রা)

প্রাকৃতিক কারণে রিক্ত-শস্ত ফসলের ক্ষেতে উপবাস বাসা বাঁধেনি এ যুগে, মানব-সভ্যতাকে ধিককার দিয়ে সে বাসা বেঁধেছে ভরা ফসলের ক্ষেতে। তাই এই মূনাফা-ধর্মী সমাজ-ও-রাষ্ট্রপতিদের অত্যাচারের ফলে পৃথিবী জুড়ে সংঘাত সূত্র হয়ে গেছে ভোগ-পরিভূষ কতিপয়ের সঙ্গে কোটি কোটি নিরন্ন মানুষদের—

“ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্য-নামিক পাতালে ষেপায় জমেছে লুটেব ধন।”
বলছেন কবি—

প্রতাপের ভোজে আপনাবে যাবা
বলি কবেছিলো দান,
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ,
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তাক্ষ দশনে টানা-ছেঁড়া তারি
দিকে দিকে ঘায় ঘোপে,
রক্ত-পঙ্কে ধরাব অঙ্ক লেপে।”

যারা এই নরমাংসাশীদের কাড়াকাড়িকে ইচ্ছাকৃত
ভাবে এড়িয়ে গিয়ে শাস্তির বাণীর গিষ্টি দিয়ে এই
বীভৎসতাকে ঢাকতে চায় অগ্নিজ্বালা বিদ্রোপে সেই
নকল ধার্মিকদের দণ্ড কবে ববীন্দ্রনাথ বলছেন—

“ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীষ
কারা চলে গীর্জাঘ
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়,
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওবা ভীত প্রার্থনা-যবে
শাস্তি আনিবে ভবে!
স্তুপাকার লোভ বক্ষে রাখিয়া জমা,

কেবল শাস্ত্র মন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা।”
বিধাতা এই ফাঁকা-ভক্তির অপমান কখনো সহিবেন
না। কল্যাণ শক্তির তেজে ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
কবে নতুন আলোকে নতুন দেশে নতুন জীবন
বিকশিত হবে। মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন যে
বিচারক তাঁর কাছে শক্তি-ভিক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ
বজ্রবাণীর আশীর্বাদ চেয়েছেন যাতে করে তিনি এই
শিশুঘাতী নরঘাতী বীভৎসতাব উপব দিককার হান্ধে
পাবেন। কিন্তু যতো অন্ধকারই আজ আমাদের
জীবনকে ঘিরে থাকুক না কেন, অন্ধকার বিলীন হবেই
নতুন জীবনের আলোকে; এ যুগের এই পঙ্কিলতা

ধুয়ে দেবে নবজীবনের দুর্বীর স্রোত—শত হানাহানি
ও বীভৎসতায় মধ্যেও ববীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস অগ্নান
রেখেছিলেন তাঁর অন্তরে। মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের
উপব তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিলো অন্তহীন। আধুনিক
কাল তার ক্ষণিকের কালো আবরণ দিয়ে মানুষের
স্বার্থ স্বরূপকে যতোই ঢাকবার চেষ্টা করুক না কেন,
মহাকবির কাল-জয়ী দৃষ্টি সেই আবরণ সবিসে মানুষের
মহান সত্তাকে সহজেই দেখেছিল। মানুষের সহজ
মহত্ব সম্পূর্ণ আত্মাশীল মহাকবি তাই আমাদের
আশ্বাস দিয়ে বলেন—এই প্রহসনের মধ্য অঙ্কে এই
দুই স্বপনের শেষ হবে। শুধু পড়ে থাকবে পুড়ে যাওয়া
মশালের ছাই আব বাজবে কানে অদৃষ্টের অট্টহাসি।

বলেন তিনি—নিজের রক্ত শত ধাবায় পান কবে
এ কুৎসিত দানবী লীলা যখন শেষ হবে, এ পাপ-যুগেব
যখন অবসান হবে, তখন মানুষ আবাব নির্মল হয়ে
সুচি হয়ে তপস্বীবে বেশে নতুন সৃষ্টিব ধ্যানে বসবে।
কামানব শব্দ সেই নতুন যুগের আগমনী ঘোষণা
করবে।

আমাদের এই যুগ তাই বোঝা-পড়া কববাব যুগ,
যাচাই কবাব যুগ। যে ঝড় উঠেছে বিশ্বের আকাশে
বিশ্ব-মানবের হৃদয় থেকে, সে ঝড় কঠিন ভাবে
আমাদের যাচাই করবে। এই যুগান্তিকা বাটিকা
পালা-বদলেব বাবতা নিয়ে এসেছে—

দামামা ঐ বাজ

দিন বদলেব পালা এলো।

বোড়ো যুগের মাঝে।

শেষ পবীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে,

জীর্ণ-যুগেব সঞ্চয়েতে কি যাবে কি রইবে।

পালিশ-কবা জীর্ণতাকে চিন্তে হবে আজি,

দামামা আজ তাই উঠেছে বাজি।

সেই আগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলছেন—

“কী হবে মস্তরে! কালের পথ হয়েছে দুর্গম। কোথাও
উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও গভীর গর্ত। করতে হবে
সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।” (কালের যাত্রা)

রবীন্দ্রনাথ 'লড়াইয়ের মূল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৩২১ সালের (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) পৌষ মাসের 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্য-বিস্তারপরী রাষ্ট্রগুলি কেমন করে এশিয়ায় ও আফ্রিকাতে তাদের স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করবার জন্তে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছে সেটা রবীন্দ্রনাথ বিশদ ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেন। সেই প্রবন্ধেই ভবিষ্যতের ইংগিত দিখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—“ইহার পবে আর একটা লড়াই সামনে বহিল, সে বৈশ্ব শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মজুব পালা শেষ হইয়া নূতন মনুষ্যের পড়িবে।”

রাশিয়া থেকে ধাব-করা চিন্তা ও কথা এ নব, কেন না ১৯১৭ সালের রুশীষ বিপ্লবের বছর চাবেক আগে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই চিন্তাটাই পববর্তী কালের রচনা 'কালের যাত্রা' নাটিকাটির মূল সূত্র। এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে এ যুগে কালের রথের রশিগাছি রাজ্যের হাতে নয়, পুরোহিত কিম্বা ধনপতি, তাদের হাতেও নয়। এদের তাকে রথের রশি সাজা দেয় না। এদের সাধ্য নেই এই রশি তুলে কালের রথকে টেনে নিয়ে চলবার। কিন্তু যেই সর্দারপাড়া থেকে সর্দাররা এসে সেই রশিতে হাত লাগালো অমনি সেই অনড় রশি কঁপে উঠলো, তাদেরই টানে কালের রথ জীবনের বাজপথ দিয়ে এগিয়ে চললো। এ যুগে কালের রথের রশি খেটে খাওয়া মানুষের হাত, তাদের ভাবেই রশি সাজা দেয়, তাদেরই শক্তিকে কালের রথ চলে।

চললো তে কালের রথ, রথের রশি তে তুলে নিয়েছে হাতে খেটে খাওয়া মানুষের দল, কিন্তু সে রথ ধাম্বে কোন ঠিকানায় গিবে ? এতো কল্লনা-জগতের নিকর-দেব-বান্ধা নয়, এযে মানুষের পথ-চলাকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্তে যাত্রা শুরু করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যটি কি ? “করতে হবে সব সমান”

—রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনাগত ভবিষ্যতের সেই লক্ষ্যের কথা আগেই বলেছি।

এবারে তাঁরই কথা উদ্ধৃত করে তাঁর ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে ধরে দেওয়া যাক ! ১৮৯৩ সালে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পারবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাতেই এর কোনো পথ নেই তারা ভারি কঠিন কথা বলে।” (ছিন্নপত্র)

দেখা যাচ্ছে যে একাত্তর বৎসর আগে যুবক রবীন্দ্রনাথকে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র ও অর্ধাশন, দুঃখ দিয়েছে ও এই অসহনীয় অবস্থাকে যারা সনাতন বিধি বলে জাহির করছে ও কায়ম রাখবার চেষ্টা করছে তাদের রবীন্দ্রনাথ মোশায়েম ভাষায় কড়া মিলের লোক বলে অভিহিত করেছেন।

এবারে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লেখা আর একটি চিঠি দেখা যাক। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলিকে দেখলে আমার ভারি মায়াকরে। এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিরুপায়। মোশালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধন বিভাগ কবে দেখ, সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।” (ছিন্নপত্র)

নভেম্বর বিপ্লবের একুশ বছর আগে ধন-বিভাগের মোশালিষ্ট নীতি সম্বন্ধে—রবীন্দ্রনাথ যে ওয়াকিবহাল ছিলেন তা তাঁর চিঠির এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট। ধন-বিভাগ যদি নিতান্তই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান নিষ্ঠুর বিধান—এই মন্তব্য তিনি করেছেন। এ থেকে এও স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের মনের টান কোন দিকে ছিলো। নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক অসমতা উপব প্রতিষ্ঠিত এই লোভ-পঙ্কিল হিংস্র সমাজ-ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো অন্তরের স্বীকৃতি দেন নি।

এই বৈষম্যকে রক্ষা করবার জন্তে রাষ্ট্রের ও সমাজের মোড়লদের কথায় কথায় আইন ও শৃঙ্খলার দোঁহাই দেওয়ার রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে “ল অ্যাণ্ড অর্ডার বন্ধা হচ্ছে দারোয়ানিতন্ত্র, পাশো-য়ানের পালা; সিম্প্যাথি অ্যাণ্ড রেস্পেক্ট হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষ্যের নীতি” (পশ্চিম ষাট্রির ডায়ারী)

মূনাফা-ধর্মীদের এই দারোয়ানিতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমতাধর্মী সোশালিজমের ধর্মতন্ত্রে মানুষ্যকে পৌঁছেতেই হবে। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ।

কিন্তু এই মুক্তি-সাধনার পথে চলবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য উপদেশটি, এই সতর্ক-বাণী সর্বদা মনে রাখতে হবে, যে “নূতন কালের প্রয়োজনটি তার নিজের মুখের কথায় ও আবেদন শুনে বিচার করা চলে না কাবণ প্রয়োজনটি অস্বনিহিত। আশু উত্তেজনা ও আকস্মিক মোহে সে তার যথার্থ প্রয়োজনের উটো কথাও বলতে পারে। হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা আগাছা কসলের ক্ষেতের প্রতিবাদ করতে পারে।”

একটি বিশেষ কালের দাবী যাদের মুখ থেকে সাধারণত ধ্বনিত হয় তাদের না আছে মানব-ইতিহাসের গতির ধারণা কিম্বা সেই গতির স্বত্রের

জ্ঞান, তাদের না আছে ইতিহাস-সচেতনতা কিম্বা মানব-সমাজের গতি-নিধারিত উদ্দেশ্যের ধারণা। তাই একটি বিশেষ কালের চারণগিরি সাধারণত যে সব মানুষ্যেরা করে থাকে তাদের দ্বারা উচ্চ-ঘোষিত কালের দাবী যে কালের যথার্থ দাবী সেম্বন্ধে সন্দেহ থাকবাব্যেই কারণ আছে। কালের দাবী কালের অন্তর্বে নিহিত, তাই সে দাবী তিনিই বুঝতে পারেন ও সকলের কাছে ধরে দিতে পারেন যিনি ইতিহাস-চেতনাসম্পন্ন ও অস্বদৃষ্টির অধিকারী, যিনি মানব-প্রেমিক, মানুষ্যকে যিনি রাজনীতির পাশা-খেলার খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন না, যার দৃষ্টি আদর্শ-নিষ্ঠার দ্বারা শুদ্ধীকৃত ও আত্মরতির কলুষ মুক্ত এবং যিনি উত্তেজনা ও মোহ দুই-ই বর্জন করে তথ্যের বিচার করেন ও সত্যের সন্ধানে অবিচলিত থাকেন।

তাই স্বার্থসিদ্ধির মানুষ্যের অসংযত চীৎকারে যে দাবীগুলি সচরাচর কালের দাবী বলে ঘোষিত হচ্ছে, চীৎকারে অভিভূত কিম্বা আতঙ্কিত হয়ে সেগুলি যথার্থতা নির্বিচারে গ্রহণ করলে মানব-সমাজের বিপদ ঘটতে পারে কেন না “হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা আগাছা কসলেব প্রতিবাদ করতে পারে।”

756.3
022/1
Vis no. 4



রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ॥ ৩য় বর্ষ । ৪র্থ সংখ্যা ॥
দীনবন্ধু এন্ড্রুজ স্মরণে ॥

স্মরণ

কবিতাগচ্ছ—সি. এফ. এন্ড্রুজ	...	...	অনুবাদঃ সোমেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার দাস, রণেন্দ্রনাথ দেব, কৃষ্ণ ধর, অসিত ভট্টাচার্য	...	...	১৫৭
প্রিয়তম গুরুদেব (পত্নাবলী)	...	...	অনুবাদ—মঞ্জুলা বসু	...	...	১৬৩
দীনবন্ধু এন্ড্রুজ	...	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	১৬৮
গুরুদেব—সি. এফ. এন্ড্রুজ	...	...	অনুবাদ—শচীনন্দন সিংহ	...	...	১৭২
শেষ বাণী	...	...	সি. এফ. এন্ড্রুজ	...	...	১৭৬
দীনবন্ধু স্মরণে	...	...	মহাত্মা গান্ধী	...	...	১৭৭
চিরপথিক এন্ড্রুজ—রোমাঁ রলাঁ	...	...	ইন্দ্রাণী রায়	...	...	১৭৮
C. F. A,	...	...	গবুদয়াল মল্লিক	...	...	১৮৬
চালস ফ্রীয়ার এন্ড্রুজ	...	...	নিশিকান্ত সেন	...	...	১৮৭
বিশ্বভারতী ও সি. এফ. এন্ড্রুজ	...	...	সুধাকান্ত রায় চৌধুরী	...	...	১৯৩
দীনবন্ধু চালস ফ্রীয়ার এন্ড্রুজ	...	...	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৯৭
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বেতার ভাষণ	...	...	...	...	...	২০০
একটি চিঠি	...	...	অমিয় চক্রবর্তী	...	...	২০০
শান্তিনিকেতন পত্রিকাঃ এন্ড্রুজ প্রসঙ্গ	...	...	সংকলক—সোমেন্দ্রনাথ বসু, স্বগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	২০২
অভ্যর্থনা	...	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	২০৬
পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরেঃ চালস ফ্রীয়ার এন্ড্রুজ	...	...	অনুবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	২০৭
C. F. Andrews from Viswabharati News	...	...	সংকলক—সোমেন্দ্রনাথ বসু	...	...	২০৮

সম্পাদক ॥ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহযোগী সম্পাদক ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু

সকল স্বীকৃতি

এংড্রুজ সাহেবের চিঠিগুলা দিচ্ছেন শ্রীমতী
নন্দিতা কৃপালনী।

বিশ্বভারতী কৰ্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ও
এংড্রুজ সম্পর্কে ভাষণটি ছাপার অনুমতি দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবন্ধাগের সৌজন্যে বিশ্বভারতী
নিউজের এংড্রুজ-সংবাদ অংশ সংকলন করা গেছে।

রবীন্দ্রসদনের কৰ্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন পত্রিকা
ফাইল দেখতে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতন পত্রিকা
এংড্রুজ-সংবাদ-অংশ তাঁদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্বর্গীয় নিশিকান্ত সেনের রচনাটি প্রায় দু বছর
পূর্বে আমাদের সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন দিল্লী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন সেন।

লেখকের জীবিতকালে লেখাটি প্রকাশ করতে না পারার

দুঃখ আমরা গভীরভাবে অনুভব করছি।

এংড্রুজ সাহেব ও রবীন্দ্রনাথ ও এংড্রুজ সাহেবের

ছবি দুটি আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত। রবীন্দ্র-
নাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং এংড্রুজ সাহেবের ছবিটি
তুলেছেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

গুণ্যস্মৃতি

১৯১১ হইতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল লেখিকা অবিরত রবীন্দ্রনাথের স্নেহসান্নিধ্য লাভ
করিয়াছেন, শান্তিনিকেতনে বহুদিন তাঁহার প্রতিবেশিনীও ছিলেন। এই সময়ে রক্ষিত দিনলিপি
সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরিবেশের যে চিত্র রচনা করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রজীবনী ও
রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার উপকরণরূপে যেমন মূল্যবান, হাস্যপরিহাসমধুর রবীন্দ্রসংলাপ-সংগ্রহরূপেও
তেমনি চিত্তাকর্ষক। প্রসঙ্গতঃ সেকালের শান্তিনিকেতন-আশ্রমজীবনের স্নিগ্ধমধুর একটি অন্তরঙ্গ
আলেখ্যও এই গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থেবর্ণিত রবীন্দ্র-স্বহৃদ্বর্গের কয়েকখানি ছল্লভ প্রতিলিপি আলোক চিত্রে
সমৃদ্ধ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদ-চিত্রে শোভিত।

মূল্য দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

জিঙ্কাসা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যান্ডিনিউ কলিকাতা—২৩

৩০কলেজ রো কলিকাতা—২



রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ॥
দীনবন্ধু এন্ড্রুজ স্মরণে ॥
৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥

ক বি তা গু চ্ছ

চার্লস ফ্রান্সিস এন্ড্রুজ

রবীন্দ্রনাথকে

॥ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ॥

ওগো মোর প্রিয়তম, সমুদ্রে উত্তাল যত ঢেউ
চঞ্চল, উন্মত্ত, আর এই মোর অশান্ত হৃদয়,
আনন্দ আবেগে জেগে সুস্বাগত জানায় তোমাকে
তুমি ফিরে চলে গেলে তারপর ব্যথা ক্লান্ত হয়।

যদি তুমি দূরে যাও ফিরে-যাওয়া-তরঙ্গের গান
উপসাগরের বকে ধ্বনি তোলে, দূরতর দেশে;
আকাশে সর্বাঙ্গ জুড়ে করুণ কামার রোল ওঠে
আমার অর্ধেক প্রাণ অশান্তির বোঝা বসে শেষে।

কিন্তু তোমায় যদি ডাকি, কিংবা আসে তোমা হতে
প্রিয় বাণী; অকস্মাৎ উদ্‌বাহু তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে,
বহুবর্ণ-হাস্যচ্ছটা-জলস্রোত আবেগে স্পন্দিত—
পরম আনন্দ গান প্রবাহে প্রবাহে ওঠে ভেসে।

জলস্রোতে উদ্‌বাহুগে, বন্ধু মোর, যদি এই গতি
গভীর গভীরে তার শান্ত প্রেম পূর্ণ বেগবতী ॥

—সোমেন্দ্রনাথ বসু

সৃজন করেছে তুমি, হে রবীন্দ্র, নব সুরলোক;
তোমার 'পরেই পুণ্য ঋষিদের উত্তরাধিকার;
বহু দূরপ্রান্ত থেকে পাঠাই এ প্রীতি উপচার
যাদের বাণীর স্পর্শে মানবের হৃদয় অশোক
সেই অমরের মাঝে জ্যোতির্ময়, তব জন্ম হোক।
রচনা করেছে তুমি রঙ্গভূমি ছন্দের লীলার
কী মহিম, দ্ব্যতিময়ী; পবিত্র শিখরগুলি তার
উঠেছে অসীম উর্ধ্ব ভেদ করি কুয়াশা নির্মোহ।
যুগে যুগে আসে এক দেবতা প্রেরিত পুণ্যপ্রাণ
পরিপূর্ণ সংগীত-সুধায়, দোলে যার স্পর্শ লেগে
অযুত নিষদত কোটি মানুষের মন, ভরে প্রাণ বেগে
শুদ্ধ যার ইশারায়। যুগ আসে, যুগ অবসান
বাণীহীন, অবশেষে একদিন নিজে আসে গান
সেই শিল্পী, সেদিন সমস্ত মন ওঠে দ্রুত জেগে
গরিমায়, সে যে বিজয়ের দিন, সুরের আবেগে
সেদিন সমস্ত জাতি পায় তার আশ্বাস সন্ধান।
তেমনই প্রেরিত তুমি, তোমার জ্ঞাতির মাঝখানে
তেমনই তোমার প্রাণ নবজন্ম দিল পুনর্বীর
তোমার সাধের মাতৃভূমে। বরেন্দ্রে সংগীত রসধার
প্রশান্ত বর্ষার মত, তাপদম্বা ধরিত্রীর প্রাণে
গ্রীষ্মক্রিষ্ট, শৃঙ্খল কণ্ঠ তুষিত চিত্তের গানে গানে
তৃপ্ত করে। যাদুকরী ঐ তব সুরের ঝংকার
হৃদয়ে হৃদয়ে তোলে প্রতিধ্বনি। বিপদ, অঁধার
দূরে যায়; আনন্দের, উল্লাসের ধ্বনি বয়ে আনে ॥

—শিশিরকুমার দাস

মাঝরাতে চাঁদ-গলা ঝিলে
 জল পতনের শব্দ যেমন নরম, যেমন শীতল,
 ধীরে ধীরে কানে এসে বাজে, মোহ-বিস্তারিত,
 আমার হৃদয় তেমনি বন্দী—কুহকিত—
 গীতাঞ্জলি পাঠে।
 তবু সেই শব্দ চেয়ে আরও নিবিড় শব্দ কিছু,
 নিখর স্তম্ভতা এসে হৃদয় ছেয়েছে—
 ‘জুতো খোলো’, কানে কানে বলে গেল কেউ,
 ‘এসো এই দেবগৃহে, দ্যাখো এইখানে
 তুমি ও দেবতা মৃখোমৃখি, জেনে রেখো
 প্রেম তাঁর বিশ্ব জুড়ে তরঙ্গিত।
 প্রেম আছে মর্ত্যব্যাপী আলোব উল্লাসে,
 প্রেম আছে সূর্যমুকুরিত তৃদলে,
 প্রেম নবজাতকের হাস্যময় অবোধ অননে,
 প্রেম রয় তারাকীর্ণ অসীম গগনে,—
 যে-প্রেম, লোকেরা ভাবে, গালগল্প শুধু
 দ্যাখো তাকে গুণ্ঠনের তলে।

অনুদিত ‘গীতাঞ্জলি’ পাঠ করার পর

জীবন যন্ত্রণাভোগী ক্লান্ত প্রাণ তুমি
 এখানেই পাবে শান্তি শাস্বত জীবনে;
 ভেবো না প্রেমের বান মৃত্যু বাঁধ দিয়ে যায় বাঁধা,
 প্রেম যে সর্বগ্রামী—উষ-অশ্ব-অন্তর-বাহিরে—
 মৃত্যু—সেও প্রেমের যে চূড়ান্ত আশিস
 বাসরশয্যায় যেন নায়কী-চুম্বন।
 আশ্রয় মন্দিরে আমি নীরব, নিভৃত
 সাধক, দেখেছি জীবনপট অখণ্ড অটুট—
 মিছে মরীচিকা নয় সম্যাসের মায়ার মতন,
 বরং তা যেন ছিল ঈশ্বরের সদ্যোরাচা ছবি;
 প্রতিটি ইন্দ্রিয়ম্বার উন্মোচিত, অবাধ, উদ্যত
 তাঁকে ব’রে নিতে, সাড়া দিতে তাঁর ডাকে।
 হে গায়ক, সুউচ্চ আসন থেকে ঈষদবনত
 আমাকে ডেকেছ ‘বৃন্দ’ বলে।
 রেখে যাই তোমার চরণে অক্ষম প্রেমের অভিজ্ঞান
 এই মাল্য (কী অযোগ্য দান)
 ছন্দোবদ্ধ অর্ঘ্য এই, হৃদয়ের
 নিবেদন গীতাঞ্জলি-পাঠে ॥

—রূপেন্দ্রনাথ দেব

শান্তিনিকেতনের তালবন

যখন দিনান্তের আলো মৃদুর্ষদ
বহুদূর প্রসারিত নিস্তত্বে পশ্চিমে
তখন তালগাছগুলি সন্ধ্যা দীর্ঘশ্বাস ফলিত করে
ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে প্রশান্ত বিশ্রামে।

নিবিড় বিষমতায় ওদের আকৃতি অস্পষ্টতর হয়ে যায়
কুয়াশা-মোড়া রাতির মতো,
শুদ্ধ তারকাখচিত আকাশের উচ্চতায়
তাদের কম্পমান শীর্ষগুলি স্পর্শ পায় আলোকের।

কিন্তু যখন চাঁদের গোলাপী উজ্জ্বলতা
কৃষ্ণ পৃথিবীর ওপরে দেখা দেয়
ওরা তখন জাগে, অনুভব করে নরম জ্যোৎস্না
নতুন-জাগা পলকে কাঁপতে থাকে তাদের পাতাগুলি।

আবিষ্ট প্রহরে তারা আমন্ত্রণ করে তাকে
আকাশে ধূমল রাতির রানী,
ভালবাসার পরিপূর্ণ আনন্দে তারা
আবেগ-কম্পিত বাহু বাড়িয়ে দেয়।

ক্ষীণ, শীতল ও ধূসর সকাল
ধীরে ধীরে তাদের ওপর নেমে আসে
শিশিরস্নাত তাদের দেহ
শাদা কুয়াশায় আবৃত সমুদ্রের প্রান্তর
স্তম্ভ বায়ুতে প্রেতের মতো তারা দাঁড়িয়ে।

নির্বাক ও কালো আকাশের তলায়
তারা ভোরের প্রহরী

যতক্ষণ না সকালের সোনালী আলো
তাদের সুউন্নত ললাট আহত করে আগুনের বলয়ে।

প্রজ্জ্বলিত উৎকীর্ণ বাহুগুলি
আন্দোলিত হচ্ছে মৃদু পৃথিবীর ওপর
দুলছে গর্বে, রাতির মেঘ বিদীর্ণ করে উত্তোলিত
উজ্জ্বল আলোকের উত্তরীয়।

মায়াবী সকাল যখন তাদের আচ্ছন্ন করে
স্তম্ভ হয়ে যায় ভোরের মৃদু হাওয়া
তখন এক গভীর নীল কুয়াশা তাদের ঘিরে দেয়
অবিরল শান্তির স্বপ্নে।

চারদিকের বাতাসে শান্তি
মেরু থেকে মেরুতে, অন্তরীক্ষে শান্তি
দূর দিগন্তে প্রসারিত শান্তি
আবিস্রবলোকে আসে শান্তি।

তারপর অস্থির প্রতীক্ষায় আনে শান্তি
যা আমার জীবনকে ব্যর্থ কোলাহলে
আলোড়িত করেছে

চণ্ডল করেছে স্মৃতি আকীর্ণ
অতীতের বেদনাকে।

গভীর বেদনায় আবর্তিত হয়েছি ইতস্তত
মেলনি অস্থির মূর্তি
এখানে তালবনের তলায় পেয়েছি
ঈশ্বরের দেওয়া পরম, অমর এবং অন্তহীন প্রশান্তি।

নব বিহার

“উচ্ছৃংখল ষোবনের দিনে আমি
কলিঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি
বিতাড়িত করে নিয়ে গেছি পূরীর সমুদ্র পর্যন্ত
ছত্রভঙ্গ যুদ্ধ-বন্দীদের
তারপর সূর্য হয়েছিল নৃশংস ও ভয়াল হত্যাকাণ্ড
যখন মানুষের রক্তে গাঢ় হয়ে উঠল সমুদ্রের
শূন্যফলপুষ্প।”

—একথা শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করে গেছেন প্রিয়দর্শী
যাতে সমগ্র মানবতা তাঁর হৃদয়বেদনা
পাঠ করতে পারে।

“কিন্তু যখন জীবন-মধ্যাহ্নে
এই আত্ম হৃদয়ে জাগ্রত হল পবিত্র করুণা
(এ শিক্ষা দিয়েছিলেন সিম্ভার্থ, মহাতাপস বৃদ্ধ)
অন্ধকারের পথ পরিত্যাগ করে
আমি শান্তির পথে তীর্থযাত্রী হলাম।
এখন সারা বিশ্বের অধিবাসী জীবনকে
জানক পবিত্র বলে; সংঘাত স্থান করে দিক
সহিষ্ণুতার।

এই আমার রাজকীয় নির্দেশ।

হে সম্রাট, হে তাপস, তোমার মুক্ত আত্মা কি
আবার এই জীবনের তীর্থভূমিতে ফিরে আসবে, ..
সরে আসবে কি দিব্য অধিষ্ঠান থেকে?
তাই হবে তোমার প্রতিমূর্তি—
সময়ের নবজন্মে আমাদের হৃদয়ের গভীরে উৎকীর্ণ
মানুষ জানবে ভালবাসার কোমল করুণা
প্রত্যেক প্রাণের জন্য জাগবে শ্রম্ভা
মহান অশোক, তোমার প্রাচীন সিংহাসন থেকে
আবার যেন আশীর্বাদ ও সান্ত্বনার ধারা
প্রবাহিত হয়
তুষারাবৃত উত্তর শিখর থেকে
দক্ষিণের নারিকেল-কুঞ্জ,
ভরে দিক পরম শান্তিতে।

—কৃষ্ণ ধর

গদ্য নানক

গদ্য গোবিন্দ, নানকের সন্ততি—

বর্তমানের এ-দায় দুরহতর
অতীতের চেয়ে। যে-দিন মস্ত গতি
কাশ্মীর থেকে সিংধু করেছ জন্ম
মুক্ত কৃপাণ ছুটেছ বন্যা বেগে
নিশান তুলেছ প্রলয়ের মেঘে মেঘে
শিকারী বাজের উল্লাসে নেমে এসে
খোলা প্রান্তরে করেছ শত্রুক্রয়।

আবার নানক বলেছেন ভালোবেসে
ভক্তজনের হৃদয়ে অমর বাণী,—
'ফরিদ তিনি যে প্রেমময়, প্রেমসার
মানুষ আঘাত হানিলে কিছুর না মানি
চরণ চুমিয়ে। জানিয়ে পথের শেষে
সমুখে তোমার খুলিবে তাঁহার দ্বার।'

কদম্ব

শক্তি, বিষাদ উভয়ের-ই একাধার
ক্লিষ্ট করুণ তোমার ও মুখে চাই
ভ্রষ্ট হৃদয়ে দুই পায়ে ভেঙে পড়ি
ও-মুখে তাকিয়ে শান্তিকে ফিরে পাই।

আঁধার ঘনায়, বাতাসের হাহাকারে
ঢেউ উত্তাল, রাতি ব্যাথায় নীল—
তোমার প্রেমের নয়নে তারার আলো
তোমার ন্যায়ের সৌর বিভ্রাম দিন।

স্মৃতি

ইংল্যান্ড

ফুলের বাগান ছড়ানো গ্রাম্য-পথে
গীর্জার চড়া আকাশের বৃকে একা
চারিধারে শৃঙ্খল সবুজের খেলাঘর
ছাড়া ছাড়া মেঘ সারাবেলা ভেসে থাকা

ভারত

দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসা ধর্মের গুঞ্জন
বালুকাবাহিনী নদী থেকে যায় প্রান্তরের পার
যেখানে রাতির বৃকে তারকারা পৃথিবীর কানে
কথা বলে একা একা! জেগে থাকে শৃঙ্খল অশঙ্কার ॥

ভগিনী নিবেদিতা

কার আছে ভালবাসা প্রাণভরা? গুরুদর জিজ্ঞাসা।
 কে ভালবাসিতে পার, নয় শৃঙ্খল বিমুক্ত বিশ্বাসে
 নয় শৃঙ্খল কর্মহীন সমব্যথা ব্যথিতের শ্বাসে
 কাজে, শৃঙ্খল কাজে কার প্রকাশিত হবে ভালবাসা?

মৃগদাতা দেখালেন প্রেমের অমর কর্মপথ
 সংকীর্ণ সে এক পথে নিত্য চলে পুণ্য জয়রথ
 ঘাণ কর ক্ষুধিত অপরিচিত যারা বেদনায়
 যারা রক্ত, ক্লান্ত জীর্ণ, যারা বন্দী অধার কারায়।

সেই প্রেম-নিবেদিতা, যদিও সে বাহির আগুন
 ছেড়েছে খুঁটিয়ের তবু, তাঁরই বাণী প্রাণে জ্যোতির্ময়
 ছেড়ে নিজ গৃহ, দূর অজ্ঞানারে করেছে আপন
 খুঁটিয়ের প্রকৃত কাজ, মনে তেজ ছিল যে দুর্জয়

ভালবাসিবার, দঃখ সহিবার, মৃত্যু যতক্ষণ
 না করে আহ্বান শান্ত হিমালয়ে শূন্য চিরন্তন ॥

—শিশিরকুমার দাস

প্রিয়তম গুরুদেব

‘চালি’

৫ই জুন [১৯১৭]

প্রিয়তম বন্ধু,

সিডনী

এইমাত্র আমি একটি পরম আনন্দলাভ করেছি। সে আনন্দ আপনার ফাল্গুনী নাটকের দ্বিতীয় পাঠ থেকে। আমার মনে হোলো সেই অনুভূতি সতেজ থাকতে থাকতেই আপনাকে আমার চিঠি দিয়ে সে বিষয়ে জানানো দরকার; কারণ আমি জানি ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তেমনটি আপনাকে জানাতে পারলে আপনি কত খুসী হবেন।

সিডনীতে প্রথমবার এটি পড়া হোলো খুব ছোট একটি সমাবেশে; কিন্তু সে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দ্বিতীয়বার পাঠের জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হলো। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে প্রথমে তা অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমার হয়েছিল; কিন্তু সম্মত হয়েছিলাম বলে এখন আমার কি ভালই লাগছে। অনেক ভাল লোকের সমাবেশ হয়েছিল। আমার খুব মনে হচ্ছিল যদি আপনি নিজের উপস্থিতি থেকে পাঠ কবতেন এবং যে অপূর্ণ ব্যঞ্জনা, আলোছায়ার খেলা এবং সুরের সৃষ্টি আপনি ইংরেজী পাঠের সময় করেন তা করতেন; আপনি তো জানেন, এসব আমার কণ্ঠে ধরা দেয় না। প্রথমটায় গভীর স্বধাবশতঃ আমি আশাভরসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং পাঠ আরম্ভ করবার আগে নটকটির ব্যখ্যা করতে গিয়ে আমি প্রথম কয়েকটি বাক্য মারাত্মকভাবে হেঁচট খেলাম। কিন্তু যেই নাটকটায় পৌঁছলাম সবই হঠাৎ সহজ হয়ে গেল, তখন আপনিই আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন, আমি নিজেকে ভুলে পড়েই যেতে লাগলাম, নাটকের বাইরে আর কোনও চিন্তাই আমার মনে স্থান পেলোনা। অবশেষে যখন শেষ দৃশ্য এসে গেল তখন আমি এত অভিভূত হয়ে পড়েছি যে তরুণদের কণ্ঠে গভীর দুঃখের দুটি গান আমি পড়তেই পারছিলাম না। সেই গানদুটি হলো—

“তুই ফেলে এসেছিস কারে (মন, মন রে আমার)”

আর “আমি যাব না গো অমনি চলে। মালা তোমার দেব গলে।”

আরও বেশী করে মনে পড়ছিল আপনার কথা যখন অন্ধ গায়কের গানগুলি পড়ছিলাম। তারপর সেই ধমধমে আবহাওয়ায় যখন দাদাব প্রবেশ, তখন কী স্মৃতি!

গুরুদেব, সে কী অপূর্ণ; এবং সবটা যখন পড়া হয়ে গেল তখন কী গভীর আনন্দ; মনে হোলো সে আপনাবই জন্ম, আর তাইতেই তো আমার আনন্দ! আমার সমগ্র সত্তা যখন এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তখন নতুন করে আবার উপলব্ধি করলাম কি অনির্বচনীয় একটি নাটক আপনি সৃষ্টি করেছেন। অবশেষে যখন তারা সবাই আমাকে ঘিরে সেই আনন্দদানের জন্য ধন্যবাদ দিতে লাগলো তখন যেন হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল। নাটকটি যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল, সংগে জড়িয়েছিল আপনার স্মৃতি—যা তীব্রভাবে অনুভব কবেছি শেষ দৃশ্যে—আর ছিল, অবশেষের গানটি যারা গাইল সেই বালকদের স্বপ্ন—সেই মোহাচ্ছন্নতা থেকে জেগে ফিরে এলাম কাছের মানুষগুলির জগতে—তাদের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম সেই মন্ত্রের শক্তি তাদের উপরেও কাজ করেছে।

তারা কি বলিছিল তার সব কথা আমি আপনাকে বলতে পারব না, তবু তার কিছু রয়েছে আমার স্মৃতিতে আঁকড়ে। চোখে ভাসছে কয়েকটি মুখ। সবচেয়ে বেশী করে ষাঁর কথা মনে পড়ছে তিনি এই শহরে একটি বড় হাসপাতালের মেট্রন—ষাঁর ক্লান্ত অবসন্ন মুখকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল তাঁর চোখের গভীর আনন্দের দীপ্তি। অতি সাধারণ কথায় তিনি আমাকে বললেন তিনি কত অবসন্ন বোধ করছিলেন, হাসপাতালের পরিশ্রম তাঁর সাথের অতিরিক্ত হয়ে পড়িছিল কিন্তু আপনার নাটকটি শুনে তাঁর মনে হল তিনি কাজে ফিরে যাবার মনের জোর পেলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে আপনার বইগুলি তাঁর অমূল্য সম্পদ, বিশেষ করে গীতাঞ্জলি। সেগুলিকে তিনি হাসপাতালে তাঁর ঘরে একটি শেলফে বেথেছেন এবং প্রায়ই পড়েন। পরে জিগেস করে আমি জানতে পারলাম তিনি ঘোরতর আত্মিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন এবং সম্মানিত ধর্মের সঙ্গে সব সম্পর্ক তিনি ত্যাগ করেছেন। আমার খুব ইচ্ছে করছে যে তিনি আপনার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ পান। কী সুন্দর মহীয়সী মহিলা তিনি।

আবও একটি মুখ আমার বেশ মনে পড়ে। একজন খাকি পোষাক পরা সৈন্য, তার জন্মের হাতায় “রেড ক্রস” লাগানো। গ্যালিপলি ও ঈজিপ্টের রণক্ষেত্রে সে গিয়েছিল, অঘাতে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল তাকে। তার কাছে শুনলাম সে ছিল ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। আপনার বই সে পড়েছে, সঙ্গে রাখে সবসময়। খুব সামান্যই সে কথায় বলল, কিন্তু যখন সে ধন্যবাদ দিল তখন আমার হাতের উপর তার হাতের চাপ আমার মনে দাগ কেটে গেল। তার সঙ্গী ছিল আর একজন সৈনিক। তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম সে বুঝেছে কিনা, সে বলল “হ্যাঁ, প্রত্যেকটি কথা”। একটি তরুণীর সঙ্গে সে আমার পরিচয় কবিশেষ দিল। বোঝা গেল মেয়েটি তার বাগদত্তা। তারা দুজনেই বলল যে তাদের খুব ভাল লেগেছে। ছেলোটো মেয়েটিকে নিয়ে বেশ গর্ব আছে কারণ সে বেশী শিক্ষিতা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে নিজেই আপনার নাটকটা বেশী ভাল বুঝেছে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম—সেটি হোলো এই যে এই ফাঙ্গুদন নাটকটির বিশেষ আবেদন আছে পুরুষদের কাছে। গতরাতিতে পুরুষদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকে যেভাবে উঠে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাটকটিতে আমাদের ভিতরকার পৌরুষকে সচেতন করে তোলে : আমি নিজেই এটা উপলব্ধি করছি। এটি আমাদের সবল ও বীর্যবান কবে তোলে, সংগ্রামের প্রস্তুতি এনে দেয়। আজ সকলে খুব ভোরে যখন আমি চুপ করে বসেছিলাম—পাঠের পব উত্তেজনায গত রাতিতে আমার প্রায় ঘুমই হয়নি—বিগত রাতির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ও তার তাৎপর্ষ্যের কথা চিন্তা করছিলাম, এই স্মৃতিই তখন আমাব মনে অত্যন্ত স্পষ্ট করে ধরা দিল। এমন কি যে সব মহিলারা তাঁদের কথার মধ্যে দিয়ে আমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছেন তাঁরা এমন মহিলা ষাঁদের জীবনে প্রায় পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। একজন হলেন সেই মেট্রন, আর একজন শহরের উপকণ্ঠে একটি বড় বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

এ সবই সত্য, তবু আবও একটি মুখ মনে পড়ছে—একটি মেয়ের মুখ—অতি কোমল ও সুকুমার। দেখেই বোঝা যায় তিনি সম্প্রতি একটি শোক পেয়েছেন—হয়তো সাম্প্রতিক যুদ্ধে। আমি স্পষ্টই দেখলাম তাঁর সাহস নতুন করে উজ্জীবিত হোলো; আর একথা তো ঠিক যে মেয়েদের সাহস পুরুষদের চেয়ে বেশী। অবশ্য বেশি বাড়িয়ে বললে ভুল হবার সম্ভাবনাও আছে।

প্রিয় গুরুদেব, গতরাত্রির এই অভিজ্ঞতাই সিডনীর সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকবে। সেই যে বিষয়, বিমূঢ় এবং বিস্মান্ত সকালবেলাতে আমি আপনার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম প্রায় দেড়মাস আগে, তারপরে আর কোনও ঘটনায় আমি এত আনন্দ পাইনি। আমার নিঃসঙ্গতা এবং বেদনার কথা যা কিছু আপনাকে লিখেছি তা এখন সত্যি কেটে যাচ্ছে। যখন একেবারে একা থাকি তখন শব্দ একটি ব্যাপার আমার গভীর উদ্বেগের কারণ হয়—সেটি হেলো—আপনি কেমন আছেন, আপনার কানের যন্ত্রণা, আপনার পিঠের সেই বেড়ে যাওয়া ক্লান্তিকর ব্যাথাটা, আপনার সাধারণ স্বাস্থ্য, আর যে সব ছোটখাট ব্যাপারে আমি কাছে থাকলে সাহায্য করতে পাবতাম তার অভাববোধ—এ সবকিছু নিয়ে। কিন্তু এ সব প্রশ্ন মন থেকে জোর করে সরিয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং যে কাজ আমার সমনে আছে তাতে সম্পূর্ণভাবে ঝাঁপ দিতে হবে। এ অবস্থায় ফাল্গুনী পড়ে আমি আশ্চর্য উদ্দীপনা পেয়েছি—যেমন পেয়েছে আর সবাই যারা এখানে কাল বারিতে উপস্থিত ছিল।

গভীরতম শ্রদ্ধা সহ সঙ্গ

চার্লি

২২শে সেপ্টেম্বর

২

প্রিয়তম বন্ধু,

আপনার দুটি চিঠি পেয়েছি। সেগুলি যে আমাকে কি আনন্দ দিয়েছে আপনাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আপনি যে চিঠি লেখবার সময় শান্তিতে শিলাইদায় বিশ্রাম নিচ্ছেন আর আশ্রয়ের ব্যাপারে স্বস্তিতে আছেন তা জেনে খুব আনন্দ হোগো। একটিমাত্র দুঃখের বিষয় হোলো বেলাদেবীর সংবাদ; তবু মনে হচ্ছে আর প্রার্থনা করছি ব্যাপারটা আপনি যা ভাবছেন তা যেন না হয় বা হলেও যেন সময়মত তার প্রতিকার হয়। অনুগ্রহ করে তাঁকে আমার প্রীতিপূর্ণ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। তাঁকে বলবেন এতদূবে চলে এসে ফিজি দ্বীপের শিশু ও নারীদের দুঃখদর্শনার মধ্যে তাদের পাশে থেকে তাঁর কথা আমার প্রায়ই মনে পড়েছে। তাঁকে যখন দেখতে যেতাম তখন এদের কথা আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম। এখন তাঁর সহানুভূতি এবং মায়ের মত ভালবাসা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি কি নিজেও জানতেন আমাকে তিনি কতখানি দিয়েছেন; যখনই কলকাতার দু'চার ঘণ্টার জন্যও গিয়েছি, ইচ্ছে হয়েছে তাঁর বাড়ী চলে যেতে এবং ফিজির লোকদের জন্য আমার উদ্বেগের বোকা তাঁর সঙ্গে ভাগ কবে নিতে।

আপনার সুন্দর অতিপ্রিয় হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিগুলির চেয়েও কিন্তু বেশী আনন্দ দিয়েছে মর্ডান রিভিউতে “দী নেশন” নামে প্রবন্ধটি। আপনার পরবর্তী চিন্তাধারা সম্বন্ধে জানানোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাইই হিদিশ পেলাম এই প্রবন্ধ। আর সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে সরেনকৃত আপনার চিঠিগুলির অনুবাদ। ভাবব সৌন্দর্য, সজীবতা ও পরিবেশ বচনায় সে এবং তার আগেকার কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমি যে কত খুসী হয়েছি, তাই সঙ্গে দেখা হলে তাকে জানাবেন।

আপনার জন্য ভালবাসা সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করি যখন আপনি পক্ষির উপর বোটে থাকেন। ঠিক তেমন ভালবাসি যখন “Stray Birds”-এর গানগুলি পড়ি।

“ব্যক্তিগত” রদেনস্টাইনের ভালো লেগেছে জেনে কি খুসীই যে হয়েছি। আমার নিশ্চিত ধারণা যে এটি নতুন ধরনের গভীর চিন্তার রসখনি—এমন করে কেউ প্রকাশ করেনি এবং আগে। তবুও কিন্তু একথা বলব যে, ফাল্গুনী ও “Stray Birds”—এর মধ্যেই আপনাকে একান্ত করে পাই আপনার মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে সবচেয়ে বেশী করে অনুভব করি।

চাওয়ার বেদনা, অধীর প্রতীক্ষার বেদনা আমি অনেকদিন অনুভব করেছি—আপনার বই পড়তে গেলে বা আপনার হাতের লেখা দেখলে এই বেদনার বোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এতদিনে মনে হচ্ছে কিছুদিনের জন্য আমি স্বস্তি ও মৃত্তি পাব। আশা করছি এই ভাব স্থায়ী হবে। অক্টোবরের বাইশে নাগাদ ফিজি থেকে বেবিয়ে নববর্ষে ভারতবর্ষে ফিবব। বোধ হয় উইলির কাছ থেকে ঠিকানা বদল হয়ে আমার যেসব চিঠি এসেছে এ চিঠি তার মধ্যেই পেয়েছি। কিন্তু মনে হয় এটি ডুপ্লিকেট কপি। এর সঙ্গে মিঃ লিওনার্ড—এবং একটি চিঠিও পাঠাচ্ছি। সেটি পড়ে আপনার ভাল লাগবে মনে হয়।

গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়

[রথীকে স্নেহ জানাচ্ছি।

চার্লস

ম্যানরভিল

সিমলা

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৭

প্রিয়তম গুরুদেব,

গতকাল আমার চিঠির শেষে “বন্দেমাতরম”—এর প্রশ্নটি নিয়ে কিছু লিখেছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য বিষয়টি নিয়ে বেশী চিন্তা করতে পারিনি। এখন সুধাকান্তর চিঠি ও সংবাদপত্রগুলি পড়ে দেখছি একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এবং সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পরামর্শ ছিল “বন্দেমাতরম” সংগীতটি বাদ দিয়ে শুধু কথা দুটি গ্রহণ করা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তেমন জোড়াতালির সমধান কোনও কাজের নয়, কারণ কথাগুলির ব্যাখ্যা ঐ গানে এবং গানটি নিয়েই আসল সমস্যা। আমার সামনে গানটি নেই, কিন্তু কৃপালনীর প্রবন্ধে যে উদ্ভৃতি আছে তার থেকে বোঝা যায় একজন খৃষ্টান, মুসলমান বা ব্রাহ্মের পক্ষে খোলা মনে গানটি গাওয়া খুব শক্ত। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আগার থেকে অনেক ভাল বুঝবেন। আবও একটি উপহার আমি পেয়েছি..* আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের স্বীকৃতি জানিয়েছি। এটির মূল্য পাঁচ টাকা। আমার মনে হয় না এক্ষেত্রে নতুন করে আর স্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রয়োজন আছে।

আপনার শরীর ভাল হয়েছে শুনে খুব ভাল লাগল।

রজকুমারী তাঁর প্রীতি জানাচ্ছেন।

খুব তাড়াতাড়ি লিখছি,

আমার আন্তরিক ভালবাসায়—

চার্লস

*একটি দুটি কথার পাঠোদ্ধার করা যারনি মূল ইংরাজী চিঠিতেই

ম্যানরভিল

সিমলা

অক্টোবর ২৫, ১৯৩৭

প্রিয়তম গুরুদেব,

অনেকদিন আপনাকে চিঠি দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি রোগশয্যা ও আরোগ্যে যে বাংলা কবিতাটি লিখেছিলেন তার সুন্দর অনুবাদটির জন্য যে আমি কত কৃতজ্ঞ তা মূখে প্রকাশ করতে পেরব না, এই কথা আপনাকে জানানোর ছিল। একটা কথাও “ইস্কুলমাস্টার”কে বদলাতে হয়নি, আপনার ইংরেজি প্রকাশভঙ্গীতেও কোনও ত্রুটি দেখতে পেলাম না। কবিতাটা বাংলায় নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়েছিল। রাজকুমারীর সঙ্গে গোটা পরিবারটাই সেটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। আমি বার বার এটা পড়েছি, প্রত্যেকবারই এতে নতুন কিছু পাচ্ছি। সুধাকান্ত জানাচ্ছে যে আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি আঁকছেন। আরোগ্য-লভের এ খুব চমৎকার উপায়।

“বন্দেমাতরম” নিয়ে যে প্রশ্নটি উঠেছে তাতে আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি। শব্দগুলি নিয়ে কারোরই কোনও আপত্তি থাকতে পারে না এবং সেগুলি ভারতবর্ষের বচনভঙ্গীর একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হিন্দু ছাড়া অন্য কারও পক্ষে গানটির কথাগুলি সম্পূর্ণ তাৎপর্য-সহকারে গাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই কথাটাই কৃপালনীর দেখিয়েছেন “বিশ্ববতী নিউজ”-এ তাঁর চমৎকার একটি প্রবন্ধে। উদাহরণস্বরূপ দুর্গা সম্বন্ধে যে পংক্তিটি—হিন্দু ছাড়া অপর কারও কাছে তার বিশেষ অর্থ নেই। সবদিক বাঁচিয়ে সবচেয়ে ভাল সমাধান হলো মাতৃভূমির প্রতি প্রণতির অংশটুকু যথেষ্ট বজায় রেখে সম্পূর্ণ গানটির উপর জোর না দেওয়া। আমার দিক থেকে গানটির সরুটা আমার কাছে কিছুতেই সহজ হচ্ছে না, অথচ আপনার “জয় হে”র সর সহজেই আমাকে টেনে নিয়ে যায়। আশা করি এই তুচ্ছ প্রশ্নটা নিয়ে একটা বিভেদের সৃষ্টি হবে না। আমাদের সমনে শিক্ষা, অহিংস বর্জন, বন্দীশাখার সংস্কার ইত্যাদি অনেক গুরুতর প্রশ্ন আছে।

গভীরতম প্রীতির সঙ্গে

চার্লস

দীনবন্ধু এন্ডরুজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চার্লস এন্ডরুজের গতপ্রাণ দেহ আজ এই মৃত্যুতে সর্বগ্রাসী মাটির মধ্যে আশ্রয় নিল। মৃত্যুতে সত্তার চরম অবসান নয় এই কথা বলে শোকের দিনে আমরা ধৈর্যরক্ষা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সান্ত্বনা পাই নে। পরস্পরের দেখায় শোনায় নানাপ্রকার আদান-প্রদানে দিনে দিনে প্রেমের অমৃতপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, আমাদের দেহাশ্রিত মন ইন্দ্রিয়বোধের পথে মিলনের জন্যে অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। হঠাৎ যখন মৃত্যু সেই পথ একেবারে বন্ধ করে দেয় তখন এই বিচ্ছেদ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল এন্ডরুজকে বিচিত্র ভাবে পেয়েছি। আজ থেকে কোনোদিন আর সেই প্রীতিস্নিগ্ধ সাক্ষাৎ মিলন সম্ভব হবে না এ-কথা মেনে নিতেই হবে, কিন্তু কোনোরূপে তার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যে-মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ তার সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন উদ্ভূত কিছুই থাকে না। তখন সহযোগিতার অবসানকে চরম ক্ষতি বলে সহজে স্বীকার করতে পারি। সেই রকম সাংসারিক সুযোগ ঘটানো দেনা-পাওনার সম্বন্ধ মৃত্যুরই অধিকারগত। কিন্তু সকল প্রয়োজনের অতীত ভালোবাসার সম্পর্ক অসীম রহস্যময়, দৈহিক সত্তার মধ্যে তাকে তো কুলায় না। এন্ডরুজের সঙ্গে আমার অযাচিত দর্শন সেই আত্মিক সম্বন্ধই ঘটেছিল। এ বিধাতার অমূল্য বরদানেরই মতো। এর মধ্যে সাধারণ সম্ভবপরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক দিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচয়ের ভিতর হতে এই খুঁটান সাধুর ভগবন্তত্ত্বের নির্মল উৎস থেকে উৎসারিত বন্ধুত্ব আমার দিকে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল স্বার্থের যোগ না ছিল খ্যাতির দ্রোশ, কেবল ছিল সর্বতোমুখী আত্মনিবেদন। তখন কেনোপনিষদের এই প্রশ্ন আপনি আমার মনে জেগে উঠেছে, কেনেযিতং প্রেযিতং মনঃ, এই মনটি কার দ্বারা আমার দিকে প্রেরিত হয়েছে, কোথায় এর রহস্যের মূল। জ্ঞান এর মূল ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তির মধ্যে। সেই জন্যে এর প্রথম আরম্ভের কথাটা বলা চাই।

তখন আমি লন্ডনে ছিলাম। কলাবিহারদ রটেনস্টাইনের বাড়ীতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েটস্ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এন্ডরুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হাম্পস্টেড হাীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলাম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এন্ডরুজ আমার সঙ্গে নিয়েছিলেন। নিস্ততঃ রাতে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বরের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই

মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।

শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। তখন আমাদের এই দ্বিবিদ্য বিদ্যায়ত্তনের বাহ্যরূপ ছিল যৎসামান্য এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ। সমস্ত বাহ্য দৈন্য সত্ত্বেও তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শান্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছিলেন। সবল চরিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের ধারা। কখনো তিনি অর্থ সংগ্রহ করেননি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারিনি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পাননি, কিন্তু সেই ভিক্ষা উপলক্ষ্যে অসংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের আদর্শ বলে আত্মসম্মান। নিরন্তর দারিদ্রের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি করে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

আমার সঙ্গে এন্ডরুজের যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল সেই কথাটাই এতক্ষণ বললাম কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর নিষ্ঠা দেশের লোক অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ মূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেজ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। কী ভাষায় কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকেই এর আত্মকালের নাড়ীর যোগ ইংলণ্ডের সঙ্গে। তাঁর আত্মীয়মণ্ডলী কেন্দ্র ছিল সেইখানেই। যে ভারতবর্ষকে তিনি একান্ত আত্মীয় বলে চিরদিনের মতো স্বীকার করে নিলেন, তাঁর দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাজ-ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে। এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ কবেছেন তাঁর বিশ্বদুঃখ প্রেমের মাহাত্ম্য। এ-দেশে এসে নির্জীর্ণ সাবধানতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ষকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন নি, অসংকোচে তিনি এখানকার সর্ব-সাধারণের সঙ্গে সবিনয় যোগ রক্ষা করেছেন। যারা দীন, যারা অবজ্ঞাজনন, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদের আদর্শে গ্রীহীন, নানা উপলক্ষ্যে সহজ আত্মীয়তায় তাদের সহবাস অনায়াসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ-দেশের শাসক-সম্প্রদায় যারা তাঁর এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আপনাদের রাজপ্রতিপত্তির অসম্মান অনুভব করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাঁকে ঘৃণা করেছেন তা আমরা জানি, তবু স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি দ্রুৎপন্ন্যাস করেননি। তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা ছিলেন তাঁকে তিনি জনসাধারণের অভাজনদের বন্দ্য বলে জানতেন তাঁরই কাছ থেকে শ্রদ্ধা তিনি অস্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কী পরের কী আমাদের নিজের কাছে যেখানেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা অব্যাহত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি আপন ঋণীভাবটিকে জয়যুক্ত কবেছেন। এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলতে হবে অনেকবার আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকেও তিনি বিরুদ্ধতা ও সিদ্ধি ব্যবহার পেরেছিলেন, সেই অন্যায আঘাত অস্মানচিত্তে বহন করাও ছিল তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ।

যে-সময় এন্ডরুজ ভারতবর্ষকে আপন আত্মত্যাগের কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার করে

নিয়োগিতেন সেই সময়ে এ-দেশে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে জ্বলে উঠেছিল। এমন অবস্থায় এ-দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহার্দ্যের আসন রক্ষা করে তিষ্ঠে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দঃসাধ্য সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তাঁর আপন স্থানে, তাঁর মধ্যে কোনো বিধা বন্ধ ছিল না। এই যে অবিচলিতচিত্তে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা, এতেই তাঁর আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে এন্ডরুজকে আমি জানি দুই দিক থেকে তাঁর পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছে, এক আমার অত্যন্ত কাছে, আমার প্রতি স্নেহভাবী ভালোবাসায়। এমনভাবে অকৃত্রিম অপর্ষিত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মসমর্পণ। দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ-দেশের অন্তর্জন্মের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখন তাঁকে অহীন করে তখন নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে। এই জন্যই তাঁকে স্থিতিভাবে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজে বেধে রাখা অসম্ভব ছিল।

এই যে তাঁর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের সীমাগত সেকথা বললে ভুল বলা হবে, তাঁর খ্রীষ্টধর্মের সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ। একদা তাইই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখেছি, যখন সেখানকার ভারতীয় বা কাফ্রিদেরকে আপনাদের থেকে স্বতন্ত্র কবে হয় করে দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং যুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধিকার কামনা করেছিল। এন্ডরুজ এই অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে সহ্য করতে পারেন নি, এই সকল কারণে এক দিন এন্ডরুজকে সেখানকার ভারতীয়েরা শত্রু বলেই কল্পনা করেছিল।

আজকেব দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাধীনতাভোধ অসংযত ঔন্মত্যে উদ্ভূত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা। কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল এন্ডরুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্বন্ধ সে তাদের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের। সেই জ্বলের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে পদে বাধা পায়, আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দ্বন্দ্ব রক্ষা করা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উদ্ভূত হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশকে এই অমর্যাদার দুঃসহ ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ইংরেজের মধ্য থেকে এন্ডরুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সঙ্গে দুঃখে উৎসবে বাসনে বাস করতে এলেন এই পবিত্র-লাঞ্ছিত জাতির অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না উচ্চমণ্ড থেকে অভাগাদের অনুগ্রহ করার আশ্বলাঘ্য সম্ভাগ। এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি দল্লভ সর্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি একদিন বলেছিলেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই—

প্রয়োজন হলে এই কবিবচন আমরা আউড়িয়ে থাকি কিন্তু আমরা এই সত্যবাক্যে অবজ্ঞা করবার জন্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সন্মার্জনীকে ঘেঁরকম ঘাবহার করে থাকি

এমন আর কেনো জ্ঞাতি করে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে বিদ্রূপ সহ্য করেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমদ্রপার থেকে সত্যমানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে ষোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে-লাভ এখনো অক্ষয় হয়ে রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে তিনি আপনার কর্মশক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের ম্বারা আবিল করেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বায়ুকে। কিন্তু তার ব্যর্থতা বৃদ্ধিতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, এবং রাষ্ট্রীয় মাদকতার অক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হ'তে দেন নি। কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানবের জন্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন,—তাঁর মরদেহ ধূলিসাৎ হবার মূহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর প্রশংসার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।

৫।৪।৪০

গুরুদেব
সি.এফ. এন্ড্রুজ

কবিকে আমি ভালবাসি, কবির জন্মদিনের অভিনন্দন লেখার ডাক যখন আমার কাছে এলো তখন আমি কেপ টাউনে, ভারতীয় সংগ্রামের একেবারে গভীরে। ট্রান্সভালে, বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের ক্ষমতাবৃদ্ধি বিরুদ্ধে তখন আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে। আমাব প্রত্যেকটি মনোহর কাজের চাপে ঠাসা। অতীতে কবির কাছে আমি কি পেয়েছি তারই স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় কবে এলো—তারই একটির কথা স্মরণ করি।

প্রায় কুড়ি বছর আগে, মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন একটা চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে: তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে কবি নিজে আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠালেন, সঙ্গে এলেন উইলি পিয়াসন। রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে এই পবন গৌরবের খবর পৌঁছানোর ঠিক পরেই আমাদের যাবার ডাক এলো। বন্ধুর মধ্যে কবির জন্মের আনন্দ তখনও বাজছে, ধ্বনিত হচ্ছে—আমবা বোবোয় পড়লুম।

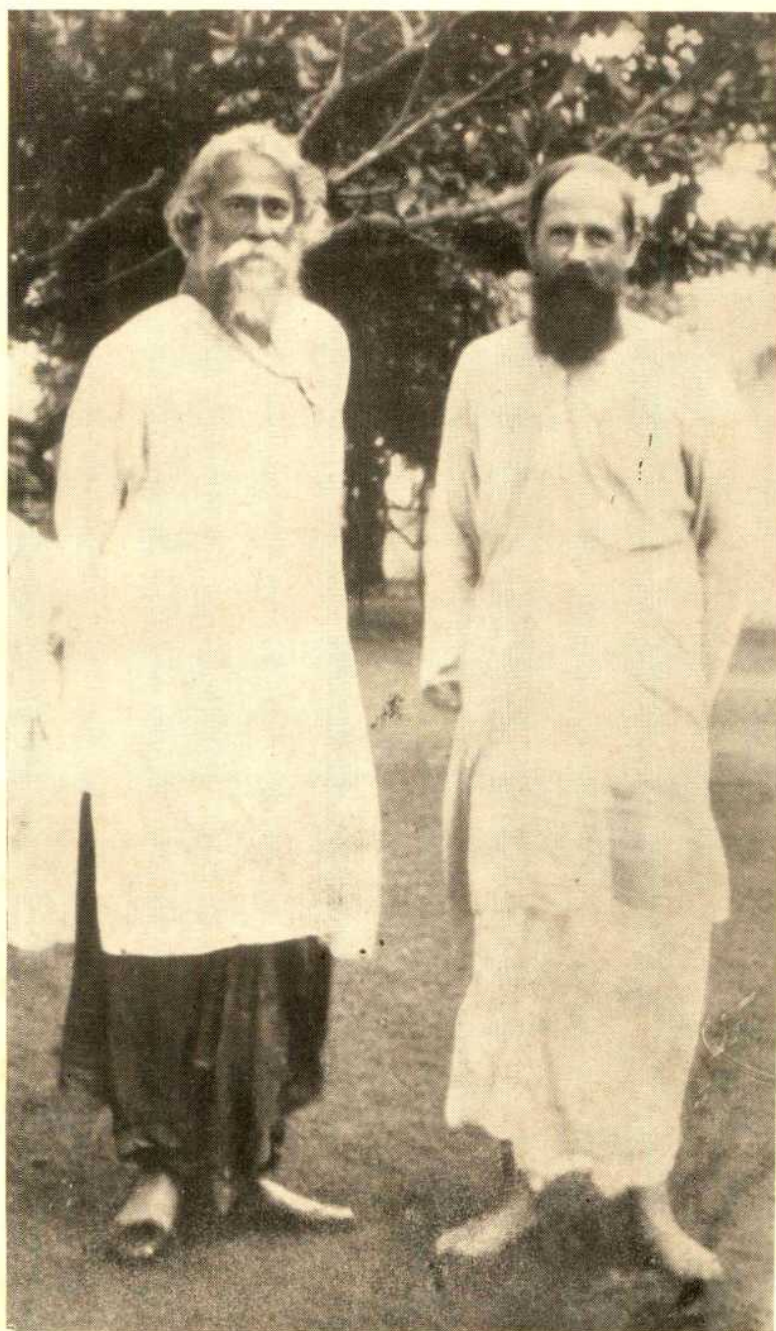
এমনি করে এক দুর্যোগের মনোহর তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে নিজেই আদর্শের দূতসাহসিক যাত্রায় পাঠিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর মহৎ অনুগামীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা, তাঁদের বীৰত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা তিনি আমাদের (হাত) দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমার কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে একে অভিহিত করেছিলেন।

অটিকান্দুস্ত ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রার অবসানে আমাদের জাহাজ যখন ডারবান বন্দরে নিরূপদে এসে ভিড়ল, তখন জেটিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই ভারতীয় দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে যে-বাণী আমবা বহন করে নিয়ে এলাম, তার ফলে নাটালে নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন রচিত হলো। কারণ এই বাণীর মধ্য দিয়ে কবি যে ভালোবাসার দান তাঁরা সরাসরি আমাদের হাত থেকে পেলেন তার ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় এবং তাঁদের নেতার অন্তর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের এইভাবে এক অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক বন্ধন গড়ে উঠল। এই বন্ধন কখনও ছিন্ন হয় নি। এই বন্ধন এতই দৃঢ় ছিল যে, যে-আঠারোজন বালক গান্ধীজীর সঙ্গে বহু বছর ধরে ফিনিজে বাস করতেন—তাদের গান্ধীজি বিলাত যাবার সময় রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে গেলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও তাদের নিজের কাছে শান্তিনিকেতন আগ্রমে দীর্ঘকাল বেখেছিলেন। তখন মগনলাল গান্ধীর ওপর ছিল এই সব ছেলেদের দেখাশোনার ভার। তাঁর সঙ্গেও কবির গভীর হৃদয়তা গড়ে উঠেছিল।

যে-সময়ে আমি আর উইলি পিয়াসন সবেমাত্র শান্তিনিকেতন থেকে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় পা দিয়েছি, কিছুক্ষণের জন্যে সেই দিনগুলির কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে। সেই নবীন আধ্যাত্মিক চেতনা উপলব্ধি লগ্নে আমাদের সকল আলাপ-আলোচনার মধ্যেই কবি আর তাঁর আগ্রমের ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠত। এ-ছিল তাঁর প্রতি আমাদের আবেগ ও ভালোবাসার প্রথম পরিপূর্ণ প্রকাশ। আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকেই এ যেন তার উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করে তুলেছিল। একই চিন্তাধারা নিয়ে যখন আমরা কবির কথা বলাবলি করতাম তখন মাথার ওপর আকাশটিও যেন আরো মহনীয় মনে হতো।

আমাদের দুজনের কাছেই এই মনোহরটি আবার ছিল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নবীন সৌহার্দ্য উপলব্ধি আনন্দের পরিপূর্ণ। দুজনের প্রতি এই অনুবাসন ক্রমে অন্তরে অন্তরে একই ভালোবাসায় মিশে গেল। প্রায়ই



রাষ্ট্রকালে নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে আমরা বসতাম—চারিদিক তখন নিস্তত্ব। বসে বসে শান্তিনিকেতনে দোতলার ছোট ঘরটির বাইরের ছাদে গুরুদেবের সঙ্গে যে আশ্চর্য সন্ধ্যাগুলি আমবা যাপন করেছি তারই কথা মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করতাম। কী সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল সেই মৃদুতর্কগুলি!—আর মহাত্মা গান্ধী গভীর সম-মর্গিতার সঙ্গে কবির প্রতি আমাদের অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধার ভারটি উপলব্ধি করতেন। কবির সঙ্গে দেখা করার তাঁর প্রবল আগ্রহ গান্ধীজি প্রায়ই আমাদের কাছে বাস্তব করতেন। এইভাবে আমরা সকলে একই ভালোবাসার বৃত্তে জড়িয়ে গেলাম।

॥ দ্বিতীয় ॥

এইবার আমি পূর্বস্মৃতির জগৎ থেকে ফিরে আসছি গত এপ্রিলের ঘটনা। আগেই বলেছি, আমি তখন কেপটাউনে—সেখানেই পেলাম কবির জন্মদিনে অভিনন্দন লেখার আহ্বান ‘গোল্ডেন বুক অফ টেগোর’ গ্রন্থের জন্য। লোরেঞ্জো মাকুইস স্টীমারে ভারতবর্ষের ডাক তখনই ছাড়ছে—এবং দঃ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের দিকে বেশ কিছুদিন আর কোনো স্টীমার ছাড়বে না। কাজেই আমার মনে হলো যদি আমি কবির জন্মদিনে দেরি করতে না চাই তাহলে আমাকে এক্ষুনি লিখতে বসতে হবে। আমার জীবনে কবি কী অর্থ বহন কবে এনেছেন এবং কবির মহিমার প্রতি আমি কী গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করি—এই সব কথা স্মরণ কবতেই আমার অন্তরের অন্ততল থেকে নানা চিন্তা উঠতে লাগল:—তারই কিছু কিছু কথা লিখতে চাই।

কৃষ্ণকায় অনাথ বালকদের আশ্রয়স্থল ‘দি হাউস অফ সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি’-তে বসে আমি কথা-গুলি লিখে ফেললাম। আফ্রিকানদের মধ্যে যে-সব অনাথ ও অরক্ষিত শিশু আছে তাদেরই জন্য ফ্র্যাটস অন্তবীপে এই আশ্রমটি নির্মিত হয়েছিল। আমি যখন বসে বসে লিখছিলাম তখন তারা সবাই আমার চারিপাশে হৈ হৈ করে খেলা করছিল। তাদের উচ্ছল কলধ্বনি শুনতে শুনতে আমি যেন মনে মনে শান্তিনিকেতনেই ফিরে গেলাম। সুন্দর বাংলাদেশে তাঁর নিজের আশ্রমটিতে হাসিখুশি শিশুদের মধ্যে উপবিষ্ট কবিকে

আমি সহজেই সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি বলে চিহ্নিত করতে পারলাম। সেখানে সবচেয়ে ছোট ছেলটি বা মেয়েটিও প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনুরাগী। প্রায় কুড়ি বছর ধরে কবি আমার কাছে যথার্থই ‘গুরুদেব’ হয়ে উঠেছিলেন। খেলাধুলায় মত্ত শিশুদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তারই অনুরাগ-রঞ্জিত স্মৃতি সর্বাগ্রে আমার মনকে অধিকার করল। কেমন করে এর শ্রুতি সেই কথাই এই ‘জন্মদিন-সংখ্যা’য় আমি বলতে চাই।

॥ তিন ॥

হ্যাম্পস্টেডহীথ-এর নিকটস্থ পাহাড়ের ওপর উইলিয়াম বদেনস্টিনের বাড়িতে এক রাতিতে কবির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। নৈভিনসন আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। পথে তাঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা—কথায় কথায় তিনি আমাকে জানানেন যে, রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিলেন যে, বদেনস্টিনের বাড়িতে সেদিন রাতে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। সেদিন ছিল ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। আমি বিপুল আগ্রহে প্রায় উত্তেজিতভাবেই নৈভিনসনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কবির দর্শন পাবার জন্যে পাহাড়ের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। ইয়েটস যে-কবিতাগুলো আবৃত্তি কবলেন সেগুলি সব গীতাজলি থেকে নেওয়া—শুনতে শুনতে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেদিন যা ঘটেছিল ভাষায় তাব বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। কবিতাগুলির সংগীতরংগকার আমার আবিষ্ট করে দিল এবং তাদের সৌন্দর্যে আমি মূগ্ধ হয়েছিলাম। কবি নিজেকে ছিলেন পিছনে, লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে। আমার বেশ মনে পড়ছে, কবির চরণ স্পর্শ করার জন্যে সেই মৃদুতর্কটিতে আমি কী গভীর আগ্রহ বোধ করেছিলাম। সেই আলোকিত কক্ষ কবির সান্নিধ্য এবং তাঁর কবিতাব সংগীতগুঞ্জন থেকে শেষকালে বেরিয়ে এলাম বিলম্বিত সন্ধ্যার গোধূলি আলোয় এবং হ্যাম্পস্টেডহীথের ওপর দিয়ে একা একা হাঁটতে লাগলাম। আকাশে তখন সবে চাঁদ দেখা দিয়েছে—বাতাসে এক মোহময় আবেশ। পৃথিবীর ওপর ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিষে আসছে, পশ্চিম দিগন্তে তখনও সুবর্ণস্নাত-কালের রক্তরাগ দৃশ্যমান। এর সমস্ত জ্যোতি যেন এসে

পড়েছে আমার ওপর—আমি আমি সেই উচ্চভূমির বন্ধুর
পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই মূহুর্তে
সত্যি সত্যিই স্থান কাল এবং বহির্বস্তুর চেতনা আমার
মধ্যে লোপ পেয়েছিল। আমার সমস্ত আত্মার দৃষ্টি
দিয়ে আমি সৌন্দর্যের মর্মরূপ প্রত্যক্ষ করলাম—সেই
দেখা অনিত্য ও জড় পৃথিবীর সমস্ত সীমার বন্ধন
অতিক্রম করে গেল।

এই অলৌকিক অনুভূতির আনন্দ কখনও একেবারে
নিঃশেষ হয় নি। দীর্ঘ অদর্শনের পর যখনই আমি
কবির সান্নিধ্যে আসি তখনই অনিবার্যভাবে এই আনন্দের
স্মৃতি ফিরে পাই। বিশ্বব্যাপী এই নব সৌন্দর্যচেতনার
রহস্যলোকে তিনি আমার নিজে গেছেন। সেই প্রথম
দর্শনের পর থেকেই আমি তাঁর চোখের আলোর এই
সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি—তাঁর গানের মধ্যে,
তাঁর আশ্রম-জীবনের মধ্যে।

কবির দর্শনলাভের পূর্বে আমার জীবনের কথা যাঁরা
জানেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন কী ভাবে এইখানেই সেই
দুয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাগ-রেখা আঁকিত হলো।
কবির সঙ্গে সেই প্রথম দর্শনের পরিণতিতে অভিনব ও
ভিন্ন এমন কিছু ঘটল যাতে করে আমার সমগ্র দৃষ্টি-
ভঙ্গীতেই পরিবর্তন এলো। সেই সময় পর্যন্ত বাহ্য-
নিয়মের জড়ত্বের যে-বন্দিশালায় আমি আবদ্ধ ছিলাম,
তিনি তাকে চূর্ণ করে আমার মুক্ত করে আনলেন। কী
করে এ-সব সম্ভব হলো তা আমি বলে বোঝাতে পারব
না, কিন্তু তার ফল তো চোখেই দেখা যাচ্ছে। তাই সব
মানুষের মতোই আমি মনে করি যে, সেদিন আমার মনে
যে-পরিবর্তন এসেছিল তার জন্য আমি একমাত্র তাঁরই
কাছে ঋণী এবং সকল মানুষের তুলনায় এই মানুষটির
কাছেই আমার সর্বাধিকপরিমাণ প্রেমের ঋণস্বীকারের
সুযোগ যখনই পাই তখনই আমার অন্তর অলৌকিক
আনন্দে ভরে ওঠে।

II চার II

কবির চরিত্রের কোন বরণীয় গুণের জন্য আমি তাঁর
প্রতি সর্ব থেকে বেশি অকর্ষণ বোধ করি, এ-কথা যদি
আমাকে কেউ বিশ্লেষণ করতে বলে, তাহলে আমি

প্রথমেই যা উল্লেখ করব সে হলো স্বাধীনতার প্রতি
কবির নির্ভয় প্রীতি এবং সত্যের প্রতি তাঁর অবৈগ-
দীপ্ত অনুরাগ। এবং এরই জোরে আত্ম ও জীবনের
প্রান্তসীমায় এসেও কর্মে ও চিন্তায় কবিই হচ্ছেন
আমাদের যুগের দঃসাহসিকতম অভিযাত্রী। অনন্ত-
যৌবনের রহস্য তাঁর আয়ত্ত। অনুক্ষণ তিনি নিজের
মধ্যে শিশুর হৃদয়টিকে রক্ষা করে চলেছেন এবং
ভবিষ্যতের প্রতি অক্ষুণ্ন রেখেছেন নবাগতের কৌতূহল-
ভরা দৃষ্টিভঙ্গী। অবৈগ আশা আর ভালোবাসায় তাঁর
অন্তর পরিপূর্ণ। অবিবাস্য যন্ত্রণার বেশে দঃখ তাঁর
কাছে এসেছে। তাঁর মতো তাঁর বেদনার সঙ্গে আব
কউকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর
নয়নসম্মুখে আদর্শের স্থির দীপ্তি এবং আশা ও
বিশ্বাসের নবযাত্রাপথ বিরাজমান ততক্ষণ তিনি আদর্শ-
লোকে পৌঁছবার প্রেবণায় তাঁর অতিমার্জিত প্রকৃতির
সাহায্যে দঃসহ দহনকেও অবলীলাক্রমে সহ্য করতে
পারেন। আজ তাঁর বার্ষিকের দিনগুলিতেও তিনি
নির্মিথ্য এক মূহুর্তে অনিবার্য দঃরূহ বেদনার ভার
বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে জানেন।

আদর্শের রূপ তাঁর কাছে চিরসমুদ্রত, চিরভাস্বর
এবং চিরমহিমাম্বিত। বর্ণ ও সুরের প্রতি জীবনের
সংগীত এবং নাট্যের প্রতি তাঁর কবিসুলভ সুগভীর
আকর্ষণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে সব-
সময়েই দেখা যায় এক কঠিনতা, তার শূচিতা রক্ষায়
হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়িও দেখা যায়। কারণ তাঁর সব-
সময়ই ভয় পড়ে আদর্শ অবনিমিত হয় অথবা লক্ষ্য হয়
নিম্নগামী। তাঁর লক্ষ্যভূত সৌন্দর্যচেতনা রূপায়ণের
হীনতায় মলিন হয়ে যাবে, এ তিনি এক মূহুর্তেও
চিন্তা করতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে
রাখতে হবে যে, কবির নীতিনিষ্ঠ আদর্শচেতনা কখনোই
নিয়মের অন্ধ অনুবর্তী অথবা প্রথাসর্বস্ব নয়। এর
ভিত্তি হলো এক অপ্রান্ত সহজ সৌন্দর্যচেতনা। ধ্রুপদী
শিল্পীর নিপুণ অঙ্গলিপ্পর্শে নিখুঁত বাদ্যযন্ত্রে যে-
সুরতরঙ্গের সৃষ্টি হয় এ-যেন তারই সঙ্গে তুলনীয়।
একটুখানি বেসুরো হলেই এখানে সংগীতের সমাধি।
এই অসংগতি শিল্পীর অন্তঃচেতনায় আঘাত করে এমন
এক তাঁর বেদনার জন্ম দেয় যার উপলব্ধি স্বল্প
অনুভূতিশীল ব্যক্তিদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

॥ পাঁচ ॥

জাপানে আমি নিজের চেখে একটা ঘটনা দেখে-
ছিলাম—তার কথা আমার মনে এখনো জ্বলজ্বল করছে।
কবি যখন সেই দেশে ছিলেন তখন তাঁকে একটা ক্ষুদ্র
কবিতা লিখতে বলা হয়েছিল। তার বিষয় ছিল
প্রতিশ্রুত দ্বীপ সম্প্রদায়ের দ্বীপ প্রধানের অনুরোধিত
কোনো হিংসাত্মক কাজ। হাকোনের কাছে উঁচু পাহাড়ে
ঘাসে-ঢাকা এক মাঠের ওপর তারা দুজনে সকাল থেকে
সম্মুখ পর্বত লাড়াই করেছিল। বিরাট এক পাথরের
ছায়ায় ঢাকা ছিল সেই জয়গাটি। দিনাবসানে সূর্য
অস্ত গেল—যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত দেহে
দুই যোদ্ধাই নিহত হলো;—আর সমস্ত জয়গাটাই
তাদের রক্তে লাল হয়ে গেল। সেই জয়গায় কবির সঙ্গে
যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হোমরা-চোমরা জাপানীরা
এই বীরত্ববঞ্জক ঘটনাটির স্মরণে স্বল্পকথায় একটি
ক্ষুদ্র কবিতা লেখার জন্য কবিকে অনুরোধ করলেন।

ঘটনাটির ষষ্ঠাংশ রূপ উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই,
আমি স্পষ্ট দেখলাম, কবির মূখে কী তীর যন্ত্রণার
ছাপ এবং সভয়ে তিনি আপন মনের মধ্যে নিজেকে
গদাটিয়ে নিলেন। মূহুর্তের মধ্যে তিনি এই কথাগুলি
রচনা করে ফেললেন :

“ঘৃণায় অশ্ব হয়ে তারা দুজনে

পরস্পরকে যুদ্ধে করল হত্যা,

আর ঈশ্বর লজ্জায় তাদের লাল রক্ত ঢেকে দিয়েছেন

তাঁর সবুজ ঘাস দিয়ে ॥”

এই চিন্তার সূক্ষ্মা সূক্ষ্ম এর সাহসের সঙ্গেই
তুলনীয়। নবজীবনের পূর্ণতার উপলব্ধিতে চিরনবীন,
চিরসবুজ এবং দৃষ্টির স্বরূপজ্ঞানে কোমল পেলব তাঁর
সত্তা বারবার আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে এবং
আমার অন্তঃপ্রকৃতিকে তাঁর গতিময় করে তুলেছে।

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব যখন কোন অপ্রত্যাশিত মহত্ব
নিয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে তখনই ডেভিডের
প্রার্থনাগ্রন্থের একটি উক্তি আমার মনে পড়ে।
ঈশ্বরকে সম্বোধন করে এই সংগীতরচয়িতা বলেছেন :
‘তোমার নম্রতাই আমাকে করেছে মহীয়ান’। কবির
পক্ষেও এই চরণটি সত্য। এক দিব্য নম্রতাই তাঁর মহত্ত্বের
গূলে। ক্ষুদ্র এক শিশুর মতোই তিনি নমনত। তাঁর
অন্তরস্থ অমর আত্মা তাঁর শিশুসুলভ অনুভূতিকে
অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং তারই ফলে জন্ম নিয়েছে সার্বক
প্রতিভার সার্বভৌম প্রেরণা।

সারমন অন দি মাউন্টে একটি সুন্দর অর্ধবহ উক্তি
অছে। তার চেয়ে সুন্দর করে আর কিছুতেই আমার
পক্ষে এই চিহ্নটি সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর নয়। সেই
উক্তিটি হলো : “হৃদয় যাদের পবিত্র তারাই ভাগ্যবান
কারণ ভগবদ্দর্শন তারা পাবেই” তাঁর নিঃপাপ ও
শিশুসুলভ হৃদয়ের অঙ্গান দর্পণেই ঈশ্বরের মূর্তি
প্রতিফলিত।

আমার মনে আশা আছে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। অনেকদিন আগেই তা হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহ ঐ লক্ষ্যের দিকেই আমাদের নিম্নে চলেছে। ১৯৩৫ সালে বে বাধা দেখা দিয়েছিল আজ সেই বাধা দূর করতে ইংলন্ডের সিদ্ধি ও প্রেরণা সম্মিলিত হচ্ছে। ন্যায়-সম্মত চিন্তার পথে এ্যাংলো স্যাক্সন মন যেমন শিথিল, বাস্তব ফলাফলের ক্ষেত্রে তা তেমনি দ্রুত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদি মৌখিক প্রতিশ্রুতি না থেকে ঘটনায় পরিণত হয় তাহলে সমস্ত পৃথিবীতে ইংলন্ডের সম্মান ও শক্তি বাড়বে।*

[২]

যখন থেকে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তখন থেকেই আমার এই প্রতীক্ষার দিনগুলি ঈশ্বরের চিন্তায় পূর্ণ হয়ে আছে—আমি জানি যাই ঘটুক তব মধ্য দিয়ে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। রোজই সেই একই প্রার্থনা করি—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এমনি করে আমার মনের শান্তি আমি বজায় রাখতে পেয়েছি—সে কক্ষে আমার পরম সহায় গুরুদেবের চিন্তা, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা আর মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া জীবনচর্যা। সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়েছে হ.সপাতালে মেট্রোপলিটানের নিত্য আগমন। তাঁর গভীর খুঁটান বিশ্বাস আমার গভীর

* ১৯৪০ সালের নববর্ষের বাণী। এরপরে এন্ড্রুজ সাহেবের আব কোন প্রকাশ্য ঘোষণা নেই।

* তাঁর শেষবারের অপারেশনের আগে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে এন্ড্রুজ সাহেব যে বাণী মূখে বলেন তাব অনুবাদ। যদি ভালোমন্দ কিছু ঘটে তো এই বাণীটি

যন্ত্রণা ও শারীরিক দুর্বলতার মধ্যে কি আশ্চর্য শক্তি দিয়েছে। এই কদিনে তিনি আগের চেয়ে আমার কত প্রিয় হয়েছেন। একথা জেনেছি ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসার যোগে তাঁর হৃদয় আমার সঙ্গে বাঁধা।

আমার জীবনে ঈশ্বর তাঁর সবচেয়ে বড় দান আমাকে দিয়েছেন—গভীরভাবে ভালবাসে এমন বন্ধু দিয়েছেন। ঠিক এই মূহুর্তে, যখন ঈশ্বরের হাতে জীবন সমর্পণ করেছি তখন আমি আর একবার, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বন্ধুদের যে দান পেয়েছি, তা কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করি। যারা ভারতবর্ষে আমার খুব কাছ তাদের কথা যখন লিখছি যারা আমার প্রিয় ইংলন্ড থেকে ক্রমাগত চিঠি আর টেলিগ্রাম দিয়ে আমাকে আত্মিক সাহায্য করেছে তাদের কথাও তখন আমি মনে রেখেছি। ঠিক এমনি করেই পরমাত্মার সাহায্য আমি পেয়েছি পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার বন্ধুদের কাছ থেকে—যারা আমাকে মনে রেখেছেন।

কিন্তু এই শায়িত অবস্থাতেও আমার আশা আব প্রার্থনা আমার নিজের পীড়নের জন্য নয়—আজকে সমস্ত পৃথিবী জোড়া মানুষের দুঃখের তুলনায় আমার ব্যথা কতটুকুই বা। প্রতিমূহুর্তে আমি প্রার্থনা করেছি ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক তাঁর ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয় পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হোক।†

গুরুদেবের হাতে যেন পোছে দেওয়া হয় এই ছিল তাঁর নির্দেশ।

৬.৪.৪০ তারিখে পূর্ব থেকে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিটি লেখেন তাতে মৃত্যুর পূর্ব-বস্থায় এন্ড্রুজ সাহেবের মনের অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে।

শুদ্ধ ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত মানবজাতি এণ্ড্রুজের মৃত্যুতে তার একটি সুসন্তান ও সেবকে হারালো। তবু মৃত্যু তার কাছে বেদনা থেকে মুক্তি, ইহজীবনের কর্তব্যের পরিপূর্ণতা। যারা তাকে প্রত্যক্ষ জেনে-ছিলেন, কিংবা জেনেছিলেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের মধ্যেই তিনি বাঁচবেন। আমার মনে হয় চার্লি এণ্ড্রুজ একজন শ্রেষ্ঠ ইংরাজ। এবং ইংলন্ডের সুসন্তান বলেই তিনি ভারতবর্ষেরও সন্তান হতে পেরে-ছিলেন। এ সবই তিনি করেছিলেন মানবতার জন্য, তাঁর প্রভু বীশ্বকৃষ্ণের জন্য। সি. এফ. এণ্ড্রুজের চেয়ে একজন ভালো মানুষ বা মহন্তর খুঁটান আমি দেখিনি। ভারতবর্ষ তাকে দীনবন্ধু নামে ভূষিত করেছিল। এই নামেরই যোগ্য ছিলেন তিনি—সর্বস্তরের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু।

আমার মত ভালো করে তাকে বোধহয় কেউই জানে নি। গুরুদেব তাঁর গুরু ছিলেন। আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় যে দেখা হয়েছিল সে দুই ভাইয়ের দেখা, শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই সম্পর্কই ছিল। এ শুদ্ধ একজন ইংরাজ ও একজন ভারতীয়ের বন্ধু ছিল না। তা ছিল দুই সত্যসন্ধানী সেবকের অচ্ছেদ্য ঐক্য-বন্ধন। কিন্তু এণ্ড্রুজের পবিত্র স্মৃতিকথা আমি এখনে বলতে বসিনি। ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের এই পরম সেবকের মৃত্যুর স্মৃতি আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকতে থাকতেই আমি ইংরাজ ও ভারতবাসীদের গভীরভাবে চিন্তা করতে বলবো আমাদের দুই জাতির

জন্য কি তিনি রেখে গেলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজের চেয়ে ইংলন্ডকে তিনি কম ভালবাসেন নি; সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের চেয়ে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর ভালবাসা অম্প ছিল না—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর শেষ শব্দ্যতেই তিনি বলেছিলেন, “মোহন, স্বরাজ আসছে। ইংরাজ আর ভারতীয়েরা ইচ্ছা করলেই স্বরাজ আনতে পারে। অজকের যারা শাসক, বা যে সব ইংরাজের কোন গুরুত্ব আছে এণ্ড্রুজ তাঁদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। রাজনৈতিক মনের প্রত্যেকটি ভারতবাসী তাকে চিনতো। এই মৃহুর্ভে ইংরাজের অপকর্মের কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না। একদিন হয়তো সে সব কথা ভোলা যাবে, কিন্তু এণ্ড্রুজের বীরত্বপূর্ণ কাজের একটিও আমরা ভুলবো না যতদিন ইংলন্ড আর ভারতবর্ষ থাকবে। যদি সত্যি সত্যি এণ্ড্রুজের স্মৃতিকে আমরা ভালবাসি তা হলে ইংরাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা সম্ভব নয়— কারণ সবচেয়ে ভাল আর মহন্তমদের মধ্যেই তো তিনি একজন। শ্রেষ্ঠ ইংরাজ আর শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষীয় পরস্পরে যতক্ষণ না উভয়ের মনোমত একটি পথ নির্ধারণ করতে পারছে ততক্ষণ বিচ্ছিন্ন হবে না, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। এণ্ড্রুজের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের জন্য আমাদের এই চেষ্টা করা উচিত। আজ যখন তাঁর সেই সদা প্রফুল্ল মৃদু স্মরণ করছি তখন এই কথাই বার বার মনে আসে। আর মনে পড়ে স্বাধীন জাতির সমকক্ষ আসন ভারতবর্ষ যাতে পায় তারই জন্য, ভালবেসে তিনি কত কাজ করেছিলেন।

চিরপথিক এন্ড্রুজ

রোমাঁ রলাঁ

এপ্রিল, ১৯২০—লন্ডনে এসে কমন্স সভায় ই, ডি, মোরেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা গেল। গত বছর উনি চার্চিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিরাট সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেছেন। কথোপকথনের মধ্যে মোরেলের একটি কথার জ্ঞান গেল এন্ড্রুজ এখন লন্ডনে। গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এন্ড্রুজ—গান্ধীজীর বিষয়ে লেখার সময় আমার কাছে তিনি কত মূল্যবান। আমরা ওঁকে তৎক্ষণাৎ সিসিল হোটলে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করলাম। (উনি আছেন খুব কাছেই—স্ট্রান্ড, পোলক হোটলে)। উনি এসে আমাদের সঙ্গে ঠা মের বিকেলটা কাটলেন। ছোট্ট মানুষটি—গোল মাথা, পুরুদাঁড় একজোড়া গের্ফ, আর কাঁচাপাকা দাড়ি। মিশনারীসুলভ গম্ভীর আর মৃদুস্বভাব। (ওঁকে দেখে আমার প্রায়ই যীশুখৃষ্টের আদি শিষ্যদের একজন বলে মনে হয়)। শান্তভাবে, খুব ধীরে ধীরে হাসিমুখে কথা বলেন। স্কচ হাইল্যান্ডের লোক, কুড়ি বছর যাবৎ ভারতবর্ষে আছেন। ১৯১০-১৪ সালে ওঁকে ভারতবর্ষ থেকে ট্রান্সভালে গান্ধীজীর হয়ে কাজ করতে পাঠানো হয়—গান্ধী তখন জেলে। এন্ড্রুজ তাঁর জীবন আর দৃষ্টান্তের সঙ্গী হন; ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসংঘের সরকার আর গান্ধীজীর মধ্যে যে সন্তোষজনক সম্মি স্থাপিত হয়, তাতে এন্ড্রুজের বিচক্ষণতা আর বৃদ্ধির যথেষ্ট অবদান ছিল। পূর্বে আফ্রিকাতে আবার নতুন করে ভারতীয়দের উপর উৎপীড়ন সূত্র হয়েছে, তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্যে আর ব্রিটিশ রাজ-নীতিকরা যাতে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন সেই চেষ্টার জন্যে উনি এবার ভারত থেকে এসেছেন। গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র এন্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন।

ওঁর মতে যতক্ষণ অবধি গান্ধী তাঁর অবিচলিত

ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলতে শুরু না করেন ততক্ষণ মনে হয় উনি নিতান্তই বিশেষত্ববর্জিত চেহারার একটি ছোটখাট মানুষ। তাঁর অচরণে কঠোরতার লেশমাত্র নেই, শিশুর মতন হাসেন আর শিশুদের বড়ো ভালোবাসেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর একবার শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি তাদের সঙ্গে মৃটিতে শুষেই কিছক্ষণ কাটান। একটি শিশুর মৃত্যুতে এন্ড্রুজ তাঁকে ভয়ানক কষ্ট পেতে দেখেছেন। চরম তাঁর কৃচ্ছসাধন। এন্ড্রুজকেও একনজর দেখেই বোঝা যায় যে অভাব আর শারীরিক কষ্টস্বীকারকে তিনি গ্রহণ করেন না—সেই এন্ড্রুজও হেসে বললেন যে গান্ধীজীর সহচর হিসাবে আফ্রিকায় থাকবার সময় জীবনযাত্রা খুবই কঠোর ছিল। জীবনকে প্রস্তুত হতে হবে দুঃখ সহিতে, শহীদ হতে, ফাঁসিকাঠের সামনে যেতে, এই হল গান্ধীর নীতি। আর বাংলাদেশে উনি এর আশ্চর্য ফল দেখেছেন। এখন জেলে থেকেও উনি খুসী, উনি চাননা যে কেউ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। উনি নিজেই পবিত্র করছেন, প্রার্থনা করছেন—ওঁর বিশ্বাস এই পন্থাই ভারতবর্ষের জন্যে কাজ করবার পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী। প্রস্তুত তাঁর বন্দীত্বের ফলে দেশের যে যথেষ্ট লাভ হচ্ছে এ বিষয়ে এন্ড্রুজের কোন সন্দেহ নেই। একদিকে, এর দরুন ভারতবর্ষের হৃদয়াবেগ জেগে উঠেছে, গান্ধীর মধ্যে ভারত শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করছে। (পূরণে আছে, শ্রীকৃষ্ণ বন্দী হয়েছিলেন, আর অলৌকিক উপায়ে সেখান থেকে নিষ্কান্ত হন), সর্বোপরি গান্ধীর কারাদণ্ডের দরুন হিন্দু আন্দোলন বাধা হয়ে স্থগিত রয়েছে—তাতে হিংসাত্মক কাজের বিপজ্জনক সম্ভাবনাকে ঠেকানো গিয়েছে। আসলে গান্ধীর অধিকাংশ অনুগামী বিশেষতঃ আলি-দ্রাহ্মবরের রাজনীতিতেই যথার্থ বেত্রক। এন্ড্রুজের মতে তাঁর প্রেরিত শিষ্য বোধ হয় তাঁর চর্চাশ

বছরের ছেলে। (তাঁর চার ছেলে।) তাছাড়া সম্পাদক গণেশকে এণ্ড্রুজ একজন নিতান্ত অনুরক্ত শিষ্য বলে মনে করেন। শ্রীমদ্ভা গান্ধীও ভরি ভালো। খুব সাদা-সিঁদা আর তেমনি তাঁর সাহস। স্বামীর দঃখকণ্ঠের অংশ নিতে কখনো স্বেচ্ছা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ভারতে ফিরবার অব্যবহিত পবেই গান্ধীজীব সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয় তার একমাত্র সাক্ষী এণ্ড্রুজ। উনি ওঁদের দুজনকে পরস্পর বিরোধী দুই ভারতীয় জাতির দুই প্রতিভূরূপে বর্ণনা করলেন—পশ্চিম ভারতীয় গান্ধী যে জাতিভুক্ত তার কল্পনা-শক্তি নগণ্য, বাস্তববান্ধি অতি প্রখর। রবীন্দ্রনাথ এর ঠিক বিপরীত। তাঁদের আলোচনার প্রথম বিষয় ছিল পৌত্তলিকতা। গান্ধী একে সমর্থন করেন কারণ জন-সাধারণ চট করে বিমূর্ত ধাবণার নাগাল পেতে পড়েন না বলেই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু জনসাধারণকে চিরকাল শিশু বলে গণ্য করা হোক, তা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই মানতে চান না। প্রতীক সম্বলিত পতাকার মাধ্যমে ইউরোপে কত বড় বড় কাজ হয়েছে, গান্ধী তার কথা তুললেন। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেন। গান্ধী প্রত্যুত্তরে ইউরোপের যে পতাকার ঈগল ইত্যাদি রয়েছে, তাঁর নিজের চরকাচিহ্নিত পতাকা ইত্যাদির কথা তুললেন। আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ। গান্ধী তার স্বপক্ষে বললেন যে, জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়েই আন্তর্জাতিকতাতে পৌঁছানো সম্ভব—যেমন যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই শান্তিতে উত্তীর্ণ হতে হয় (কি ভয়ানক যুক্তি)। এর জন্যেই তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদলে সৈন্যসংগ্রহের জন্যে এত কাজ করেছেন। এণ্ড্রুজ তাঁকে এর থেকে নিরস্ত করবার জন্যে কুড়িখানা চিঠি লেখেন, কিন্তু গান্ধী তাতে একবারও ধামেন নি।

গান্ধীর সঙ্গে সেন্টপল আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্লেটোর যে তুলনা আমি করছি, এণ্ড্রুজ তা সমর্থন করেন। হেসে বললেন, গান্ধী সত্যিই হুবহু সেন্টপলের মত।

রবীন্দ্রনাথের কথাও উনি এমনি অনেকক্ষণ ধরে বলেন—তাঁকে একাধারে ভক্তি করেন, ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথের 'পিতৃমহ' ছিলেন 'প্রপন্স'—তিনি নিজের সব ঐশ্বর্য উড়িয়ে দেন, কেবল ছেলের জন্যে খানিকটা বেশ সন্দেহজনক উপায়ে সন্নিবেশ রাখে সক্ষম হন।

তাঁর পুত্র (রবীন্দ্রনাথের পিতা) সে টাকা কিছুতেই গ্রহণ করেন নি। তা তিনি পাওনাদারদের দিয়ে দেন। এই সত্যতঃ অভিজ্ঞতায় হয়ে তারা তাঁকে তাঁর পিতার সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। বছর-কয়েক বাদে স্বীয় বিচক্ষণতার দ্বারা তিনি সমস্ত ঋণ শোধ করে সম্পত্তি উদ্ধার করতে সমর্থ হন—পঞ্চাশ বছর বয়সে সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি তীর্থযাত্রা করেন। আজকে যার নাম শান্তিনিকেতন—সেই নন্দ, সৌন্দর্য-হীন প্রান্তরে দুটি গাছের তলায় বসে তিনি এক দিব্য-জ্যোতিব প্রসাদ লাভ করেন। সেখানেই থেকে গেলেন তিনি। পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলে রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে সেখানে যেতেন আর তাঁর পিতার উপাসনায় সময়ে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। জমির মালিক মহর্ষির ধর্মভাবে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সে জমির স্বত্ত্ব উপহার দেন। কথিত আছে একবার মহর্ষি উপাসনায় বসেছেন এমন সময়ে এক ডাকাত তাঁকে নতজানু অবস্থায় দেখে মনে করে তিনি এক গদ্যস্তম্ভের স্তূপের উপর বসে রয়েছেন—সে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু উপাসনারত সেই অপরূপ মুগ্ধতায় দেখে সে নিজ অভিপ্রায় ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেয়।

রবীন্দ্রনাথকেও মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রার নেশায় পেয়ে বসে। নিজের পরিবার ও বন্ধুদের গভীরভাবে ভালোবাসলেও তিনি পায়ে হেঁটে বা নৌকা করে বেবিয়ে পড়েন—কন্সাস ধরে তাঁর আর দেখা পাওয়া যায় না। অল্পবয়সে অন্ততঃ উনি এমনি ছিলেন। তাঁর বিশ্বভারতীর সমর্থনে সকলের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তিনি সারা ভারতবর্ষবাপী যে সফর করেছেন তার দরুণ এখন তিনি বড়ই পবিত্রাণত। এই বিশ্ববিদ্যালয় পুরোদমে বেড়ে চলেছে। সেখানে নিয়মেব কোন কড়াকাড় নেই। আর গান্ধীজীর আশ্রমে সবকিছু প্রায় সামরিক বিধির মতো কঠোর নিয়মের অধীন—এ যেন কৃচ্ছ্রসাধনের এক সামরিক শিক্ষালয়।

কালিদাস নাগের কাছে আমরা ভারতীয় রসবোধের যে পরিচয় পেয়েছি এণ্ড্রুজও আমাদের তার সম্বন্ধে নিশ্চিত করেন (ইউরোপীয়দের কাছে যেসব প্রাচীন গ্রন্থ অতি গুরুগম্ভীর, তাতেও এর দেখা মেলে)—তিনি বলেন যে, প্রথম যখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেন তখন তিনি মূগ্ধ একেবারে দুর্ভেদ্য গান্ধীজীর দ্যাব

ফুটিয়ে রাখাই সমীচীন বলে মনে করেন। কিন্তু গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে একটি রসিকতা করেন -- আমাদের বলতে বলতেই উনি হেসে ফেলেন, কিন্তু সে রসিকতা আমাদের শোনালেন না।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে কত স্নেহ করেন আর আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি কত উৎসুক, এন্ড্রুজ আমাকে সে কথা বারবার বলেন।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৪—ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পিয়াস'নের কট হয় বাংলাদেশে—মাত্র মাস-চারেক ছাড়া বাকি সময়টা তাঁর অসহ্য বোধ হয়। এন্ড্রুজের কিন্তু শীত বা গ্রীষ্মে কিছু হ্রক্ষেপ নেই—দিনের সব চাইতে গরম সময়টাকেই তিনি বাইরে বেরোনার পক্ষে প্রশস্ত মনে কবেন; আর রবীন্দ্রনাথ তো রোদের মধ্যেই সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ থাকেন।

এপ্রিল, ১৯২৪—সি, এফ, এন্ড্রুজ শান্তিনিকেতন থেকে ২২শে মার্চ তারিখে ইংরিজীতে এই চিঠিখানি লেখেন :

“প্রীতিভাজনেষু—এখন আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে রয়েছি। আজ দেড় মাসেরও বেশী হ'ল তিনি অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত—প্রথম থেকেই আমি তাঁর কাছে আছি। ও'র কাছে থাকা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় বলেই বোধ হয়েছে। ও'র জীবন এতাই আশ্চর্য সুন্দর, তা প্রতিদিন লক্ষ্য করবার মতো। অন্যের জন্য আত্মত্যাগ আর চিন্তায় পরিপূর্ণ নয় এমন কিছুই তাতে নেই। মনে হয় তাঁর মধ্যে আত্ম-চিন্তার যেন চিহ্নমাত্র নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করাও খুবই আনন্দের। কিন্তু সেখানে মনে হয় তিনি যেন তাঁর অন্তর্জীবনকে তাঁর নিজের সঙ্গে আলাপেরতরুপে দেখতে পান, আর নিঃসঙ্গতার মধ্যে একান্তভাবে তাঁর অন্তরের শান্তি উপলব্ধি করেন। মহাত্মাজীর ক্ষেত্র অপরের জন্যে গভীর আবেগই সবচেয়ে প্রধান—যে আবেগের তুলনা মেলে খুঁটের মধ্যে। আমি একথা বলতে চাই না যে আমাদের গুরুদেবের জীবন স্বার্থলেশশূন্য নয়—যতদূর তা হওয়া সম্ভব, সে রকম। কিন্তু এখানে এই আত্মপরায়ণতার অভাব মানে, তিনি সর্বদা যে অন্তর্লোকে বাস করেন, অন্যদের সাহায্য করবার জন্যে আর দৈনন্দিন জীবনের কাজ করবার জন্যে তার থেকে বেরিয়ে আসা। উনি আমাকে বলেছেন যে, যখন উনি মাসের পর মাস গঙ্গার ওপর

বজ্রায় কেবল ভগবন আর প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ করে কাটাতে পেরেছেন, যখন রাতের পর রাত জেগে এই আলাপে এমন গভীরভাবে মগ্ন থেকেছেন যে আহা-নিদ্রাও বাহুল্য বলে মনে হত, সেই দিনগুলিই তাঁর সবচাইতে আনন্দের ছিল। অন্তরঙ্গভাবে নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি আমাকে বলেছেন, আজকে কাজের মানদ্বয় হয়ে তিনি যে নতুন জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাতে সেই দিনগুলির অভাব তিনি কত বেশী অনুভব করেন। এ তাঁর কাছে গভীর যন্ত্রণা—প্রায় ক্রুশবিশ্ব হবর সমতুল্য। কারণ সেই যুগে তিনি ছিলেন বাংলার বাইরে এক অজানা কবি। কিন্তু মহাত্মাজীর গভীরতম আকাঙ্ক্ষার বস্তু সেবা। এমনকি তাঁর নিজের ভয়ানক অসুস্থতার সময়েও তাঁকে অন্যের ছোটখাটো কোন কাজ করে দেওয়া থেকে ঠেকানো অতি শক্ত কাজ ছিল, যদিও তাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। দিনরাত উনি নিজের রোগশয্যার কাছে যত রোগী আছে সকলের কথা ভাবতেন। সেবিকাকে দেখে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত মনে হলে তার যত্ন নিতে হতো। এখন অবস্থা ধীরে ধীরে ভালর দিকে যাচ্ছে, উনিও আরোগ্যের পথে, তাই উনি দু'টি অসুস্থ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, যাতে তারা সমুদ্রের হাওয়া পেতে পারে। এসবে তিনি আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের ভূল্য। কিন্তু মননশক্তি মূলতঃ বাস্তবানুগ, আর তা বর্তমান কালের সবচাইতে জটিল সব সমস্যা নিয়ে বাস্তব থাকে। কিছুদিন আগেও আমি মনে করতাম যে তাঁর জীবনদর্শনে একেবারেই মধ্যযুগীয় (এখানে ওখানে এই মনোভাব অবশ্য চোখে পড়ে)। কিন্তু এক এক দিকে তিনি আজকের বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন। ভবিষ্যতের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছেন। সেই অর্থে তিনি অতি আধুনিক। এইসঙ্গে আমি আপনাকে ও'র সম্বন্ধে একটি ভাির সুন্দর গল্প পাঠাচ্ছি। এটি আপনাকে কতখানি মুগ্ধ করবে তা আমার অজানা নেই। আপনার অভিবাদন পেয়ে তিনি যে কত খুসী হয়েছেন কি বলব। আমি প্রায়ই ওঁকে আপনার আর আপনার বোনের কথা বলতাম। অনুগ্রহ করে তাঁকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাবেন। আপনারাও সঙ্গে কাটানো লন্ডনের সেই দিনটির কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

আপনার প্রীতিধন্য

সি, এফ, এন্ড্রুজ।”

(উক্ত গম্পটি ২৫শে ফেব্রুয়ারীর 'নিউ লীডার' থেকে উদ্ধৃত—সেখানে সার জগদীশচন্দ্র বোস বলেছেন তিনি আদিবাসী ভীলদের এলাকায় গিয়ে গান্ধীজীর একটি উক্তির বিপুল প্রভাবের সত্যতা নিরূপণ করেন। ভীলেরা আবহমানকাল থেকে শিকার করে জীবনধারণ করে আসছে। “অরণ্যকে শান্তিতে থাকতে দাও” মহাপুরুষের এই বাণীর পুনরুক্তি শুনে এই বনবাসীর দল যে কেবল শিকার করা ছেড়ে দিয়েছে তাই নয়, গৃহ-পালিত পশুদের খাটানোও বন্ধ করেছে। তাদের নিজস্ব পশুগুলিকে অন্যদের হাতে তুলে দিতে পারেনি, তাই সেগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে। সেন্ট ফ্রান্সিসের কাহিনীর কথা আরো বেশী করে মনে পড়ে যাচ্ছে।)

ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫—আসলে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কয়েকজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভক্ত আছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে সম্পূর্ণ বোঝেন না। কেউই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটির বেশী দিক বোঝেন না (বা স্বীকার করেন না)। এশ্বজ বোঝায় এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পান (দেখতে চান) কেবল ঋষি, শিক্ষক, দ্রষ্টা রূপে—আর তাঁর কবিসত্ত্বকে মানেন না। এমন কি এশ্বজ যে কুড়ি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথকে জানেন, এর মধ্যে একবারও তিনি তাঁকে তাঁর নিজের রচনা আবৃত্তি বা অভিনয় করতে শোনেননি। এশ্বজ ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যস্থরূপ—রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজীর মধ্যেও তিনিই যোগসূত্র।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮—এশ্বজ আজ সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটালেন। উনি জেনেভার একটি ধর্মীয় অধিবেশন (বৃন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্মীয়শক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধীয়) থেকে আসছেন, ইংলন্ড ফিরে যাবেন। এই চির পথিক যত অত্যাচারিতদের রক্ষা করে আর ভালবেসে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। গত কয়েকমাস উনি পায়ে এক হিমালয়ের বিছের কামড়ে বেশ গুরুতরভাবে অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এখন ওঁকে বরাবরের মতই সুস্থ সবল দেখাচ্ছে। ভারি শান্ত, কোমল কণ্ঠে কথা বলেন। যা কিছু দেখেছেন, সব কিছুই একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ সারা পৃথিবীতে ইনি যা দেখেন তা আর কেউ দেখেনি। ইনি আমাদের কাছে দ্বিবাঙ্কুরের গ্রিশ লক্ষ অস্পৃশ্য ভারতীয়ের এক সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেন; তাম্রাণ্ডিয়ার নামে অভিহিত। সম্প্রতি এরা নারায়ণ-স্বামী নামে এক বিখ্যাত গুরুদেবের ঐক্যবশ

হয়েছে। নারায়ণস্বামী রবীন্দ্রনাথের চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ (সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন)। ইনি গত কুড়ি বছর যাবৎ এক মহৎ ও পবিত্র ধর্ম প্রচার করে আসছেন। (এই আজই নটরাজন নামে তাঁর এক তরুণ শিষ্য জেনেভাতে তাঁর জন্মতিথি পালন করছেন। ইনি এক অস্পৃশ্য ভারতীয়, ইউরোপে পড়াশোনা করতে এসেছেন।) মনে হয়, এই অস্পৃশ্যরা ভারতবর্ষের ঐ অঞ্চলের বসবাসকারী বৌদ্ধদের বংশধর। তাঁদের ধর্মের পতনের পর তাঁদের জাতে পতিত বলে গণ্য করা হয়—কারণ এঁদের উত্তরভারতীয়সুলভ সুন্দর আর সুসমঞ্জস চোঁহারার সঙ্গে দক্ষিণের নিগ্রোয়েড অধিবাসীদের, বিশেষতঃ সেখানকার অতি দুঃস্থ অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের একেবারেই সাদৃশ্য নেই। এই দ্বিতীয় অস্পৃশ্য শ্রেণীকেও এশ্বজ জানেন। উনি বলেন অস্পৃশ্যরা চিরকালই গুরু প্রথা মেনে এসেছেন, আর এই অস্পৃশ্য গুরুরা বর্ণবৈষম্যবাহীনভাবে সমস্ত ভারতীয়দের শ্রম্যার পাত্র। কারণ যিনি সম্যাসী, ঈশ্বরের প্রিয় মানব, তিনি সমস্ত বর্ণভেদের উর্ধ্বে। মন্দিরের পথে আর তার চারিপাশে অস্পৃশ্যদের যাওয়া নিষেধ—সেই নিষেধের বাধা ভাঙবার জন্যে দ্বিবাঙ্কুরের থিয়ারা সম্প্রতি অহিংস আন্দোলন শুরু করেছে। এশ্বজ একবছর ধরে তাদের সঙ্গে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। চোন্দ্র মাস ধরে ওঁরা সব সময়ে, এমন কি কখনো কল ছাপিয়ে উপচে পড়া নদীর কোমরজলে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, নীরবে হাত জোড় করে অনুনয় করেছেন। চৌমাথার মোড়গুলিতে এক একজন পালা করে ছ'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতো, তার পর নতুন দল আসতো। বিনা প্রতিবাদে ব্রাহ্মণের দল আর স্থানীয় পলিশের মার খেয়েছেন, আঘাতে আঘাতে জখ্মারিত হয়েছেন। ক্রান্তি আর রোগের উৎপীড়নে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। অবশেষে তাঁরা জয়লাভ করেন। এশ্বজ ওঁদের সঙ্গে বাস করতেন। গত কয়েকবছর যাবৎ উনি অনুরূপভাবে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, দার্ভিক্ষ আর মহামারীর বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণ সব কিছুতেই যোগ দিয়েছেন, কখনো গান্ধীজীর অনুরূপ দলে, কখনো রামকৃষ্ণের শিষ্য দলে যোগ দিয়ে। উনি এই শেখোক্তদের পবিত্রতা আর নিষ্ঠাকে অত্যন্ত শ্রম্যার চোখে দেখেন। আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র, যেখানেই সমাজের কোন সাহায্য প্রয়োজন, সেখানেই এঁদের

সাক্ষাৎ মেলে। এশ্বর্য বলেন রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কাছে ধর্মচারণের সঙ্গে কোন না কোন মূর্তিপূজার সম্বন্ধ অপরিহার্য। কিন্তু গান্ধীভক্তদের ক্ষেত্রে তা নয়। তবে এঁরা ধর্মসংগীত অত্যন্ত ভালবাসেন।

গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার কোন সীমা নেই। তাঁর নাম প্রতিটি ভারতবাসীর চিন্তে গভীর আবেগের অনুরণন জাগিয়ে তোলে। উনি যেখানেই যান, সেখানেই দলে দলে লোক ছুটে আসে। উদ্ভুদ্ধ প্রান্তরে এমনি একটি জনসভার বর্ণনা দেন এশ্বর্য। গান্ধীজী নিজে মাঝখানে, তাঁর পাশে এশ্বর্য। চারপাশে হাজার হাজার লোক ঠেসাঠেসি কবে গোল হয়ে সারি দিয়ে বসে। এই সভার বাইবে থাকার সময়ে এশ্বর্যকে কেন্দ্র থেকে সেই বস্তুর পরিধি পর্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ রেখা ধরে ধরে পা ফেলে যেতে হয়েছিল। সমবেত জনগণের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা থেকে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল সেদিন একলক্ষেরও বেশী লোক সভায় এসেছিল। এশ্বর্য মন্তব্য করেন যে তিনি এইসব সভায় গান্ধীজীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মোটেই পছন্দ করেন না, ওঁর কেবল ভয় করে যে একদিন চারপাশের অসংখ্য লোকের ভীড়ের চাপে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে না যায়। আমি জানতে চাই গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগসূত্রটি কোথায়। এশ্বর্য ঠিকই উত্তর দেন—ঈশ্বর-নারায়ণ (নরজন?)—দুঃখী, দরিদ্র, উৎপীড়িতদের মধ্যে ভগবান প্রকাশিত, এই পরম সংজ্ঞা বিবেকানন্দের কাছ থেকেই গান্ধীজী লাভ করেছেন।

কুড়ি বছর যাবৎ গান্ধীজীর প্রতি এশ্বর্যের অবিচলিত ভক্তি সত্ত্বেও তাঁর দুটি কাজ তিনি কোনদিন মেনে নিতে পারেন নি—মহাশুদ্ধির প্রারম্ভে ইংল্যান্ডের হাষে সৈন্য সংগ্রহ করা, আর তাঁর বিদেশী পণ্য বর্জন আর পোড়ানোর নির্দেশ প্রচার করা। স্বতীয়টি সম্বন্ধে গান্ধীজী বড়তে পেরেছিলেন যে তিনি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কবে ফেলেছেন, আর তিনি নিজে যে হিংসার নিন্দা করেন, তাঁর নির্দেশ থেকেই তার উৎপত্তি হয়। তিনি একবারও তাঁর যুদ্ধকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে রাজী হননি, যদিও যুদ্ধের মধ্যে আর তাব পরেও এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে এশ্বর্যের অন্তর্হীন আলোচনা হয়েছে। কারণ এঁরা দু'জনেই যার যাব নিজস্ব আদর্শে বদ্ধমূল।

অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে

গান্ধীজী এক যুগসন্ধিক্ষণের নেতা। তাই, আরো অনেকের মত। তিনিও অতীত আর ভবিষ্যৎ এই দুই আদর্শের মধ্যে স্বিধাবিভক্ত—প্রায় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি প্রথমটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

* * *

এশ্বর্য ১৯০৪ সালে ভারতবর্ষে আসেন। বেশ কয়েকবছর দিল্লীতে অধ্যাপনা করেন। ১৯০৮ সালে তাঁর পিয়ার্সনের সঙ্গে আলাপ হয়। ১৯১০ সালে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান—পিয়ার্সনের সঙ্গে। পিয়ার্সন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন।

এশ্বর্য বলেন যে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ উত্তরভারত আর বাংলাদেশে, কমুনিস্ট যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। দারিদ্র্যের দরুণ যে সব ভারতীয় নেতা অর্থের প্রলোভন এড়াতে পারেন না, কমুনিস্টের টাকার জৌলুস তাঁদের নষ্ট করেছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দলে টানবার চেষ্টায় কমুনিস্টরা নিঃস্বার্থতার ভাব করে তাদের টাকা দিচ্ছে এবং তারাও দুর্ভাগ্যবশত সে টাকা নিচ্ছে। যুগের সঙ্গে লোকের অভ্যাস এবং ধারণাধারনও খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। প্রাচীন গান্ধীপন্থীদের মধ্যে অচিরেই কেবল আর সহযোগ বা অসহযোগ নিয়ে নয়, হিংসা আর অহিংসা নিষেও প্রশ্ন উঠবে, এ এশ্বর্য স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন। আর এই বিতর্কের ফলাফলের কথা ভেবে তিনি উদ্ভিন্ন। এইজন্যেই তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল যে গান্ধীজী যথাসম্ভব সম্ভব একেবারে সামগ্রিক সংগ্রামের সমর্থনে নিশ্চিত ও নিঃসংশয় হয়ে ঘোষণা করুন। গান্ধীজীর বর্তমান ব্যক্তিগত মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর তিলমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার একান্ত প্রয়োজন।

কমুনিস্টের অনুসৃত পন্থার প্রশ্ন না উঠলে সমাজ্যবাদে বিরুদ্ধে তাব সংগ্রাম এশ্বর্যের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ কবত। কারণ সম্প্রতি উনি ইংল্যান্ডের শ্রমিকদল সম্বন্ধে দারুণ বিতৃষ্ণা আর বিরাগ নিয়ে ফিরেছেন। তিনি তাদের একই দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারমূলক বিলের সমর্থনে আর ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দাবীর বিরুদ্ধে সাইমন রিপোর্টের স্বপক্ষে মত ঘোষণা করতে দেখেছেন। এশ্বর্য শ্রমিকদলের সদস্যদের কমিশনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত হতে অনুরোধ জানান, তাঁর এই আবেদন

প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রতিবাদস্বরূপ এশুদুজ শ্রমিক-অধিবেশন পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হন। এইভাবেই ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির পদ উনি ভাগ করেছেন। সাংঘাতিক এক অশ্রুতার বশবর্তী হয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এমনি করে তার শত্রুপক্ষের সহায়তা করে চলেছে। শ্রমিক দল আর সমাজতন্ত্রী দল কম্যুনিজমকে সমর্থন করছে, কম্যুনিজম আবার ফ্যাসিজমকে সাহায্য করছে। এমনি করে যে চক্র গড়ে উঠল তা কেবলই সাম্রাজ্যবাদ আর হিংসার পথে পাক খেয়ে চলেছে।

এশুদুজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথমবার জাপান যাওয়ার গল্প করেন। তখন যুদ্ধ চলছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যান। তিনি যখন গিয়ে পৌঁছেন তখন এক বিরাট জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা করে—সারা দেশ তাঁকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু ওরা ভেবেছিল রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের জাত্যাভিমান আর যুদ্ধের গৌরব ঘোষণার কাজে লাগানো যাবে। বিরক্ত-ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি যথার্থ তেজস্বিতার পরিচয় দেন। দুদিনের মধ্যেই সারা জাপান তাঁর সংশ্রব পরিভ্রমণ করল—‘পরাজিত দেশের কবি’ এই নামে অভিহিত করল তাঁকে। উনি যখন ‘জাতীয়তাবাদ’-এর ওপর তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন, তখন এশুদুজ ও’র কাছেই ছিলেন। চীনদেশেও নবীনদের দল কবির সঙ্গে তার চাইতে কম অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করেন। তারা তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে Real politik বা কৌটিল্যবাদের ঝাড়া তুলে ধরেছিল। কবি উপনিষদের বাণী থেকে তাদের নেতাদের প্রত্যুত্তর দেন.....“অন্যায় দিয়ে মানুষ সমৃদ্ধ হয় ...অন্যায়ের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে জয়ী হবে... ইত্যাদি,.....আর অন্যায়ের দ্বারাই সে আমূল বিনাশ লাভ করবে।” এশুদুজের মতে তাঁর একথা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। জাপানীরা তাঁকে তাঁদের দুই পৌরাণিক বীরের কীর্তি ঘোষণার জন্যে কবিতা লিখে দিতে অনুবোধ করেছিলেন। সেই দুই বীর নাকি সারাদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিলেন—যতক্ষণ না দু’জনেরই মৃত্যু হয়। কবি লিখলেন—“ওরা সারাদিন লড়াই করল—দু’জনে দু’জনকে মারল। পৃথিবী লজ্জায় তাদের লুকোবাব জন্যে ঘাসের আচ্ছাদনে ঢেকে দিল দু’জনকেই!”

আমাদের যে সব ফরাসী বন্ধুবর্গ রবীন্দ্রনাথকে ভীরা ও সাবধানী সুবিধাবাদী বলে অপবাদ দিতে পেরেছেন, তাঁরা জানেনই না যে রবীন্দ্রনাথ কি বিপুল সাহসের সঙ্গে দু’টি দেশের বিপুল জনমতের বিরোধিতা করে নিজের জনপ্রিয়তা বিনা বিধায় বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এশুদুজ হিন্দী উর্দু আর বাংলা কথা বলতে পারেন, আর প্রায় সব ভারতীয় ভাষা বঝতে পারেন।

—এশুদুজ অতি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাতে আবার কিছুদিন কাটিয়ে এলেন। সেখানে স্থানীয় অধিবাসী-গণের, বিশেষতঃ ভারতীয়দের অধিকারের যারা প্রধান সমর্থক, উনি তাঁদের একজন। বাস্তুজ্ঞাতির সম্বন্ধে উনি যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করেন—তারা সুন্দরের জাত, শিল্পীর জাত আর নানাদিকে, বিশেষতঃ সংগীতে তাদের আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্ষমতা লক্ষণীয়। সেখানকার সরকার নানারকম অত্যাচারমূলক আইন পাশ করতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের মধ্যে যে সন্তোষজনক নৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, এশুদুজ তার প্রমাণ দেন। এখানকার ডাচদের মধ্যে একটা ধর্মীয় বিশ্বদ্রাতৃয়ের একান্ত মানবিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় যা তার আগের যুগের কাছে একেবারেই অজানা ছিল।

এশুদুজ যখন প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, ভেবেছিলেন পৌঁছে দেখবেন গান্ধীজী আর পোলক দু’জনেই জেলে। জাহাজ থেকে নেমে একটি অত্যন্ত ছোটখাটো ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা, এই ছোট মানুষটির সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময়ে দেখলেন পোলক আসছেন। এশুদুজ তাকে চিনতেন—দেখেই চোঁচিয়ে উঠলেন—“একি? আপনি কি তবে বন্দী হননি? কিন্তু মিঃ গান্ধী কোথায়?”

সেই ছোটখাটো ভদ্রলোকটি বললেন—“আমিই মিঃ গান্ধী।” গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের গভীর আবেগে এশুদুজ ভারতীয় প্রধায় তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে তাঁকে অভিবাদন জানানলেন। এ নিয়ে হৃদয়স্থল পড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সব সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মস্ত হরফ শিরোনামা বেরোল—‘ভারতবর্ষ’ থেকে এক শ্বেতাঙ্গ এসে হাজির হয়েছেন, এক কৃষ্ণাঙ্গের পায়ে ধুলো ঝাড়বার জন্যে। এশুদুজের সামনে সব

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পিয়ার্সন এক অতি অমায়িক পরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে গৃহকর্তাকে বলতে শোনেন—“আপনি ঐ এন্ড্রুজ লোকটাকে চেনেন? লোকটাকে যদি দেখতাম দিতাম গলা টিপে।” পিয়ার্সন হেসে বললেন—“সে আমার বন্ধু।” তখন বয়েস কম, কথার বার্তায় ব্যবহারে মানুষ্যটি এমন চমৎকার ছিলেন, সকলের হৃদয় এমন সহজে পিয়ার্সন জয় করে নিতেন যে তাঁর সম্বন্ধে কিন্তু এমনিধারা ইচ্ছে কেউ করতেই পারত না।

খুব ভাল ঘরে তাঁর জন্ম—এক প্রাচীন কোয়েকার পরিবারের ছেলে তিনি। শাস্তিনিকেতনে তাঁর নামে একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে।

বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপে আসবার কথা ছিল এন্ড্রুজ তাঁর সঙ্গে কলম্বো পর্যন্ত যান, কিন্তু সেখান থেকে কবি আর জাহাজে উঠতে ভরসা পাননি। স্বাস্থ্যের অবনতিই এব কারণ। তাঁর হৃদযন্ত্র ঠিকমত কাজ করছিল না—রক্ত চলাচলে ত্রুটি দেখা দেয়, হাত পায়ের গ্রন্থি ফুলতে শুরু করে। অন্যদিকে, গান্ধীজী আগামী বছর আসবেন বলে স্থির করেছেন। গত ডিসেম্বরে উড়িষ্যা ও’র arterial hypertension এর দ্বিতীয় আক্রমণের সময়ে এন্ড্রুজ ও’র কাছে ছিলেন। এক একদিন এমনও মনে হয়েছে যে ও’র মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসবে। ভারতবর্ষের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করই নির্বাণ আসন্ন।

(এন্ড্রুজের নামের তিনটি আদ্যাক্ষর C.F.A.-কে ভারতীয়েরা এইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে—Christ’s Faithful Apostle—এ কথা এন্ড্রুজের মনে শোনা নয়।)

৩১শে আগস্ট, ১৯৩০ : সি, এফ, এন্ড্রুজ দুপুরে খেতে এসেছিলেন। উনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাশিয়া যাচ্ছেন না—গান্ধীজীর বন্ধু বলে সেখানকার কতটা ব্যস্ততা ও’কে সন্দেহ করে দেখেন না। ও’র ইচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার। কৃষ্ণাঙ্গ জাতিদের ওপর দুর্ব্যবহারের মাত্রা সেখানেই সবচাইতে বেশী। (বিশেষতঃ বাপ্টুদের কথা তিনি গভীর দুঃখ আর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—ষথার্থ আভিজাত্যসম্পন্ন এই উপজাতিটিকে যেভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে তা সত্যি ভয়াবহ। গতবার আফ্রিকা থেকে আসবার সময়ে তাদের এক প্রতিনিধি-দল তাঁকে বলে—“আমরা জানি যে আপনি ভারতীয়দের

জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের জন্যে কি আপনি মরতে পারবেন।” এই কথাটি তাঁর মনে এতো গভীর বিবেকষণার উদ্রেক করে যে তা তিনি এখনো ভুলতে পারেননি।)

এন্ড্রুজ বলেন যে, গত এক বছর যাবৎ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন—তাঁর মহত্ব উনি বুঝতে পেরেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ও’দের শেষ সাক্ষাৎকারের ফলে দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত ভাল হয়েছে।

ইংরাজী সংবাদপত্র, বিশেষতঃ ‘স্পেক্টেটর’-এ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অত্যাৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজ রাজনীতিকগণ, বিশেষতঃ রায়জে ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে এন্ড্রুজের সাম্প্রতিক আলাপ-আলোচনার অভিজ্ঞতা, খুবই দুঃখের—যদিও ম্যাকডোনাল্ড তাঁর পুরণো বন্ধু (বহুদিন আগে এন্ড্রুজের সঙ্গেই তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন)। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করেন, কিন্তু ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে তিনি একেবারে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন। এমনকি তিনি এন্ড্রুজকে গান্ধীজীর পক্ষ ত্যাগ করবার জন্যে পেড়াপিড়ি করেন। শ্রমিকদলের কাছ থেকে কিছুই আশা করবার নেই। এর চাইতেও দুঃখের কথা হ’ল, নামকবা ইংরেজ লেখকদের মধ্যে একজনও ভারতবর্ষের হয়ে বলছেন না। তাঁরা সবাই এমন ভাব করছেন যেন তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, এ সম্বন্ধে তাঁদের কোন উৎসাহ নেই। আসলে যে সব স্বার্থপর কারণে এরা ইংরেজপক্ষের অনায়াস দেখেও দেখছেন না, সেগুলিতে স্বীকার করতে পারেন না—সেই অস্বাস্থ্য লোকের জন্যে ও’রা এই ঔদাসীন্যে মদুখোস পরেছেন। ওয়েল্‌স্‌ এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি অতি সাধারণস্তরের বোধশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান সমস্যা’র ষথার্থ অনুভব করা তাঁর বুদ্ধির ক্ষমতাতীত। এন্ড্রুজ আর রেজিনাল্ড রেনল্ডস্‌ প্রায়ই ভারতবর্ষের স্বপক্ষে বলেছেন। কিছু ইংরেজকে (বিশেষতঃ কয়েকাবদের) তাঁরা এবিষয়ে সহানুভূতিশীল হতে দেখেছেন, যদিও সংখ্যাব দিক থেকে তাঁরা বেশী নন।

বার্লিংনে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাম্প্রতিক রবীন্দ্রনাথের দুটি হৃদয়গ্রাহী আলাচনা হয়েছে—এন্ড্রুজ তার উল্লেখ

করেন। শ্বিতীয়টি সংগীত সম্বন্ধীয়, প্রথমটি মানুষের চিন্তার সঙ্গে সত্য ও সৌন্দর্যের সম্পর্ক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য ও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব মানুষের চিন্তার উপর নির্ভরশীল। আইনষ্টাইনের মত জ্ঞানী যে মানবমন নিরপেক্ষ সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী একথা বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়। আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে তাঁর এই বিশ্বাস কোন যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন আইনষ্টাইন উত্তর দেন—“কোন যুক্তির উপরেই নয়। এ আমার বিশ্বাস।” কবি উত্তর দেন—“আমার বিশ্বাসের পিছনে সর্বদাই যুক্তি থাকে।”

“বেশতো!” হেসে উত্তর দেন আইনষ্টাইন “তবে আপনার চাইতে আমার ধর্মবিশ্বাস বেশী।” এণ্ড্রুজ ওঁদের প্রথম এই সাক্ষাৎকারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তার বর্ণনা ‘নিউইয়র্ক টাইমস্’এ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ওপর অরবিন্দ ঘোষের অসাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে এণ্ড্রুজ নিঃসংশয়। (কালিদাস নাগ আমাকে যা বলেছিলেন, এণ্ড্রুজের বক্তব্য তার ঠিক বিপরীত।) এই প্রভাব এতোই বেশী যে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রায় আমলে রূপান্তর ঘটিয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে অরবিন্দের চেহারা, তাঁর চোখের গভীর আর আশ্চর্য আকর্ষণীয় সৌন্দর্য, এই সবই কবির মন্থ হবার প্রধান কারণ। কিন্তু ওঁরা আলাপ আলোচনা কম করেননি। তাঁরা দুজনেই তখন নীরব কোন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, একথা সত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি ইংল্যান্ডে ‘মানুষের ধর্ম’ সম্বন্ধে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করেন। তাঁর কাছে সমগ্র মানবজাতি একটিমাত্র সত্তা, আমরা প্রত্যেকে অন্তরেব গভীরে তার সঙ্গে একাত্মা অনুভব করি। প্রতি ব্যক্তি-বিশেষের ওপরে তিনি সর্বদা পরমসত্ত্বাবরূপ ঈশ্বরকে বিরাজ করতে দেখেন। উনি মূলতঃ একেশ্বরবাদী। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন। শৈশবে ওঁর মধ্যে ধর্মভাব প্রায় ছিল না বলেই হয়। প্রথম যথার্থ অভিজ্ঞতা হয় আঠারো বছর বয়সে। একদিন খুব ভোরে উনি শুষে শুষে জানলা দিয়ে সুন্দর কতকগুলি গাছের দিকে তাকিয়েছিলেন। সূর্যের প্রথম আলোর ধারা সবে ঝরে পড়তে সূর্য করছে—ঠিক এই মনোভাবটিকে ঐ গাছগুলি, আকাশ, বা কিছু প্রাণবন্ত

তার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার অনুভূতি—তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। এই অবাস্তব স্বপ্নাচ্ছন্ন অনুভূতি সোদিন সারাদিন, তার পরেরও কদিন কলকাতার পথে-ঘাটেও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যায়নি। অবশেষে ওঁর দাদা এই অভিজ্ঞতাকে আরো সম্পদবান করে তুলবার জন্যে ওঁকে দার্জিলিঙে নিয়ে যান। সেখানে প্রকৃতি আরো বহুগুণে সুন্দর—কিন্তু তাঁর ঐ অনুভূতির মাদকতা ফুরিয়ে গেল, এক নিমিষে নিভে গেল।

এণ্ড্রুজ বলেন, বিশ্বেব সঙ্গে একাত্মার অন্তর্নিহিত আনন্দ আর শান্তির এই বোধ ভারতবর্ষে থাকবার সময়ে সর্বদাই অনুভব করতে পারেন। অথচ আফ্রিকাতে, সেই একই অক্ষরেখার ওপরে এক অসহনীয় বিষাদের অনুভূতিই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। উনি এই পার্থক্যের এক mystic-সুসজ্জ ব্যাখ্যা দেন—ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ বাস করে গিয়েছে, তাদের আত্মা ম্বারা সেখানকার জলবায়ু লালিত বলেই এমন হওয়া সম্ভব।

এপ্রিল, ১৯৪০ : গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথের সুস্থঃ আমাদের প্রিয় এণ্ড্রুজের মৃত্যু হয়েছে।

হৃদয়ের যে প্রসাদগুণ, যে অনলস প্রেম আব পরম অনাসক্তির কথা খৃষ্টধর্মে আছে, তা এই মানুষটির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মূর্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের জন্যে তাঁর চেয়ে বেশী কাজ ইউরোপে আর কেউ করেনি।

বিশ্বব্যাপী তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি উৎসাহিত ভারতীয়দের সহায় ছিলেন। ভারতবর্ষেও তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর যোগসূত্র। তাঁকে আমি যেমন শ্রদ্ধা করতাম তেমনি ভালবাসতাম। সমাধির উদ্দেশ্যে আমার চোখ তাঁর সুন্দর স্নেহপূর্ণ চোখ দুটিকে বন্ধুর শেষ অভিবাদন জানাল।

ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর অপারেশন হয় (সম্ভবতঃ পেটের ক্যান্সারের জন্যে)। ওঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল—সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদায় এণ্ড্রুজ আর পিয়ার্সন—তোমরা যারা দক্ষিণ আফ্রিকায় তরুণ গান্ধীজীব পাশে অসীম সাহসভরে দাঁড়িয়েছিলে—তোমরা দুজনেই যারা ‘ভিলাওলগাতে’ আমার অতিথি হয়েছিলে। যারা এই জগৎকে উজ্জ্বল করেন সেই মহাবীর আর সেই সন্তপূর্বুষদের পৃথিবী চিনতে শিখা করে না। ক্যাথলিক চার্চ অস্তিত্ব তার এই সন্তানদেব প্রাপ্য সম্মান, মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে হলেও দাবী করে থাকে। কিন্তু এণ্ড্রুজ আর পিয়ার্সনের সন্তত দাবী করবে কে?

C. F. A.

গুরুদয়াল মাল্লিক

“Christ’s Faithful Apostle”—আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একদিন এশ্বরজ সাহেবের নামের আদ্যাক্ষর-গুলির এই অর্থ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তখন জাতিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, ১৯১৯ সাল—সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবের উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমনি সময়ে একদিন সকালে প্রার্থনার পর ঐক্যসাধক এশ্বরজের ঐ নামটি আমার মনে এলো। পাঞ্জাবের স্বেচ্ছাচারী শাসক মাইকেল ওডায়ারের হাতে যে সব লোক অমানুষিক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করেছিল তারা দলে দলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নানা জাতের ও বিভিন্ন ধর্মের লোক ছিল তাদের মধ্যে। মাইকেল ওডায়ার তাঁর শাসিত অঞ্চলে ইংরাজ শাসনের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যতদূর যেতে হয় যাবেন, এই রকম ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যেন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, অহিংসার মন্ত্রধারক গান্ধীজির কাছে তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে, দেহের শক্তি আত্মার শক্তির চেয়ে বড়। মাইকেল ওডায়ার নিজেকে বীশুখৃষ্টের ভক্ত বলতেন,—অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে ঠেকানো যায় না—এই খৃষ্ট-প্রচারিত সত্যের শেষ জয়লাভ দেখে যাবার মত দীর্ঘায়ু তিনি পাননি। তাঁর চাকরী থেকে অবসর নেবার পর স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা হলেন। তিনি কলেজ-জীবনে কেম্ব্রিজে এশ্বরজ সাহেবের সহপাঠী ছিলেন। ফলে এশ্বরজ যখন তাঁর কাছে মাইকেল ওডায়ার-কৃত অমানুষিক কর্মের অনুসন্ধান করার অধিকার চাইলেন মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়ে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। সেই অমানুষিকতা এত ভীষণ যে, বর্তমান লেখকের কাছে সিভিল সার্ভিসের একজন সত্যনিষ্ঠ ইংরাজ অফিসার গোপনে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন : “During those terrible days, sometimes I think we British were more brutish than British.”

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে চূড়ান্ত ধর্ম বলেছে সেই পরম

করুণার চেতনা নিয়ে সি এফ এশ্বরজ তাঁর কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। অপারিসমী বিশ্বাস আর হৃদয়ভরা স্নেহ নিয়ে তিনি দ্বঃখপীড়িত মানুষগুলিকে কাছে টানতে চেয়েছিলেন। সমালোচনার ও পীড়ন করবার অধিকারী শাসকের জাত তিনি একথা একেবারেই বৃদ্ধিতে দিতে চাইতেন না। খৃষ্টবাণীর পরমসত্য বাইবেলের সামারিটানের গল্পে আছে, সেই সামারিটানের মতই তাঁর আচরণ। বিধবা মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে শাস্ত্রনা দেন তেমনি লাঞ্ছিত ও পীড়িতদের শাস্তি ও শাস্ত্রনা দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। প্রায়ই দেখতুম যখন তিনি তাদের দুঃখের কথা শুনতেন এক রহস্যময় আলো তাঁর মুখের ভিতর ফুটে উঠতো; তাঁর মুখের ছবিতে ওয়াশ্চ হুইটম্যানের বাণী জাগতো : “I do not ask the wounded man how he feels. I myself become the wounded man.” শক্তি ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য যারা হিংস্র তাদের হাতে অপমানিত ও নিষ্পাতিত মানুষগুলির সংগে কি আশ্চর্যভাবে তিনি নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

মানবিক ধর্মগুলির মধ্যে যা সবচেয়ে বড় সেই সহানুভূতির রসে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। স্বচ্ছ-বুদ্ধি এবং একাগ্র হৃদয় নিয়ে তিনি সেই সমবেদনাকে সরকারী বেসরকারী সব রকম কাজে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। ফল হতো এই যে, পাঞ্জাবের সেই মানুষগুলির ইংরাজদের সম্পর্কে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসার মনোভাব ক্ষমা ও সৌহার্দ্যের ভাবে পরিণত হতো অচিরেই। তাদেরই মধ্যে একজন বলেছিল, ‘যতদিন এশ্বরজ সাহেবের মতো একজনও সাহেব থাকবে ততদিন ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে আমার মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না’।

এই পরম ঐক্যসাধক পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মানুষকে তার স্বর্গহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে কি চেষ্টাই না করেছেন। খৃষ্টের সেই বাণীকেই তিনি কাজে পরিণত করতে চেয়েছিলেন—Man is made in the image of God.

চার্লস ফ্রিম্যান এন্ডরুজ

নিশিকান্ত সেন

এন্ডরুজ সাহেবের সহিত আমার পরিচয় ১৯০৬ সাল হইতে। আমি ঐ সালের ১লা মে দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্‌স্‌ কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করি। ওখানে গিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই এন্ডরুজ সাহেবের নানা প্রকার প্রশংসা শুনিতে পাই। তিনি মে মাসে পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সঙ্গে রুদ্রসাহেবের বড় ছেলে সুধীর গিয়াছিল। আমার কাছে এটা একটু নূতন কথা বলিয়া মনে হইল। সুধীর তখন সবে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়াছে, বয়স পনের ষোল হইবে। তাহাকে বন্ধুরূপে সঙ্গে নিয়া পাহাড়ে যাওয়া এন্ডরুজের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তিনি বলিতেন, সুধীরের কাছে তিনি হিন্দুস্থানী শিখিবেন। যাহা হউক শীতের প্রারম্ভে এন্ডরুজ সাহেব যখন দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন তখনই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল। তখন তাঁহার মূখে দাঁড় ছিল না, সাধারণ বিদেশী পাদ্রীদের মতোই তাঁহার চেহারা ছিল। তিনি দক্ষিণহস্ত অপেক্ষা বাম হস্ত ব্যবহারে অধিক সুবিধা পাইতেন। তিনি যখন ক্রিকেট খেলিতেন তখনই এটি বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারা যাইত। লিখিতেন দক্ষিণ হস্তেই। হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর ছিল। রুদ্রসাহেব আমাকে এন্ডরুজ সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এন্ডরুজ সাহেব আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তোমার কথা অনেক শুনিয়াছি, এখন তোমাকে অনেক দেখিতেও পাইব (I will see much of you)।

এন্ডরুজ সাহেব আমার চেয়ে বয়সে আন্দাজ দশ বৎসরের বড়। আনুমানিক পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কলেজে যোগদান করেন। কেম্ব্রিজে তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে অতিশয় উচ্চ স্বাভিচার সহিত কেম্ব্রিজের পাঠ শেষ করেন। তাঁহার বন্ধু পিতা চাহিয়াছিলেন যে তিনি ধর্মযাজক হইয়া লোকহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি ধর্মযাজকরূপে

দীক্ষিত হন। যখন দিল্লীতে প্রথম আসিলেন তখন তিনি রেভারেন্ড্‌ সি, এফ, এন্ডরুজ নামেই পরিচিত হইলেন। কেম্ব্রিজ মিশনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে অদূর ভবিষ্যতে সেন্ট স্টিফেন্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপকরূপেই চাহিয়াছিলেন।

এন্ডরুজ সাহেবের কথা বলিতে গেলেই রুদ্রসাহেবের* প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কলেজের অধ্যাপকেরা বলিতেন 'হরিহর আত্মা'। ইহাদের বন্ধুত্ব দেখিলে লোকে অবাক হইত। যেন পনের ষোল বছরের দুটি কিশোর বন্ধু একেবারে একপ্রাণ, একমন হইয়া আছেন। এই সম্পর্কে আমরা কিছু হাসিঠাট্টার গল্পও শুনিতাম। একবার কিছুদিনের জন্য ইহাদের বিচ্ছেদ হইয়াছিল। এন্ডরুজ তখন পশ্চিম ভারতের একটি শহরে ছিলেন, কিন্তু রোজ চিঠি লেখা চাই। এন্ডরুজের চিঠি দিল্লী আসিতেছে, আর রুদ্রের চিঠি এন্ডরুজের কাছে যাইতেছে। একদিন চিঠির সহিত এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত। টেলিগ্রামে কি আছে শুনিলেই অন্য অনেকেই আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু যাহা শোনা গেল সেটি আমাদের কাছে নিতান্ত হাসির বিষয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। টেলিগ্রামের সংবাদটি হইল, 'সুধীশ

* রুদ্র সাহেব : সুধীশকুমার রুদ্র। তিনি ১৮৮৬ সালে দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্‌স্‌ কলেজে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন এবং পরে ১৯০৬ সালে ঐ কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে কলেজের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একবার গুরুদেবকে দর্শন করিতে শাস্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। দিল্লীতে তিনি রুদ্রসাহেব নামেই পরিচিত ছিলেন।

মন খারাপ করিও না, পিয়াস সোপ ব্যবহার করিও' (Dont worry use pears soap) ব্যাপার কি! শোনা গেল রুদ্রসাহেব তাহার কি একটি দৃষ্টিচ্যুত কথার কথা এন্ডরুজকে লিখিয়াছিলেন। এন্ডরুজ চিঠিতে তাহার উত্তরও দিয়াছিলেন। কিন্তু সান্ধাবাগণী যাহাতে অবিলম্বে পৌঁছে সেই জন্য টেলিগ্রাম করেন। ইহার পর হইতে আমরা পরস্পরকে বলিতাম, 'পিয়াস সোপ ব্যবহার করুন'।

এতো হইল হাসির কথা। এখন তাহার অপর একটি দিকের কথা আলোচনা করা যাক। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এন্ডরুজের চরিত্রের পরিচায়ক। ইনি দিল্লী আসিবার দুই বৎসরের মধ্যেই সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হয়। কলেজ মিশনারীদের। কলেজের কর্তা বৃটিশ অধ্যাপকগণ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং কেম্ব্রিজ হইতেই নিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে আসিতেন। ইহাদের মধ্যে আবার কেম্ব্রিজ ব্রাদারহুড (Cambridge Brotherhood) গোষ্ঠীর সদস্যরাই যথার্থরূপে কলেজের আদর্শ রক্ষার অধিকারী। এন্ডরুজ সাহেব কেম্ব্রিজের নামকরা ছাত্র ব্রাদারহুডের সভ্য। এই সকল কারণে অনেকেই অধ্যক্ষের পদে তাহার নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন একথা তাহার কানে গেল তখন তিনি কেম্ব্রিজ মিশনের দিল্লী-স্থিত কর্তাকে গিয়া বলিলেন, 'আপনি কি কলেজ অধ্যক্ষ নির্বাচনের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে আমার নাম না ওঠাই ভালো।'

'কেন?'

'আমি তো মাত্র দু-বৎসর এখানে আসিয়াছি, এখানকার কথা আমি কি বা জানি। দেশের ভাষা ভালো বুঝিতেও পারি না, বলিতেও পারি না।'

'আমরা তো তোমাকেই নির্বাচন করিয়া কেম্ব্রজে লিখিব ভাবিতেছি।'

এন্ডরুজ মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, পরে অতিশয় মৃদুভাবে বলিলেন, 'আপনি মিশনের কর্তা, আমি যাহা করিব তাহাতে আমার ঐশ্বর্য দেখিলে আমাকে শাসন করিতে পারেন, ক্ষমাও করিতে পারেন। আপনাকে আমার মনের কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে এবং আমি তাহা বলিতে সাহস করিতেছি।'

মিশনের অধিকর্তা বলিলেন, 'তুমি নির্ভয়ে বল।'

তখন এন্ডরুজ বলিলেন, আমার মনে হইতেছে যে এই অধ্যক্ষ নির্বাচন দিয়াই আমাদের পরীক্ষা হইবে। আমরা মূখে যাহা বলি এবং যে নীতি আমরা প্রচার করি কাষ'কালে যদি তাহার বিপরীত আচরণ করি তাহা হইলে লোকে আমাদের কথা অবিশ্বাস করিবে,—এবং সে দোষ আমাদেরই।'

এবার মিশনের অধিকর্তা মৌন হইয়া রহিলেন; পবে বলিলেন, 'কিন্তু তুমি তো সব কথা বল নাই। তুমি আমাকে এক্ষেত্রে কি করিতে বল?'

তখন এন্ডরুজ আবার মৃদুভাবে বলিলেন, যাহারা আমার অপেক্ষা সিনিয়র, যাহারা এদেশকে ভালো কবিয়া জানেন এবং এদেশের শিক্ষাধারা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন তাহাদের মধ্যেই কাহাকেও নির্বাচন করা উচিত মনে হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে যদি এই দেশীয় কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়।'

মিশনের অধিকর্তা অবাক হইয়া এন্ডরুজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 'মনে হইতেছে তুমি ঠিকই বলিতেছ, আমাদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত। তুমি যেদূর লোক চাহ সেদূর লোক সহজে পাওয়া যায় না,—এইটিই মূর্ত্যোগ্য বিষয়। তুমি কি কোনও ব্যক্তির নাম বলিতে পার?'

'কেন, আপনি সদৃশীল বৃদ্ধের নাম বিবেচনা কবিয়া দেখিতে পারেন।'*

'কিন্তু আমি কেম্ব্রিজের কর্তাদের কি করিয়া রাজি করাইব? এদেশের মিশনাবী কলেজগুলি যাহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহারা সকলেই বিদেশী অধ্যক্ষের পক্ষপাতী। এ পর্যন্ত কোন দেশী লোককে এ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি না। আর এক কথা, এদেশেও বহু লোক এখনও দেশী লোক অপেক্ষা

* বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমি ইহার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দিল্লী আসিবার পর হইতে কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ কে হইবেন সে বিষয়ে অনেক সময় আলোচনা হইত। পরে আমি কলেজের ক্রিস্চান অধ্যাপকদের নিকট যাহা শুনিতাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বিদেশীকেই অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান। ইহারা মনে করেন যে দেশী লোক অপেক্ষা কোন বিদেশী লোক অধ্যক্ষ হইলেই কলেজের মৰ্যাদা বজায় থাকিবে। দেশী লোকের হাত পড়িলে কলেজের দৃঢ়তা উপস্থিত হইবে। এখন উপায় কি?’

‘আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন। কেম্ব্রিজের কর্তারা আপনার কথা না শুনিলে আমার এ কলেজ ছাড়িয়া দিতে হইবে।’

সুশীলকুমার রুদ্রই এই কলেজের প্রথম দেশী অধ্যক্ষ। পরে আরও অনেক মিশনারী কলেজে দেশী লোককে অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হইয়াছে। এন্ড্রুজেরই জয় হইল।

এন্ড্রুজ স্বল্পভাবী; ধীর, শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কদাচিত তাঁহাকে উত্তেজিত বা বিহ্বল হইতে দেখা যাইত। চারিদিকের উত্তেজনা ও গোলমালের মধ্যেও তিনি স্থির থাকিতেন, আবার আশ্বাস বন্ধু বিয়োগের শোকে কখনও বিচলিত হইতেন না। কর্তব্যকর্ম নীরবে করিয়া যাইতেন। একবার তাহাকে উত্তেজিত হইয়া ভারতীয় পদাশির নিন্দা করিতে শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটি এই। তিনি এবং তাঁহার প্রিয়বন্ধু রুদ্রসাহেব প্রত্যহ বিকালে দিল্লীর কাম্মীর গেট হইয়া উত্তরদিকের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। প্রত্যহই গেটে দণ্ডায়মান একটি পদাশির তাঁহাদিগকে দেখিয়া বন্দুক নামাইয়া অভিবাদন করিত। একদিন তিনি দূর হইতে দেখিলেন রুদ্রসাহেব একেলা যখন গেটের ভিতর দিয়া বহিরে যাইতেছিলেন তখন ঐ পদাশির তাঁহাকে অভিবাদন তো করিলই না বরং ঔষধের সহিত মৃদু ফিরাইয়া রহিল। এন্ড্রুজ বদ্বিলেন যে পদাশির কর্মচারীটি প্রত্যহ যে অভিবাদন করিত সে তাঁহাকেই করিত রুদ্রসাহেবকে নয়। কেননা এন্ড্রুজ বৃটিশ! পরে অতিশয় বিচলিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য এদেশের অবস্থা। সামান্য পদাশিরকর্মচারী পর্যন্ত দেশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মান করিবে না, কিন্তু তাঁহার সহিত যদি নিম্নপদস্থ স্বেতাঙ্গ কেহ থাকে তবে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিবে। আমি প্রথম প্রথম মনে করিতাম সুশীলকেই পদাশিরকর্মচারীটি অভিবাদন করে এবং আমি সঙ্গে থাকায় ঐ সম্মানের কিয়দংশ পাইয়া থাকি। এখন দেখিলাম ঠিক তাহার বিপরীত। লক্ষ্য আমার

মস্তক অবনত হইয়া গেল। নিশ্চয় সুশীল ও ব্যাপারটা বদ্বিলিতে পারিয়াছেন। আমি তাঁহাকে মৃদু দেখাইব কেমন করিয়া!’

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। ১৯২৫ সালে গ্রীষ্মকালে সিমলা সোলন পাহাড় (Solon—Simla Hills) রুদ্র সাহেবের মৃত্যু হয়। খবর পাইয়া আমরা তিনজন অধ্যাপক পরের ট্রেনেই সোলন চলিয়া গেসাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি একমাত্র এন্ড্রুজ চারিদিকে ঘুরিয়া অস্তোষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন; যে সব লোক বাড়ীতে আসিতেছে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন এবং শোকাত্ত পরিবারের সকল ভাবনাই ভাবিতেছেন। মুখে শোকের ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু কথায় বার্তায় কাজে কর্মে একেবারে অবচলিত। আমাকে দেখিলে বলিলেন, ‘এই যে নিশি কখন এলে দিল্লী থেকে, আর কে কে এলেন? তোমরা খবর কখন পেলে? সুশীলের সকল কন্টের অবসান হইয়াছে। ঈশ্বর তাহার অশেষ করুণায় সুশীলকে রোগমুক্ত করিয়া দিলেন।’ এই বলিয়া নভমস্তকে কিছুক্ষণ দাড়াইয়া রহিলেন। পরে আবার বলিলেন, ‘তুমি কি করিতেছ, কিছু খাইয়াছ? চলো আমার সঙ্গে, আমাকে একটু বাহিরে যাইতে হইবে।’ আমি তাহার সঙ্গে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আমরা কোথায় যাইতেছি?’ তিনি বলিলেন, ‘একটি কাপেণ্টারের দোকানে, এখানে তৈরী কফিন পাওয়া যায় না, তৈরী করাইয়া লইতে হয়। আমি কফিনের মাপ দিয়া আসিয়াছি, এখন যাহাতে সময় মতো কফিনটি পাঠাইয়া দেয় সেই ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি।’

দীনবন্ধু উপাধি কে প্রথম এন্ড্রুজকে দিয়াছিলেন সঠিক জানি না। যিনিই দিয়া থাকুন এ উপাধি সাধক হইয়াছে। যাহারা এন্ড্রুজকে ভালো করিয়া চেনেন না তাহারা হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন, এন্ড্রুজের বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি এত গুণ থাকিতে তাঁহাকে দীনবন্ধু বিশেষণ কেন দেওয়া হইল। এন্ড্রুজ লোকের দুঃখকষ্ট দেখিলে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেন। এই পৃথিবীতে দুঃখ কন্টের অভাব নাই। শারীরিক ও সাংসারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কন্টতো লোকের আছেই, তাছাড়া সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের দুঃখও মানুষকে কাতর ও দীন করিয়া

রাখিয়াছে। প্রবল দুর্বলকে, নিষ্পেষিত করিতে চায় এবং সুবিধা মতো এই দুর্বল অসহায় লোকগুলিকে একেবারে গ্রাস করিতে উদগ্রীব হইয়া থাকে। মানুষের এই সামাজিক দৃষ্টি দেখিলে তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেন। এই জনই তাহাকে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষকায় ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে নিজের স্বজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে দেখি। এই সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করাই তাহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া দাড়াইয়াছিল। যে লোক এই সামাজিক অত্যাচার পীড়িত সেই যথার্থ দীন—এবং দীন মানবেরাই এন্ডরুজকে বিশেষভাবে পাইয়াছিল।

ভারতে দীনবন্ধু এন্ডরুজ দেশী লোকের উপব বিদেশী শাসনকর্তাদের অত্যাচার দেখিয়া অতিশয় কাতর হইতেন। যখনই পরিচিত কোন শ্বেতাঙ্গ শাসনকর্তার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত তখনই তিনি তাহার সহিত এই বর্ণবিরোধ এবং জাতিবৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে এই বিরোধের প্রতিকার করিতে না পারিলে এদেশে বিদেশী শাসন চলিতেই পারে না। বৃটিশ সাম্রাজ্য এদেশে কেবলমাত্র প্রীতি ও মৈত্রীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, অন্যথা নহে। দীনবন্ধুর এই রাষ্ট্রনীতি কোনও কোনও সময় হাস্যকর ঘটনারও সৃষ্টি করিত। এইরূপ একটি প্রহসনের কথা এখানে বলিতেছি।

হেলিসাহেব (তখনও তিনি লর্ড উপাধি পান নাই) সে সময় দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি দীনবন্ধুর বহু পরাতন বন্ধু। কয়েকদিন ধরিয়া দুই বন্ধুতে 'ভারত শাসন' সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইল। পরে হেলি সাহেব এন্ডবুজের রাষ্ট্রনীতি মানিয়া লইলেন। পরিশেষে হেলি সাহেব এন্ডবুজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ভারতে বৃটিশ শাসনকর্তাদের পরিচালনার জন্য কি প্রস্তাব করিতে চাও?' এন্ডবুজ বলিলেন, 'বেশ তবে বলিতেছি। তোমার ন্যায় শাসনকর্তারা যদি শিক্ষিত ভারতীয়দিগকে মঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কব এবং তাহাদের সহিত ভদ্রভাবে আচরণ কর তবে এই বর্ণবৈষম্য দূর করিবার প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হওয়া যায়।' হেলি বলিলেন, 'আচ্ছা আমি আগামী সপ্তাহেই তোমাদের কলেজের তিনজন দেশীয় অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ করিতেছি। তুমি তিনজন

অধ্যাপকের নাম পাঠাইয়া দিও।' আমরা তিনজন যথাসময়ে হেলি সাহেবের নিমন্ত্রণ পাইলাম; বলিলাম, 'হেলি সাহেব আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এখন উপায় কি?' এন্ডবুজ প্রশ্ন করিলেন, 'উপায়? কিসের উপায়? নিমন্ত্রণ পাইয়াছে, বেশ তো, যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইবে।' আমরা কাতরভাবে বলিলাম, 'আমাদের তো ডিনারের পোষাক নাই। এত বড় লোকের ডিনার টেবিল দেখিও নাই।' এন্ডবুজ হাসিলেন, পরে বলিলেন, 'এ আর এক মন্ডস্কল। তাহার কর্তব্য তিনি কবিয়াছেন, তোমাদের কর্তব্য তোমরা কর। আর পোষাক তোমাদের তো ধর্ম্মি পাঞ্জাবী আছে, তাহাই পরিয়া উপস্থিত হইবে। আমি পূর্বেই একথা ভাবিয়াছি এবং হেলিকে বলিয়াছি, ইহারা কিন্তু লাজুক, তাছাড়া ইহাদের ডিনার স্কাট নাই। এবা কিন্তু নিজের কাপড় পরিয়াই যাইবে। ধারকবা ডিনার স্কাট অপেক্ষা নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধর্ম্মি-পাঞ্জাবী অনেক ভালো। হেলি সাহেব বলিয়াছেন, ঠিক কথা সেই ভালো। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দিও কোন সংকেচের কারণ নাই।'

নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে আমরা তিনজন ধর্ম্মি-পাঞ্জাবী পরিয়া হেলি সাহেবের বাড়িতে পৌঁছিলাম; আশঙ্কর, লক্ষ্যায় আমরা একেবারে ঘর্ম্মান্ত কলেবর! হেলিসাহেবের বাটলার আমাদের লইয়া ড্রইংরুমে পৌঁছাইয়া দিল। আমরা এক এক করিয়া ভারতীয় প্রধাম্ম অভিবাদন জানাইলাম। শ্রীমতী হেলি সহাস্য-মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং আমাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। আমাদের মুখ দিয়া হাঁ না ছাড়া কিছুই বাহির হইল না। পরে ডাইনিং রুমে গিয়া আরো বিপদ।—এতগুলি ছুরি কটা চমচ পাশে রাখিয়াছে, কোনটা দিয়া কি খাইব তাহা জানি না। অতি কষ্টে, কিছু সামান্য বিদ্রোহের পব ভোজন পর্ব সমাধা হইল। আমরা এন্ডবুজের উপর রুগ্ন হইয়া বিবল মন বাড়ী ফিবিয়া আসিলাম। এন্ডবুজ সাহেব আর এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোন কথা বলেন নাই।

উপরে যে সমাজনীতি ও রাজনীতির উল্লেখ করা হইয়াছে এন্ডবুজ এই নীতিকে ক্রিস্চান নীতি বলিতেন। এই সমাজনীতি মহাত্মা গান্ধী ও গুরুদেব ববীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট

হন। জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে দুজনেরই মত এক এবং এবিষয়ে এন্ড্রুজও একমত। তিনি কখনও কখনও বলিতেন গুরুদেব কিম্বা মহাস্বামী কোনও 'অন-ক্রিস্চিয়ান' (un-christian) কাজ করিতে পারেন না। দশ বৎসর সেন্ট স্টিফেন্স-এ থাকিয়া ১৯১৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া গুরুদেবের কাছে যোগ দেন। আমার বড় দুঃখ হয় এন্ড্রুজ বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় বেশি সময় দেন নাই। দিলে এখনকার ছাত্রবা অনেক উপকৃত হইত।

শান্তিনিকেতনে আসিয়াও তিনি দিল্লীর বন্ধু-দিক্কে ভুলিয়া যান নাই। একবার দিল্লীতে আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'দেখ, আমার কিছু ধৃতি দরকার। আমার কাছে পরিষেয় যাহা আছে তাহার দ্বারা আর ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার জন্য কিছু কাপড় সংগ্রহ কর। কিন্তু একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি, তুমি নিজ ইহার সমগ্র ভার লইলে আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অমরা দিল্লীতে তাহার জন্য ধৃতি-পাঞ্জাবী সংগ্রহ করিলাম এবং যথাসময়ে তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য একটি প্রকাশ্য সভা ডাকা হইল। ঐ সভায় উপহারস্বরূপ কাপড়গুলি তাহার হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল।

এন্ড্রুজের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি ছোটখাট জিনিষকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। তাহার বৈষয়িক জ্ঞান একেবারেই ছিল না। দিল্লীতে থাকিতে তাহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি শান্তিনিকেতনে পোর্ট অফিসে উপস্থিত হইয়া পোস্টমাস্টার বাবুর হাতে একটি লম্বা টেলিগ্রাম দিয়া বলিলেন, 'এটি এখনই পাঠাইয়া দিতে পারেন?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তাই দিতেছি'। পোর্টঅফিসের প্রাপ্য ফি দিবার সময় তাহার সমস্ত পকেটগুলি একে একে খুঁজিয়া দেখিলেন। শেষে পোস্টমাস্টার বাবুর দিক্ চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'সব শূন্য, কিছুই নাই। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি টাকা জোগাড় করিয়া আনিতেছি।' একথা শুনিয়া পোস্টমাস্টার বাবু হাত জোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মহাশয় এই খরচাটি আমাকে দিতে অনুমতি করুন, এটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। আপনাব কোনও কাজে লাগিয়াছি একথা মনে হইলেই মন আনন্দে পূর্ণ হইবে।'।

এন্ড্রুজ যখন সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে কাজ করিতেন তখন কলেজের পাশেই আর কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে মিশনের বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। এই সময়ে প্রত্যহই এন্ড্রুজকে লইয়া নতুন নতুন হাস্যকর গল্প শোনা যাইত। একদিন অধ্যাপকদের কমনরুমে একটি ২৩/২৪ বছরের যুবক অবাধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মিঃ এন্ড্রুজ, আপনি আমার মোজা নিয়াছেন। আমি সারা সকাল সব ঘরগুলি খুঁজিয়াছি, আমার মোজার শব্দ এক পাটি পাইলাম, অপর পাটি একটি অপরিচিত পায়ের, এখন বুঝিতেছি সেটি আপনার।' এন্ড্রুজ অবাধ হইয়া বলিলেন, 'সেকি, আমি তোমার মোজা নিতে যাব কেন?' যুবকটি সহাস্যে বলিলেন, 'মাফ করবেন।' তারপর একটি আঙুল মোজার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, 'এই দেখুন আমার নামের আদি অক্ষর।'।

এইরূপ কখনও কামিজ, কখনও রুমাল, কখনও খাতা, কখনও পেনসিল লইয়া প্রহসন চলিত। হারানো জিনিষ এন্ড্রুজের কাছেই পাওয়া যাইত। এন্ড্রুজের নিজের বলিতে কিছুই ছিল না। হাতের কাছে যাহা পাইতেন তাহাই ব্যবহার করিতেন। আবার কাহারো প্রয়োজন দেখিলে নিজের কথা চিন্তা না করিয়াই তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিতেন। এসব তো সামান্য জিনিষ, মূল্যবান জিনিষও তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এইরূপ যাহার দারিদ্র্য, তিনিই একবার—একটি ছেলেকে কেম্ব্রিজে পড়াইবার খরচ যোগাইবার ভার নিলেন। ছেলোট নিয়মিত টাকা পাইত এবং সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এন্ড্রুজ ঐ টাকা কোথায় পাইতেন? এমন লোক অনেক ছিল যাহারা এন্ড্রুজের কথায় দুই-চার হাজার টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু না হইলে নিজের প্রয়োজনে তিনি কাহারো কাছে হাত পাতিতেন না।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু আর একটি কথা না বলিলে এই প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা তাহার ধর্মবিশ্বাসের দিক। এন্ড্রুজ যখন শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন তখন একটি গুরুত্ব উঠিয়াছিল যে তিনি তাহার স্বধর্ম অর্থাৎ ক্রিস্চিয়ানিটি ছাড়িয়া দিয়ছেন। একথা একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি আজীবন ক্রিস্চিয়ান ছিলেন এবং

তাঁহার অল্লেখ্যশ্রীক্সিমা খৃষ্টধর্মমতে হয়। পরে তাঁহার সমাধিও ক্রিস্চান সমাধিক্ষেত্রে হইয়াছিল। এন্ডরুজ অতিশয় উদার মতাবলম্বী ক্রিস্চান ছিলেন। মনের উদারতার জন্য অনেক খৃষ্টানিটি কথাকেই তিনি অসার জ্ঞান করিয়া মনে স্থান দিতেন না। তিনি খৃষ্টে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহার স্বেচছা ছিল। তাঁহার মনে এই সব সম্ভেদ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার বিশপকে বলিয়াছিলেন এবং তিনি পাদ্রীর পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশপ এন্ডরুজের সব কথা শুনিয়া তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু পাদ্রীর পদত্যাগ করা ধর্মত্যাগ নহে। তিনি তাঁহার ধর্মত্যাগ করেন নাই। তিনি পাদ্রীর পোষাক ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু হৃদয়ে ক্রিস্চান শিক্ষা ও আদর্শ কখনও মলিন হইতে দেন নাই।

আমি প্রথম যখন তাঁহাকে দিল্লীতে দেখিয়াছিলাম তখন ক্রিস্চান ধর্মযাজকের পোষাকেই দেখিয়াছিলাম। আমার স্মৃতিতে তাঁহার সেই ছবি স্পষ্ট অঙ্কিত বহিয়াছে। পরে শান্তিনিকেতনে যখন দেখি তখন তিনি ধূতি পাঞ্জাবী পরিয়া খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই দুই রূপের মধ্যে কি পার্থক্য! কিন্তু

মানুষটি কি পৃথক হইয়া গিয়াছেন? তিনি ধর্মের বাহা সারবস্তু তাহাই আমৃত্যু রক্ষা করিয়াছেন। বাহিরের আবরণকে তুচ্ছভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা ইহাই লক্ষ্য করি। এই দুই বস্তু মध्ये যে প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা ইহাদের আত্মিক ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বোধ করি এন্ডরুজ সাহেবই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গুরুদেব কথটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি চিরকাল গুরুদেবের ভক্ত ছিলেন।

সেন্ট স্টিফেনস কলেজে থাকিতে নৈবেদ্য-এর একটি কবিতাকে এন্ডরুজ নিত্যপাঠ্য প্রার্থনারূপে গ্রহণ করেন। এখন পর্যন্ত এ প্রার্থনা সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রদের উপাসনায় তারা আবৃত্তি করেন। আমাদেরও ইহাই প্রার্থনা—

চিন্তা বেধা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির, ...

... ভারতেরে সেই স্বর্গে করে জাগরিত।

[দ্রঃ নৈবেদ্য ৭২]

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু এন্ডরুজের যুক্ত-হৃদয়ের এই প্রার্থনাটি স্মরণ করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিলাম।

বিশ্বভারতী ও সি এফ এন্ড্রুজ

শ্রীস্বাকান্ত রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সঙ্গে সি এফ এন্ড্রুজের সম্বন্ধ যে কি গভীর ছিল সে-খবর অনেকে জানেন, আবার অনেকেই জানেন না। এখন এমন একটা সময় এসেছে, যখন বাঙালীদের বিশেষ করে জানা উচিত, বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কয়েকজন ইংরেজের স্থান কী এবং তাঁদের কাছে বিশ্বভারতী কী পরিমাণ স্বর্ণী।

এন্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্বন্ধের বিষয় বলবার আগে তাঁর সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

ইংরেজী ১৮৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সি এফ এন্ড্রুজের জন্ম হয় ইংল্যান্ডে। তিনি তাঁর পিতা জন এডউইন এন্ড্রুজের দ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকাল থেকেই মাতাপিতার স্বীকৃতিতে প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-বিশ্বাসের আওতায় এন্ড্রুজের চরিত্রে ও মনে খৃষ্টীয় জীবনাদর্শ সক্রিয় ছিল। লেখাপড়াতেও বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন তাঁর সহপাঠী এবং শিক্ষকদের ভালবাসার পাত্র। সাহিত্য আর ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ-পাঠেই তাঁর উৎসাহ এবং আগ্রহ ছিল তা নয়, বাল্যকাল থেকে, কবিতা রচনা এবং ছবি আঁকার তাঁর ঝোঁক কম ছিল না। অনেক ছবি এঁকেছেন, অনেক কবিতাও লিখেছেন। তিনি ছিলেন কেমব্রিজের গ্রাঙ্গুয়েট এবং খৃষ্টীয় ধর্মযাজক। তিনি ১৯০৪ সালে ভারতে প্রথম আসেন দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক হিসাবে। উদারচেতা সত্যিকার খৃষ্টভক্ত এন্ড্রুজ সাহেবের মনে ভারতে এসেই লাগল দ্বন্দ্ব এবং নৈরাশ্যের ধাক্কা; তিনি দেখলেন মিশনারী স্কুল-কলেজেও শিক্ষক এবং অধ্যাপক নিষ্পত্ত করা হয় যোগ্যতার মানদণ্ডের বিচারে নয়, বর্ণ-বৈষম্যের বিচারে। তাঁর মতে শুনেছি যে, তিনি যখন দিল্লীতে এসে দেখলেন অধ্যাপক রেভারেন্ড স্দুশীল-কুমার রুদ্রের ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অধ্যক্ষ না করে করা হয়েছে উপাধ্যক্ষ, তখন তাঁর মন পীড়িত হয়ে উঠলো। তিনি অধ্যাপক

রুদ্রের মধ্যে শুধু যে একজন বিশ্বাস, পণ্ডিত দেখে-ছিলেন তা নয়, তিনি দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে একজন সজ্জন দয়ালু প্রেমিক মানুষ।

ভারতে এসেই এন্ড্রুজের মন বিচলিত হয়ে উঠলো ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের হীন মনোভাব দেখে, ভারতীয় দরিদ্রজনদের বিবিধ দুর্য-কষ্ট দেখে। ধীরে ধীরে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে, তাঁর জীবনকে, কর্মকে জড়িয়ে ফেললেন অত্যাচারীদের বিপক্ষতায় এবং অত্যাচারিতদের দুর্য-প্রশমনের রূপে। এই রূপে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বন্ধুত্ব আবদ্ধ হলেন ভারতীয় দেশহিতৈষী বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা মুনসীরাম (পরে স্বামী প্রমথানন্দ) প্রমুখ বহু দেশহিতৈষীর সঙ্গে হল তাঁর বন্ধুত্ব। এই সব বন্ধুদের কেউ কেউ তখন ডাবাছিলেন ইংরাজ শাসনের কবল থেকে কেমন করে ভারতকে মুক্ত করা যায়। কেউবা ডাবাছিলেন ইংরেজের শাসনের অধীনে থেকেই ভারতীয়রা কি পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেতে পারে। এই ভারত-হিতৈষী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমে গড়ে উঠল দু'টি দল। একদল দেশের কাছে পরিচিত হল “মডারেট” বলে; আর অন্যদল “এক্সট্রিমিস্ট” বলে। এই দুই দলের মনোভাবই আরও দুই রকম পরে দেশের কাছে পরিচিত হল “চেঞ্জার” আর “নো চেঞ্জার” এবং “নরমপন্থী” আর “চরমপন্থী” বলে। এই দুই দলেরই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এন্ড্রুজ সাহেবের যোগ হয়ে উঠল ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে এন্ড্রুজ সাহেবের মানসিক সুখ-শান্তির অনিশ্চয় ঘটেছিল। এন্ড্রুজ সাহেব বলেই তিনি ঐ আঘাতকে বারে বারে ষেখানে-সেখানে পেয়েও ভারতের প্রতি, ভারতীয়দের প্রতি, তাঁর অকৃত্রিম প্রেম, সক্রিয় সহানুভূতি হারান নি। কঠিন আঘাত পেয়েও, নিজেব খৃষ্টীয় স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি, অসহিষ্ণু হন নি; ধৈর্যের সঙ্গে, তপস্যার সঙ্গে নিজের সাময়িক ক্ষুদ্র-ভাবকে, অপমানিত বোধ করার ভাবকে, জয় করে-

ছিলেন। ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে যখন তিনি সরকারী নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে চাইলেন ইংরেজ কর্মচারী কর্তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধ হয়ে উঠলেন। আবার ভারতীয় অবাঞ্ছনীয় কতগুলি সেকলে সামাজিক সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের প্রতি যখন নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন তখন একদল ভারতীয়ই তাঁর বিরুদ্ধ হয়ে উঠলেন; শূদ্ধ বিরুদ্ধ হয়ে উঠলেন বঙ্গে যথেষ্ট বলা হয় না, তাঁরা তাঁকে হিতৈষীর ছদ্মবেশী স্পাই বা ইংরেজ সরকারের গুপ্তচর হিসাবে মনে করতে লাগলেন। এশ্বজের পক্ষে অবস্থাটা হল সত্যিই দুঃসহ। যাকে চলতি কথায় বলে “জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ।” ভারতীয়দের অনেকের কাছে হয়ে উঠলেন সন্দেহভাজন আর ইংরেজের কাছে হলেন সরকার-বিরোধী দুর্জয় দূশমন। এই দুর্ভোগের মধ্যে পড়েও ভারতীয় ধনী-দরিদ্রের প্রতি, বিশেষ করে দরিদ্রের প্রতি, অত্যাচারিতদের প্রতি তাঁর করুণীয় কর্তব্য থেকে বিরত হন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর সত্যধর্ম হলো জয়ী। ভারতবাসী জনসাধারণ, যাঁরা তাঁর প্রেমিক চরিত্রের পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁরা সানন্দে তাঁর নাম দিলেন “দীনবন্ধু এশ্বজ”।

ভারতে এশ্বজের বিচিত্র কর্মধারার ফর্দ সুদীর্ঘ। এতো দীর্ঘ যে তা নিয়ে একটি ভাল ইতিহাস লেখা চলে। সে রকম ইতিহাস লেখা হলে এই মহাসত্যকেই প্রমাণ করা হবে যিনি মনুষ্যের ধর্মে জাগ্রত বিশ্বের সকল মানুসই তাঁর আত্মীয়, তাঁর সেই আত্মীয়তাকে কোন সাম্প্রদায়িকতার গুন্ডী ধবংস করতে পারে না, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকসূত্রে জড়িত থেকেও সর্বসমাজের শ্রমধার আসন লাভের অধিকারী। এশ্বজের বিরাট জীবনকথা লেখবার উদ্দেশ্য বর্তমান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কি সূত্রে হল এবং সেই পরিচয়সূত্রে ধরে কৈমন করে তিনি বিশ্বভারতীর (অর্থাৎ শান্তিনিকেতন ও প্রীতনিকেতনের) সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেই কথাই বলব। বলব এই জন্য যে, দীনবন্ধু এশ্বজ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তখনকার আর্থিক দিক দিয়ে যে নিঃস্ব শান্তিনিকেতনে (উপহাসচ্ছলে আমি বলে থাকি নিঃস্ব ভারতীর যুগে) সেই শান্তিনিকেতনের বহুবাজারের অর্থসংকটের দিনে

তিনি তাঁর উক্ত ধনী বন্ধুদের কাছে গিয়ে অর্থসংগ্রহ করে এনে সেই সংকট প্রশমিত করেছেন। আশ্রমের হিতৈষী বন্ধুরূপে, রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হিসেবে— উপকারী হিসেবে নয়।

১৯১২ সালে এশ্বজের সঙ্গে বিলেতে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, ইংলণ্ডে চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টিনের বাড়িতে এক রবিবারের সন্ধ্যায়। ঐ সন্ধ্যায় আইরীশ কবি উইলিয়াম ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেছিলেন। ঐখানে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং এশ্বজ উভয়েই উভয়ের নামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন নানা বিষয়ের মাধ্যমে। সামান্যসামান্য কেউ কাউকে দেখেন নি। সেই সন্ধ্যা সম্মেলনে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজী তজ্জমা শুনে এশ্বজ হলেন মুগ্ধ। শূদ্ধ মুগ্ধ নয়; ঐ কবিতাগুলির মর্মবাণী এশ্বজ সাহেবের অন্তরে এক নতুন জগতের দৃশ্য এঁকে দিলে, এনে দিলে তাঁর চিন্তাধারায় এক নতুন ভাবের সঞ্চার।

তারপর শূদ্ধ হল দুজনের বন্ধুত্ব; এশ্বজ খুঁটান ধর্মযাজক হলেও ছিলেন সাহিত্যিক চিত্রশিল্পী এবং কবি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আধ্যাত্মিক মাধুর্য এবং গাম্ভীর্যে তিনি অতিমাত্রায় মুগ্ধ হলেন। সেই মুগ্ধতাবই তাঁকে উৎসাহিত করল রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসতে। বেশ মনে পড়ে সেদিনকার সেই দৃশ্য। ১৯১৩ কিম্বা ১৯১৪ সাল হবে, আমরা বর্তমান লাইব্রেরীর সামনে শালবীথিতে ক্রাসে বসে পড়াশোনা করছি এমন সময় সামনের কুয়ার কাছে (এখন সে কূপ বৃজিরে দেওয়া হয়েছে) দুজন দাড়ি গোফ কামানো সাহেব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন আর নিজেদের মধ্যে কি যেন বজাবলি করছেন। তখনকার দিনে বড় কেউ আশ্রম-বিদ্যালয় দেখতে আসতেন না। যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছাত্রদের অভিভাবকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর ২/৪ জন কবিভক্ত সাহিত্যিক এবং কবিরা আসতেন, যেমন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহেব-সুবারা কেউ আসতেন না। বিশেষ গরজে, পুঁজি বিভাগের আর গোয়েন্দা বিভাগের ২/১ জন শ্বেতাঙ্গ কচিং আসতেন। এই জন্য ঐ

সাহেব দুজনকে (তখনো আমরা অনেকেই জ্ঞানতাম না তাঁদের নাম) দেখেই আমাদের কয়েকজনের মনে হলো, বুঝিবা ওঁরা পদলিখ বিভাগেব বড়সাহেব গোছের কেউ হবেন। অবশ্য তারপর নামও টের পেলাম এবং ধীরে ধীরে আমাদের মনের মধ্যেও তাঁরা তাঁদের সত্য পরিচয় গাঢ় করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সত্য পরিচয় গাঢ় করতে লাগলেন এইজন্য বলছি কারণ এন্ড্রুজ এবং পিয়ান্সন যে সরকারী স্পাই বা গুপ্তচর নন এই বিষী ধারণাকে মন থেকে মুছে ফেলতে আমাদের বেশ সময় নিয়েছিল। এই ধারণা অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের অনেকের মধ্যে অল্পবিস্তর থাকার জন্যে আমাদের অনেক রকম ভালকাজের মধ্যে তাঁদের সহযোগিতাকে আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের এই মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা অনেক ধমক খেয়েছি। অবশেষে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে (এন্ড্রুজকে) স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি অর্থাৎ এন্ড্রুজ আমাদের যতই তাঁর আপন জন বলে মনে করেন প্রকৃত পক্ষে আমরা অনেকেই তাঁকে — বলে অন্তরে মেনে নিইনি। উঃ সেদিন এন্ড্রুজ সাহেবের কি নিদারুণ মর্মবেদনা। যাঁরা তাঁকে সন্দেহ করতেন না, ভক্তি করতেন, শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা তাঁর দৃষ্টি দেখে বিচলিত হলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর ঐ স্পষ্ট বাক্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেননি। এমনকি একজন এমন মন্তব্যও প্রকাশ করেছিলেন যে, ঐ স্পষ্ট-বাক্য সত্যতার অতিশয়তার গর্বেষ্টি। সেদিন সারারাত্রি এন্ড্রুজ সাহেব ঘুমোতে পারেন নি, কিছুক্ষণ শয়ন কক্ষের বারান্দায় বা শয়ন গৃহের সামনের রাস্তায় পায়চারী করেই রাত কাটিয়ে দিলেন কিন্তু পরে ধীরে ধীরে গান্ধীজীই তাঁকে নানাকাজে টেনে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, সত্য স্বপ্রকাশ হলেও মানুষ দ্রাস্ত ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে সত্যের দানকে গ্রহণ করতে পারে না;—যে গ্রহণ করতে পারে না ক্ষতি হয় তারই। আর সত্য সত্যই, সত্য লাভ-লোকসানের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ভালবাসা এন্ড্রুজ সাহেবের মনের ক্ষতে দিত শান্তির প্রলেপ। বলতে গেলে ১৩১২ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এবং এন্ড্রুজের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ সূর্য হু হু এবং দিন যতই যেতে লাগল এন্ড্রুজ ততই শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে

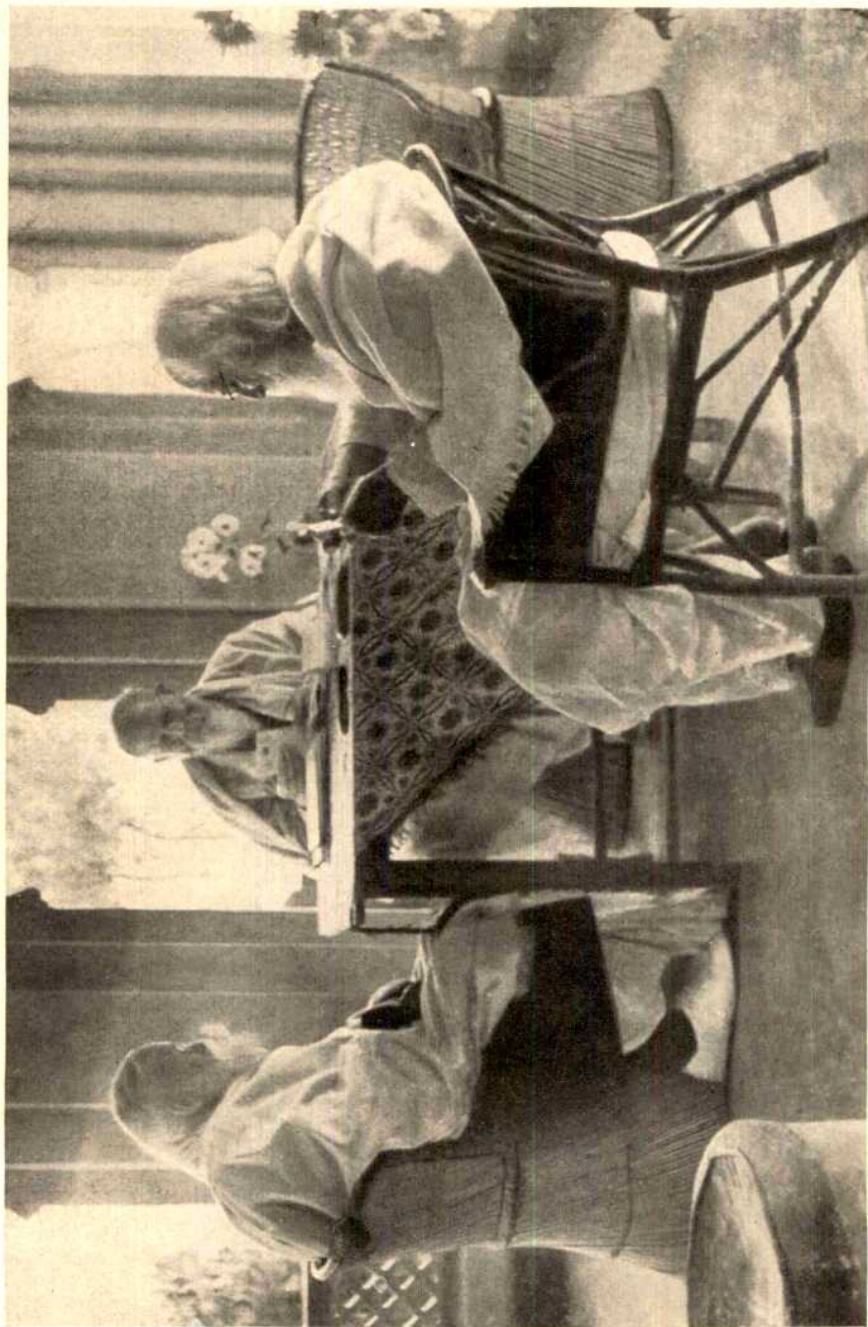
উঠতে লাগলেন। একাত্ম হলেও উইলিয়াম পিয়ান্সন আশ্রমের ছাত্রশিক্ষকদের সঙ্গে যতটা মিলে মিশে গিয়েছিলেন এন্ড্রুজ তা পারেন নি। না পারার কারণ তিনি বাংলাভাষা শিক্ষার দিকে ততটা উৎসাহী ছিলেন না এবং বাংলাভাষার কথাবার্তা বলতেও পারতেন না, দ্বিতীয়ত তিনি আশ্রমে বাঁধাধরা কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন নি। কখনো তাঁকে আশ্রমে একটানা এক-মাস সময় পর্যন্ত থাকতে দেখেছি মনে পড়ে না। শেষ-বয়সে শ্বায়ী আস্তানা ছিল বটে শান্তিনিকেতন। কিন্তু সে আস্তানায় তিনি থাকতেন শান্তি আর বিশ্রাম নেবার জন্য, পাখি যেমন থাকে নীড়ে। নিরলস কর্মী এন্ড্রুজের প্রাণ কেঁদে বেড়াতো দৃঃখীর দৃঃখ প্রশমনের উপায় সম্বন্ধে। তাই তিনি স্থিরভাবে কখনো একজায়গায় থাকতে পারতেন না। ছুটে বেড়াতে কতবার তাড়নাব কখনো দক্ষিণ আফ্রিকা, কখনো চায়নায়, কখনো ফিজিতে, কখনো আসামে, কখনো উড়িষ্যায়, কখনো পাঞ্জাবে, কখনো দিল্লীতে কখনো নাগপুরে, কখনো কলকাতায়, কখনো লক্ষ্ণৌ, কখনো বিলেতে, কোথায় যে কখন হুট কবে যেতেন আর কখনই বা ফিরে আসতেন শান্তিনিকেতনে তার ঠিক খবর রাখা মুশকিল হতো আমাদের। তিনিও সব সময় পূর্ব থেকে জানতেন না যে হঠাৎ তিনি কালকেই যাবেন দিল্লী কিম্বা বোম্বাই। ষাণ্ডা দরকার মনে হলেই হল,—অমনি হাতের কাছে গুছিয়ে নেবার মত যা কিছু জুটল তাই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, সময় অসময়ের বাদ বিচার থাকত না অনেক সময়। মনে পড়ে একবার হঠাৎ রাতে এসে আমাব কাছে হাজির, সাহেবের প্রার্থনা একটা কম্বল চাই। কি আর করি নিজের কম্বলটাই দিলাম। সাহেব যাবেন দিল্লী, পাতবার আর গায়ে দেবার মত প্রয়োজনীয় কম্বল নাই তাঁর, অথচ ঐ দিনই দিল্লী যাবেন। দিলাম বটে কম্বল কিন্তু ফেরৎ পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে। তাঁর নিজের জিনিষ কখন কোথায় রাখেন, কোথায় হারিয়ে আসেন তার ঠিক তো থাকতোই না, পরের জিনিষ নিয়ে তাও এর বাড়ি তার বাড়ি ফেলে আসায়ও ছিলেন ওস্তাদ। কিন্তু আমার ভাগ্য জোরে কয়েকদিন পরেই পেলাম কম্বল। বাবুচাঁ জহুরী একটি কাগজে মোড়া কম্বল অমাব হাতে দিয়ে বললে, এই নিন আপনার কম্বল। প্যাকেট খুলে যা পেলাম সেটা কম্বলই তবে দামী ও

প্রশস্ত। কম্বলটি আমার নয়। ভাল করে খুঁলে ফেলে দেখলাম,—দেখলাম চার কোণার একটি কোণায় ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে এস, কে, রুদ্র। যখন সাহেবকে বললাম, এ কম্বলটি আমার নয়, তিনি বেশ নির্বিকার-ভাবে মৃদু হেসে যা বললেন তার সহজ সরল অর্থ, কম্বল দিয়েছিলে কম্বল ফেরৎ পেয়েছ, ব্যস, তোমার কম্বল কোথায় হারিয়েছি জানি না। জেনেশুনে এই কম্বল নিয়ে এলাম, কারণ রুদ্র সাহেবের কম্বলের অভাব নাই। নিজের কম্বলটিও তিনি কিছূদীন পূর্বেই দান করেছিলেন রোগ কাতর একটি স্থানীয় মেথরের স্ত্রীকে। মৃত্ত হস্তে দান করতেন, কিন্তু সব সময় খোঁজ থাকত না যা দান করতে চান সেই সম্বল পকেটে আছে কিনা। দানের প্রতিশ্রুতি একজনকে দিয়ে আর একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন। যাকে অর্থদান করে সাহায্য করতেন সহজে তাকে একথা অনুভব করতে দিতেন না যে তাকে কিছূ ভিক্ষা দিয়েছেন। আমার কোন বিশেষ বন্ধুকে (বন্ধুটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায়) তিনি সাহায্য করতেন কখন দশটাকা কখন বা পনের টাকা দিয়ে। কিন্তু সে দান যেত সেই বন্ধুর কাছে আমার হাতে। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত টেরই পান নি এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁকে ঐ টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। এণ্ড্রুজ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন তাঁর সত্যতার জন্য কতব্যে নিষ্ঠার জন্য। বন্ধুটির সঙ্গে এণ্ড্রুজের তেমন ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল না। কারণ বন্ধুটি ইংরাজীতে কথা বলতে পারতেন না, তায় আবার ছিলেন সরকার-বিরোধী বিপ্লবীদের বন্ধু আর ছিলেন বেশ একটু ইংরেজ-চটা। এণ্ড্রুজ সেটা জানতেন, সেই জন্য আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, আমি যেন বন্ধুটিকে জানতে না দেই যে তিনি ঐ অর্থ সাহায্য এণ্ড্রুজের কাছ থেকে পাচ্ছেন। এণ্ড্রুজের এই অনুরোধ আমি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারি নি—নিজের বিবেক-বিবেচনার জন্য। বন্ধুটিকে একদিন বলেই ফেললাম যে-কৃতজ্ঞতা তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেন সে-কৃতজ্ঞতার শ্রদ্ধা আমার প্রাপ্য নয়,—প্রাপ্য এণ্ড্রুজ সাহেবের।

এই এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে শেষটায় আমাদের সম্বন্ধ এতই মধুর এতই সত্য এবং গভীর হয়েছিল যে, আমরা কেউ-কেউ পরিহাসচ্ছলে নিজেদের মধ্যে বলতাম সাহেব আমাদের ছোট গুরুদেব।

এই এণ্ড্রুজ সাহেব যে শূদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, বিধু-শেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিত্তিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায় প্রমুখ শাস্তিনিকেতনের কর্তাব্যক্তিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তা নয়। স্বনামখ্যাত তত্ত্ব-জ্ঞানী ঋষি শ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এণ্ড্রুজ সাহেবকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন। এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁকে বড়দাদা বলতেন এবং যতদিন আশ্রমে থাকতেন, রোজই সমস্ত স্বেচ্ছামত বড়দাদার কাছে গিয়ে পাশেই চেয়ারে বসে বড়দাদাকে খবরের কাগজের খবর পড়ে শোনাতে, নানা রকমের মজার গল্প হত দুজনের মধ্যে। আর দুইজনই খুব হাসতেন যখন বৃদ্ধ শ্বিজেন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে সাধারণ খৃষ্টধর্ম-স্বাক্ষরদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহের অতি-শয়তাকে ব্যঙ্গ করতেন। ব্যঙ্গ করেই শ্বিজেন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজের গায়ে হাত চাপড়ে নিজের হাসি দিয়ে তাল মেলাতেন, এণ্ড্রুজও খুসী হতেন বড়দাদার ব্যঙ্গমতের সঙ্গে একমত হয়েই,—বড়দাদাকে খোশামোদ করবার জন্য নয়। বড়দাদার কাছে কোন কারণে এণ্ড্রুজ সাহেব ঠিক সময়ে উপস্থিত না হলে বড়দাদা হতেন উদ্ভ্রান্ত, তক্ষুণি লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিতেন, এণ্ড্রুজ সাহেবের। এতই ভালবাসতেন।

বিশ্বভারতীর এবং ভারতের এই পরম হিতৈষী বন্ধু এণ্ড্রুজ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন হাস-পাতালে কলকাতায়। যে রোগের জন্য তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল সেই একই রোগের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেহেও অস্ত্রোপচার হয়েছিল কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অস্ত্রোপচার সত্ত্বে দুই জনই আর এলেন না ফিরে শাস্তিনিকেতনে,—দুই জনই চলে গেলেন অমর লোকে, এণ্ড্রুজ গেলেন ১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল আর রবীন্দ্রনাথ গেলেন ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে বাংলা ২২শে শ্রাবণে।



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সি. এফ. এণ্ড জু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার্লস ফ্রীয়ার এন্ডরুজ ইংলন্ডের কেম্ব্রিজের উপাধিধারী এবং তথাকার পেন্সনাক কলেজের ফেলো ছিলেন। তিনি যৌবনেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচাবার্থ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সেন্ট স্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন তিনি অন্যান্য পাদরীদের মত রেভারেন্ড উপাধিভূষিত ছিলেন। পরে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। তাহা করিলেও তাঁহার চরিত্র ও জীবনের দ্বাৰা সত্য খ্রীষ্টীয় আদর্শ সেরূপ প্রচারিত হইয়াছে অল্প পাদরী বা সাধারণ খ্রীষ্টানের দ্বাৰাই তাহা হইয়া থাকে। তাঁহার নামের তিনটি আদ্য অক্ষর “সী”, “এফ” এবং “এ” “Christ’s Faithful Apostle” (খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসী প্রেরিত-পদ্রুঘ) এই আখ্যায়ই আদ্য অক্ষর-গ্রন্থ। ইহা যিনি বলিয়াছিলেন তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। কারণ, খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র যে আদর্শের ছিল বলিয়া শ্রদ্ধাবান খ্রীষ্টীয়ান ও অ-খ্রীষ্টীয়ানগণ মনে করেন এন্ডরুজ সেই আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা আমরণ করিয়া গিয়াছেন।

সেই আদর্শের একটি অংশ, যাহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, নিষ্প্রাণ, দীনহীন, তাহাদের সহায় হওয়া। এন্ডরুজ এইরূপ সকল মানুষেব বন্ধু ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে যে ‘দীনবন্ধু’ নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহা সার্থক।

দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ফিজিতে এবং অন্যান্য উপনিবেশে দূরগত ভাবতীয়দের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বহু দৃষ্টি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে ভারতীয়দের অবস্থার যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, তাহার প্রশংসার বহু অংশ এই সার্থক-নামা দীনবন্ধুর প্রাপ্য। ব্রিটিশ গিযানা হইতে যে-সব ভাবতীয় শ্রমিক ভাবতে স্থান ও সুখশান্তি পাইবাব আশায় ফিবিয়া আসিয়া নিরাশ হইয়া মাটিয়াবদ্রুজে দৃষ্টি দিনপাত কবে, তাহাদের খবর পৰ্যন্ত ভারতীয়বা অল্প লোকেই জানে, কিন্তু দীনবন্ধু তাহাদের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেন, বড় লাটসাহেব ও তাঁহার পরিষদের নিকট দোঁড়াদোঁড়ি করিতেন।

বিহাবের চম্পারনের নীলকর-পীড়িত প্রজাদের সহায় তিনি ছিলেন। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের তিনি কমিষ্ট বন্ধু ছিলেন, বহুবাব প্লাবন ও দর্ভিক্ষ-পীড়িত উড়িষ্যার স্থায়ী দৃঃখমোচন-ব্যবস্থার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন উত্তরবঙ্গেব অবিস্মরণীয় প্লাবন-পীড়নের সময়ও তিনি দূরগতদের বন্ধুবরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাব জীবনচরিত লিখিতেছি না, সুতরাং তিনি যে কোথায় কি কি করিয়াছিলেন তাহা এখন লেখা যাইবে না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন, তাহার তো হিসাবই পাইবাব জ্ঞো নাই। তিনি অনুগ্রাহক মনুষ্যবরূপে কিছুর করিতেন না কখনও, ভাই বা সেবকরূপে করিতেন। প্রভুজ্ঞাতি-সুলভ মনুষ্যবান্যনার ভাব বর্জন করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। যাহা করিতেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদেশে বা পরামর্শে করিতেছেন যথাসম্ভব এইরূপ বলিতে চেষ্টা করিতেন—সংস্কারের প্রশংসা নিজে লইতে চাহিতেন না।

ইহা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে কোন কোন প্রধান বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়েরই সহিত দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল; রবীন্দ্রনাথ ছিলেন “গুরুদেব”, গান্ধীজী “মোহন”। হৃদয়মনের যে ওদার ও বিশালতা তাঁহাকে এই উভয় পদ্রুঘপ্রবরকে শ্রদ্ধাভক্তি দিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তিনি সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ করিতে ও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

আজকাল সচরাচর পরিচিত লোকমাগকেই অনেক সময় বন্ধু বলা হয়। দীনবন্ধু তাঁহার অন্তিম বাণীতে ভগবৎকৃপার যে বহু বন্ধুলাভেব সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, সে বন্ধুত্ব প্রকৃত বন্ধুত্ব। সে-সৌভাগ্য তাঁহাব হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়েব অগাধ প্রেমের অফুরন্ত ভান্ডারের গুণে। প্রেম দিতে তাঁহার কৃপণতা ছিল না। যাহাকে বন্ধু মনে করিতেন, এমন কেহ উপেক্ষা করিলে, ওদাসীনা দেখাইলে, এমন কি কঠোর আঘাত করিলেও,

তাহার প্রেম বিমুখ বা ভিন্নমুখ হইত না, ইহা বেদনা-মিশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতে পারি। এ-বিষয়ে তাহার অসাধারণ মহানুভবতা ও সদাশয়তা ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহ অসামান্য ছিল। মহামতি শ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বড়দাদা বলিতেন। শ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখনই এন্ডরুজ শান্তিনিকেতনে থাকিতেন, প্রত্যহ বড়দাদাকে দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেন এবং তাহার সহিত চা খাইতেন। বড়দাদার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের কেবলমাত্র দুইটি উদাহরণ দিতেছি—অধিক স্থান ও সময় নাই। একদিন, কি কারণে জ্ঞান না, শ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভুজ্ঞাতির উপর চটিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় এন্ডরুজ তাহাকে প্রণাম করিয়া ইংরেজীতে নিত্যকার প্রশ্ন করিলেন, “বড়দাদা কেমন আছেন?” বড়দাদা ইংরেজীতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে বৃন্দ স্বদেশ-ভক্তের এই মতই প্রকাশ হইল যে, প্রভুজ্ঞাতির সব লোক এই দেশ হইতে বিতাড়িত না হইলে কোনও সুখশান্তি নাই! এই ব্যাপারটির বর্ণনা করিতে গিয়া এন্ডরুজ শ্বিজেন্দ্রনাথের পোঁত দিনেন্দ্রনাথকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “I say Dinoo, your grandfather is terrible”। আর একদিন এন্ডরুজের সহিত আমিও শ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন, তিনি কি কারণে জ্ঞান না খ্রীষ্টীয়ান পাদরীদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিবার পর, পাদরীদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার বিষয়ে শ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্দীপনার সহিত অনেক কথা বলিলেন—ইহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, এন্ডরুজ এক সময় বস্তৃত্য পাদরী ছিলেন। পরে বড়দাদা আবার শাস্তভাব ধারণ করিলেন। আমবা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথে নানা কথাবার্তার মধ্যে এন্ডরুজ বেশ প্রসন্ন মনেই বলিলেন, “We had a very interesting talk from Bara Dada this evening.”

রবীন্দ্রনাথের উপর এন্ডরুজের ভক্তি ও প্রীতিব প্রগাঢ়তা, প্রাবল্য ও অচণ্ডল সৈধ্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ তাহা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রিয়তর ও নিকটতব হয়, এই সম্ভাবনার চিন্তাও যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। নারীসুলভ একনিষ্ঠ প্রেম এই

বর্ষীয়ান চিরকুমারের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল।

সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত সুদীর্ঘকুমার রুদ্র দীনবন্দ্যু অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন অভিন্ন হৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ের একটি নাতনীর যখন জন্ম হয়, তখন এন্ডরুজ আমাকে স্পর্ধার সহিত লিখিয়াছিলেন, “এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি।”—কারণ তিনি বোধহয় মনে করিতেন আমার অনেকগুলি নাতনী আছে বলিয়া আমি অহঙ্কৃত। সে-বিষয়ে আমার কণ্ঠস্থত সমকক্ষতা এই স্পর্ধিত উত্তির কারণ।

তিনি শান্তিনিকেতনে আগে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিম্বান, সুশিক্ষক এবং গদ্যে ও পদ্যে বহু পুস্তক ও সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের সুলেখক ছিলেন। বালকেরা তাহাকে অতিশয় ভালবাসতেন। বলা বাহুল্য, তিনিও তাহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন এবং সকল বিষয়ে স্বাধীন ও নিষ্ঠার চিন্তা করিতে ও লোক-হিতকর কাজ করিতে উৎসাহ দিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত দিবার সামর্থ্য থাকিলেও দিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষের লোকদের সহিত অভিন্নতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল। সরকারী ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার সময় তিনি নিজের জাতীয় পোষাক পরিভেন। অন্য সব-সময়ে তিনি দেশী পরিচ্ছদ—ধূতি পিরান চাদর ব্যবহার করিতেন। তাহাতে কোনও পরিপাটী ছিল না। গলার বোতাম খোলাই থাকিত। শান্তিনিকেতনের কঙ্করাকীর্ণ পথে-মাঠে অনেক সময় খালি পায়েই চলিতেন, কখন কখন চটিজুতা পায়ে থাকিত।

এই লেখাটার গোড়ায় তাহার সম্যাস গ্রহণের কথা বলিয়াছি। তাহার হৃদয়, মন ভারতীয়মুখী না হইলেও হয়ত তিনি বিষয়াসক্তিশূন্য মানু্যই থাকিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে—বিশেষতঃ বাংলাবিশেষকে—স্বদেশ-করিয়া বরণ করিবার পর তিনি ভারতীয় অর্থেই সম্যাসই হইয়াছিলেন। কোন আয় ও সম্পত্তির উপর তাহার আসক্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একবার এন্ডরুজের সমক্ষে পবিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, “আপনার যদি কোন জিনিষ হারাবার দরকার থাকে, তা হলে সেটা এন্ডরুজকে দেবেন।” এন্ডরুজ তাহা শুনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, “No, no, Gurudev,

you are very mischievous.” কিন্তু বাস্তবিকই কোন জিনিস আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধাকা তাহার প্রকৃতি-বিবৃদ্ধি ছিল।

তিনি উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশেই জীবনের বহু বৎসর কাটায়াছিলেন। শেষের দিকে দক্ষিণ-ভারতেও কিছুকাল কাটায়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতেছিলেন।

তিনি ভারতীয় বহু সমস্যা মানবিকতার দিক হইতেই আলোচনা করিয়া সেই দিক হইতেই তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন, সাক্ষাৎভাবে রাজ-নৈতিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিতেন না—যদিও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান বিচক্ষণতা তাহার খুবই ছিল। কিন্তু তিনি যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিউতে লিখিত তাহার একটি প্রবন্ধ হইতে (পৃষ্ঠা—১৫৬) নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

Every year now passes in India, without removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called “Immediate Need of Independence” where I emphasised the word. “Immediate” and I hold fast to every word which I then wrote.

Nearly twenty years have passed since that date and hopes deferred have made the heart sick. Things in India have deteriorated as Prof. Seely prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soil, and the strain must be relieved at once.

এরূপ মানুষকে অধিকাংশ সাধারণ ইংরেজ—বিশেষতঃ ভারত-প্রবাসী ইংরেজরা ভালবাসিতে পারে

না। লর্ড বিশপ মহোদয় যে প্রত্যহ তাঁহাকে রোগশয্যাতে দেখিতে যাইতেন এবং গির্জায় তাহার শ্রাদ্ধিক উপাসনা করিয়া সমাধিস্থান পর্যন্ত পদক্ষেপ গিয়া সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন ইহা তাঁহার (লর্ড বিশপের) বন্ধুপ্রেম ধার্মিকতা ও মহানুভবতার প্রমাণ। গির্জাতে ও সমাধিস্থানে অ-পূরোহিত ইংরেজ অতি অল্প জনই উপস্থিত ছিলেন; অধিকাংশই ভারতীয়।

স্বাধীন দেশের লোকদের ইহা একটি সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকার যে, তাঁহাদের হৃদয় অন্য দেশের লোকদের দৃষ্টি ও সক্রিয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইতে পারে। দীনবন্ধু এই সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি, সাধারণতঃ ভারতীয় ইংরেজরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক বিরল। তিনি জানিতেন স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন বৃটেনের মৈত্রীর চেয়ে বৃটেনের পক্ষে (এবং জগতের পক্ষে) অধিকতর কল্যাণকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উভয় দেশের স্বাধীনতার ভিত্তির উপর নির্মিত মৈত্রীসৌখের স্থপতি তিনি হইতে চাহিয়াছিলেন। সৌখ নির্মিত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও হয়, দীনবন্ধুর বৈদেহী আত্মা আনন্দিত হইবেন।

যে-সকল ইংরেজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন না, তাঁহারা জানেন না, বৃটেন না, দীনবন্ধু এন্ডরুজের মত প্রতিনিধি পাওয়া একটা জাতির কত বড় সৌভাগ্য। তিনি জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর, বিশ্বমৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ও ভারতের সম্পর্কে সব কাজ এইরূপভাবে করিতেন যেন নিজ জাতির সব দৃষ্টিভিত্তি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা প্রায়শ্চিত্ত মনে করিব না, তিনি আমাদেরকে মৈত্রী ও হিতকারিতার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিব।

তাঁহার স্নেহভাজন পরলোকগত শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি এখন নব-জীবনের ও নববর্ষের উৎসব করুন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বেতারভাষণ

দীনবন্ধু এন্ডরুজ মহাশয় সম্বন্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে আমার মত একজন মানুষের পক্ষে, যিনি তাঁর বন্ধু হওয়ার অযোগ্য হ'লেও যাকে তিনি বরাবর বন্ধু ব'লেই মনে করে সেই রকম ব্যবহার করেছেন। শুধু আমার সঙ্গে যে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা নয়, আমার একটি পুত্রকে ছাত্ররূপে পেয়ে তাকে যে স্নেহ ও উৎসাহ দিচ্ছিলেন তাও আমার এখন মনে পড়ছে। সেই সকল কথা মনে পড়ে আমার তাঁর সম্বন্ধে ভালো করে কিছু বলতে সামর্থ্য জোগাচ্ছে না।

তাঁকে যে দীনবন্ধু নাম দেওয়া হয়েছিল তা সার্থক। তিনি ষাঁশদুখট্টেব যে আদর্শ হৃদয়ে পোষণ কবতেন, সে আদর্শ কথার ধারা প্রচার না করে নিজের জীবনের দ্বারা প্রচার করার চেষ্টা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করে গেছেন।

আমরা কখনও মনে করি নি যে এত শীঘ্র তাঁর মৃত্যু হবে, কারণ আমার মনে পড়ে যখন তিনি পীড়িত হয়ে কলকাতায় এলেন তার কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তাঁকে আমি দেখেছি সুরঙ্গের শ্রীনিবেশ থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত দেড় মাইল দু' মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসা করতে।

অনুশোচনাতে কোনও ফল নেই। তাঁর মহৎ জীবন তিনি যাপন করে গেছেন এইভাবেই যেন তাঁর জাতির দ্বারা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে অপরাধ হয়েছে তারই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে

এখন কিছু ভাবা উচিত নয়। আমরা যে তাঁর কাছে কত ঋণী কত দিক দিয়ে সেই কথাই আমরা বিশেষ করে ভাববো। আমার ব্যক্তিগত ঋণের কথা কিছু বলছি না। ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ করে ভারতবর্ষের যে সকল দরিদ্র হীন অবস্থার লোক, অত্যাচারিত লোক বিদেশে উপনিবেশে বাস করে তাদের জন্য তিনি যা পরিশ্রম করেছেন আমাদের ভারতবর্ষের কোন লোক সেই রকম করে নি; কেবল মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্য করেছিলেন, অন্য উপনিবেশে ততটা করতে পারেন নি। তাঁর হৃদয়ের উদাৰতা ও প্রশস্ততা ছিল এরূপ যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন, মুসলমান ছিলেন, জৈন ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন, খৃষ্টীয়ান ছিলেন; আজ যে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হ'ল সকল ধর্মাবলম্বী লোক তাতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বোধহয় যদি আগে থেকে খবর পেতেন তাহ'লে এত বেশী লোক যোগ দিতে ইচ্ছা করিতেন যে জনতা সামলানো কঠিন হয়ে উঠত। তিনি স্বে-শান্তি চেয়েছিলেন সে-শান্তি এখন পেয়েছেন। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ব্রিটেন এই উভয়েব মধ্যে মৈত্রী তাঁর কাম্য ছিল। তিনি সেই মৈত্রী দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু যখন এই মৈত্রী স্থাপিত হবে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ব্রিটেনের মধ্যে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর স্বর্গগত আত্মা পরম আনন্দ ও পরম শান্তি উপভোগ করবেন।

(কলিকাতার বেতার-বক্তৃতা।)

৫-৪-৪০

একটি চিঠি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণকমলেশ্বর,

আপনি যে-ভাবে মৃত্যুকে দেখেছেন সেই দৃষ্টি সামনে রেখে শোকের অতীত স্মিতসুন্দর সর্বদা কল্যাণকর প্রাণের মূর্তি মনে রাখতে চেষ্টা করি—সেই মূর্তি যা আমাদের কাছে সত্যকালের চিরকালের এন্ডরুজ। কোনো ঘটনা তাঁকে দূরে নিতে পারে না এই কথা ভাবতে চেষ্টা করি। রোগযন্ত্রণায় পরি-
বর্তিত চেহারা যেমন তাঁর সত্য চেহারা নয়, তেমনি অভাবের শূন্যতার তাঁর হারানো কর্মও আমাদের কল্পনামাত্র—যে-কর্মের শুদ্ধতা তিনি সামনে রেখে-
ছিলেন তার ক্রিয়া চলবে। এই কথা ভাবতে চেষ্টা করি কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা বারে বারেই মহান মৃত্যুর স্বরূপকে ঢেকে দেয়।

অপারেশনের পূর্বাঙ্কে তিনি বারম্বার বলেছিলেন—আমি প্রস্তুত, কোনো সংশয়, কোনো সন্দেহ নেই আমার মনে। হঠাৎ আশ্চর্য শক্তি এসেছিল তাঁর মধ্যে—সচরাচর মৃত্যু বা শারীরিক বেদনার প্রসঙ্গে তাঁকে কাতর হতেই দেখেছি। সেই শক্তির শান্ত ফলে বারে বারে তিনি আপনার নাম করেছেন এবং বলেছেন, এই দান

আপনার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন ভারতবর্ষ, যা পেয়ে প্রথম তাঁর জীবন একেবারে বদলে গেল, অতি সহজ করে এই কথা তিনি বলেছিলেন। বলতে গিয়ে আমি সে-ভাষা রাখতে পারি না। যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে যেন তাঁর শেষ মনোভাব আপনাকে জানাই এই তাঁর ইচ্ছা ছিল—তাঁর ইচ্ছামত ছোট করে কলাইন কাগজে দিয়েছি, অপারেশনের আগে লিখে নিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, অসামান্য সেবা করেছে নার্স এবং একটি নবাগত হিন্দুস্থানী বোয়ারা। যে-ভালোবাসার শক্তিতে সর্বত্র সেবার ইচ্ছা জাগিয়েছেন তাই আজ মনে পড়ে—কত দেশে অদৃশ্য প্রচ্ছন্নভাবে তার ক্ষুদ্রবৃহৎ ক্রিয়া চলবে।

দেশের এবং জাতির কি দায়িত্ব তা জানি না, মনে মনে যে ছোট একটি সৌরভময় দিগন্ত রচনা করে গেছেন তার মাধুর্য জীবনে রাখতে চাই চিরদিন। অকৃত্রিম কল্যাণকারী বন্ধুত্বের সেই দান। অনেক সময় মনে হয় এত বড়ো মহার্ঘ জিনিস রাখবার মতো জায়গা কোথায়!...

পদ্মরী, ৬-৪-৪০

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন পত্রিকা

এন্ড্রুজ প্রসঙ্গ

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্ত C. F. Andrews ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ভার লইবেন।

শ্রাবণ ১৩২৬

বিশ্বভারতী সংবাদ

শ্রীযুক্ত সি. এফ. এন্ড্রুজ মহাশয় ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রতিদিন ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতেছেন।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

সংবাদ

এন্ড্রুজ সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিয়াছেন, আগামী মার্চ মাসে আশ্রমে ফিরিবার কথা।

পৌষ ১৩২৬

সংবাদ

আমাদের অধ্যাপক সি. এফ. এন্ড্রুজ সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রার পূর্বে আশ্রমে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এন্ড্রুজ সাহেব তারযোগে জানাইয়াছেন তিনি মার্চ মাসের শেষে আশ্রমের কাজে যোগ দিবেন।

মাঘ ১৩২৬

বিশ্বভারতী

ষাণ্মাসিক বিবরণ

১৮ই আষাঢ় হইতে ৭ই পৌষ ১৩২৬ সাল

শ্রীযুক্ত C. F. Andrews সাহেব ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন গ্রীকভাষাও শিক্ষা দিয়াছেন।

চৈত্র ১৩২৬

সংবাদ

মিঃ এন্ড্রুজ আগামী এপ্রিল মাসে ও মিঃ পিয়ার্সন আগামী অক্টোবর মাসে আশ্রমে আসিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রাবণ ১৩২৭

লোকমান্য টিলক মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিলেই সেদিনকার মত অধ্যাপনার কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ, বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন।

আশ্বিন ১৩২৭

এন্ড্রুজ সাহেব ৭ই অক্টোবর আশ্রম হইতে ডালটন-গঞ্জে গিয়াছেন। সেখানে তিনি Behari Students' Conference-এ সভাপতিত্ব কার্য করিয়া দিল্লী, সিন্ধু, করাচি ও বোম্বাই অঞ্চলে গমন করিবেন।

অগ্রহায়ণ ১৩২৭

৭ই পৌষের উৎসবের পর হইতে বিদ্যালয়ে নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। আগামী বৎসরের কার্য-পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ সর্বাধ্যক্ষ ও কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

সর্বাধ্যক্ষ—শ্রীজগদানন্দ রায়

কার্যনির্বাহক সভার সভ্যগণ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য—বিশ্বভারতী

শ্রী সি. এফ. এন্ড্রুজ—অর্থবিভাগ

শ্রীসন্তোষ মজুমদার—শিক্ষাবিভাগ

শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ—ছাত্র-পরিচালনা

শ্রীসুধেশ্বরনাথ কর—পুস্তকবিভাগ

ভারতবর্ষের ভিতরের ও বাহিরের নানা স্থান হইতে শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ সাহেবের নিকট আহ্বান আসিতেছে।

কিছুদিন আগে আলিগড় কলেজের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করিয়া দিবার জন্য তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই পূর্ণা নগরীর ছাত্র-সম্মিলনের সভাপতি হইবার আমন্ত্রণ আসিতেই তথায় গিয়াছেন।

পৌষ ১৩২৭

বিশ্বভারতীর ২য় বার্ষিক বিবরণ—বিধুশেখর শাস্ত্রী
আমি এইবার বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মহাশয়গণের প্রত্যেককেই তাঁহাদের উদ্যম উৎসাহ পরিশ্রম পরামর্শ ও অধ্যাপনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক এখানে শুভাগমন করিয়া শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা অতি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটিমাত্র কর্তব্য আছে; শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেবের কথা বলিব না, কিন্তু শ্রীযুক্ত মরিস, শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সরদেশমুখ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া আমি বিরত হইতে পারি না।

আশ্রমের বার্ষিক বিবরণ

গত বৎসরের শেষে বসন্তোৎসব অধ্যাপকের সংখ্যা ২১ জন ছিল। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ, এইচ পি মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, নরসিংভাই প্যাটেল, ভূদেব বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়াছেন।

বৈশাখের শেষে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ বিদেশ-যাত্রা করিলে এবং আশ্বিন মাসে ক্ষিতিমোহনবাবু সর্বাধ্যক্ষ-তার পদত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় ঐ দুইস্থানে দক্ষতার সহিত কার্যনির্বাহক সভার কার্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সিন্ধুপ্রদেশ, বোম্বাই, আমেদাবাদ, নদীয়াদ প্রভৃতি স্থান হইতে খুচরা দানে ৬৪১০ টাকা আশ্রমে দিয়াছেন।

গুরুদেব বিদেশ গমন করিলে আশ্রমের বহু শ্রীযুক্ত মহাশয় যে রকম অনন্যকর্মী হইয়া নিঃস্বার্থভাবে নানাদিকে সাহায্য করিতেছেন তাহা আজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবন আশ্রমের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া আছে যে, তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলে তাহা আমাদের নিজের লোকের মূখে নিতান্ত অশোভন হইবে মনে করি।

আশ্রম সংবাদ

১০ই পৌষ খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নেপাল-চন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব মন্দিরে এই মহাত্মার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন।

মাঘ ১৩২৮

বিশ্বভারতীর পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা

ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি এই, “স্থির হইল যে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম সভারূপে গণ্য হউন”—

১। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। আচার্য সিলভা লেভি, ৩। ডাক্তার শিশিবকুমার মৈত্র, ৪। প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র, ৫। ধর্মায়র রাজগুরু, মহাস্থাবির শ্রীযুক্ত— ৬। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৮। জগদানন্দ রায়, ৯। ক্ষিতিমোহন সেন, ১০। নন্দলাল বসু, ১১। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ১২। নেপালচন্দ্র রায়, ১৩। ফণিভূষণ অধিকারী, ১৪। ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৫। অসিতকুমার হালদার, ১৬। উইলিয়ম পিয়ার্সন, ১৭। সি এফ এণ্ড্রুজ, ১৮। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ২০। সুরেন্দ্রনাথ কর, ২১। গৌরগোপাল ঘোষ, ২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৩। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪। তেজেশচন্দ্র সেন, ২৫। নগেন্দ্রনাথ আইচ, ২৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আশ্রম সংবাদ

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব দেশের কাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, সম্প্রতি তাঁহার পক্ষে আশ্রমে একসঙ্গে অধিকদিন বাস করা হইয়া উঠিতেছে না। গত এক বৎসরের উপর ভারতবর্ষের পীড়িত আত্মদের জন্য নানা স্থানে তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। গত আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে তিনি পূর্ব-আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, বিশ্বভারতীর ক্লাশ আবার নিরামিত পড়াইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে আরামের অবকাশ রাখেন নাই—তাঁহাকে মোপলা বিদ্রোহ সম্পর্কে মালাবার প্রদেশে যাত্রা করিতে হইয়াছে।

বৈশাখ ১৩২৯

আশ্রম সংবাদ

পদ্মনীষ গুরুদেব প্রায় একমাসকাল শিলাইদহে কাটাইয়া গত ২৭শে চৈত্র আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি এফ এন্ড্রুজও তাঁহার সহিত শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।...

এন্ড্রুজ সাহেব প্রায় একমাসকাল রেলওয়ে ধর্ম-ঘটের মীমাংসার জন্য ধর্মঘটকারীদের মধ্যে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন।

গত ৭ই ও ৮ই চৈত্র ধর্মঘট সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আশ্রমবাসী সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, ই আই আর-এর এজেন্ট ধর্মঘটকারীদের যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আশাতিরিক্ত এবং তাহা গ্রহণ করিলে সব দিক দিয়া কল্যাণকর হইত। এখন ব্যাপার বেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে হিংসা বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত নিবারণের সাধ্য কাহারও থাকিবে না। রাষ্ট্রনীতি নির্মম, সহপ্র সহপ্র নিরপরাধ নরনারীর সমস্ত সুখ দুঃখ কম্পিত তুচ্ছ লাভের আশায় বলিদান দিতে সে কুণ্ঠিত নহে, এইটিই আমাদের উৎকণ্ঠার বিষয়।—“আমাদের আশ্রমের তপস্যা সত্য হোক, সমস্ত বিরোধ বিক্ষোভের উপরেও আঙ্গিকার দৃঢ়তায় এখানকার ক্ষমা কল্যাণ এবং শান্তির ধারা ভারতবর্ষের সর্বত্র অব্যাহত হোক, তাঁহার চরণে এই আজ আমাদের একান্ত কামনা যেন হয়।”

আষাঢ় ১৩২৯

দারুণ গ্রীষ্মেও সমস্ত ছুটিটাই মিঃ এন্ড্রুজ ও মিঃ বেনায়া এখানেই কাটাইলেন।

শ্রাবণ ১৩২৯

আশ্রম সংবাদ

সাধ্য আলোচনা সভায় ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে খৃষ্ট ধর্মের পূর্ণ ইতিহাস লেখা হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কাহিনী এখনও অশ্ধকার আবৃত, এখনও তাহার আবিষ্কারের কাজ নানাস্থানে চলিতেছে। সৈদিন স্যার এ. পিটন চীন-

তুর্কিস্থানের মরুভূমির মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার নূতন বই সাড়িনিয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাদ্র আশ্বিন ১৩২৯

মিঃ এন্ড্রুজ বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ইংরাজী একটি ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেছেন। শীঘ্রই লক্ষ্মীপুরে All India Railway Conference-এর একটি অধিবেশন হইবে। মিঃ এন্ড্রুজ সেই সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কার্তিক ১৩২৯

আশ্রম সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ একবার মূলতান গিয়াছিলেন তিনিও এবার ছুটিতে গুরুদেবের সহিত আশ্রমের বাহিরেই আছেন। ছুটির পূর্বে তিনি সাম্প্রতিক সভায় কয়েকদিন ‘ভারতবর্ষের কাছে বর্তমান জগতেব দাবী’ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মন্ত্রভার পীড়িত কর্মকর্তার সভাজগতের মন্ত্রিত্ব যে বাণী ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে নিহিত আছে তপস্যা এবং সাধনার দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাহাকে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া সেই দেবাদিদেবকে—মাহার জাতি নাই এবং যিনি অবর্ণ—আমাদের অর্থ নিবেদন করিব—বিশ্বমানব তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, পরম দুঃখের মধ্যেও এই কথাটিকে আমাদের মনে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

মিঃ এন্ড্রুজও শান্তিনিকেতন হইতে পুণ্য গিয়া গুরুদেবের সহিত বাঙ্গালোর যাত্রা করেন।

আচার্যদেবকে কৈম্বাটোর হইতে অত্যধিক পরিশ্রম-বশতঃ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কিছুদিন বিশ্রামেব জন্য মাণ্ডালোর যাইতে হয়। সেখানে মিঃ এন্ড্রুজ বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

সম্প্রতি যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা হইতে মনে হয় খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। পূর্বকাল সকল ধর্মের মধ্যেই একটা প্রতিশোধের প্রবৃত্তি দেখা যায়। চক্ষুর বদলে চক্ষু, দন্তের বদলে দন্ত এই ছিল তাহাদের বাণী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এক নূতন সত্য প্রচার করিল, বুদ্ধ বলিলেন—প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয়

করিতে হইবে। এ কত বড় বাণী! এই পরম সত্য জগতের নানাজাতিকে আকর্ষণ করিয়া লইল। খৃষ্ট ধর্মেরও বাণী ইহাই। বৌদ্ধ ধর্ম যে বাণী সারা এশিয়াতে প্রচার করিয়া ইউরোপের দ্বারে আনিয়া দিয়াছিল, খৃষ্টধর্ম সেই বাণী এশিয়ার প্রান্ত হইতে সারা ইউরোপে প্রচার করিয়াছে।

মিঃ এন্ড্রুজ মধ্যে দু-তিনদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বভারতীর ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাস পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২১

আশ্রম সংবাদ

গুরুদেবের অনুপস্থিতিকালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য মিঃ এন্ড্রুজ প্রতি রবি এবং বৃহবার মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষের যে সব কর্মনিষ্ঠানে মহাত্মাজীর সঙ্গে মিঃ এন্ড্রুজ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত ছিলেন এবং মহাত্মাজীর জীবনের মূলমন্ত্র অহিংসা পরিচায়ক কয়েকটি প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে, কথাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ইহার পর উপযুক্তপরি কয়েকটি সাংবাদিকেরা তিনি মহাত্মাজী এবং আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে যে আলোচনা উপস্থাপন করেন তাহা খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই এই আলোচনাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

কৈম্বাটোরে মিঃ এন্ড্রুজ গুরুদেবের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় বিশেষভাবে তিনি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বলেন।

অগ্রহায়ণ ১৩২১

গুরুদেব ও মিঃ এন্ড্রুজ শীঘ্রই আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন।

ভাদ্র ১৩৩০

ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক M. Collins অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার পরিবর্তে Rev. Dr. Stanley Jones ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতেছেন। প্রমথ্য এন্ড্রুজ সাহেব ইংরাজী সাহিত্য ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

আশ্বিন ১৩৩০

শোক সংবাদ

বিলাত হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীযুক্ত

এন্ড্রুজ সাহেবের নিকট তারযোগে খবর আসে যে আমাদের পরম প্রমথ্যপদ শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব ইটালীতে ২৪শে সেপ্টেম্বর দৈব দুর্ঘটনায় ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সেই সময় তাঁহার ভাই ও বোন তাঁহার সহিত ছিলেন Pearson died, 24th September, result accident, Italy, his brother sister with him.

কার্তিক ১৩৩০

আশ্রম সংবাদ

প্রমথ্যপদ পিয়ার্সন সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থ কি করা হইবে সে বিষয়ে নির্ধারণ করিবার জন্য কলাভবনে একটি সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ বলেন যে হাসপাতালের উন্নতিসাধন করা মিঃ পিয়ার্সনের অত্যন্ত প্রিয় চিন্তা ছিল। তিনি শান্তিনিকেতন নামে ইংরাজীতে যে বই লিখিয়াছিলেন তাহার লভ্যাংশ এই হাসপাতালের সাহায্যকল্পে দান করিয়াছেন, ইহা ছাড়া তিনি বিদেশ হইতে মাঝে মাঝে হাসপাতাল ফন্ড সাময়িক দানও পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মোট টাকার হাসপাতালের নান্য রকম সংস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় হাসপাতালের উন্নতি করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ সাহেব সকলকে জানাইলেন যে মিঃ পিয়ার্সনের নামে এখানে একটি চিকিৎসালয় খোলা হইবে। ইহার এক অংশে গরীব গ্রামবাসীদেরকে বিনা পরসায় ঔষধ দান ও চিকিৎসা করা হইবে। পূজনীয় গুরুদেবও এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন। নতুন হাসপাতালের জন্য ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা যে দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার কিছু পাওয়া গিয়াছে। বাকি টাকার জন্য শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ পূজার ছুটিতে ত্রিপুরায় গমন করিবেন।

কার্তিক ১৩৩২

আশ্রম সংবাদ

প্রমথ্য এন্ড্রুজ সাহেব সম্প্রতি বিশেষ কারণে আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছেন। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে—এন্ড্রুজ সাহেব তাহা মিটাইতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার বিদায়ের উপলক্ষে আশ্রমে একটি সভা হইয়াছিল।

॥ অন্মৰ্ধনা ॥

ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ

প্ৰতীচীৰ তীৰ্থ হতে প্ৰাণসংসাৰ
হে বন্ধু এনেছ তুমি কৰি নমস্কাৰ
প্ৰাচী দিল কণ্ঠে তব বৰমাল্য তাৰ
হে বন্ধু গ্ৰহণ কৰো কৰি নমস্কাৰ।
তোমাৰে পেয়েছি মোৰা দানৰূপে যাঁৱ
হে বন্ধু চরণে তাঁৰ কৰি নমস্কাৰ।

(১৯১৪ সালে শাস্তিনিকেতনে এণ্ড্ৰুজ সাহেবৰ প্ৰথম সম্বৰ্ধনাকালে ৰচিত)

পূজার্নয়ের অন্তরে ও বাহিরে

চার্লস ফ্রীম্যান এণ্ড্রুজ

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ

সেখানে বিরাজ করে স্তম্ভতা,
রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত
রমণীয় আলো।

এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি, তার ন্যায়সনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ ও দঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মূকুটিত।
তিনি যেন বলছেন

“তোমরা যারা চলে যাচ্ছ,
তোমাদের কাছে একি কিছুই নয়?
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোন দঃখ কি আছে আমাদের দঃখের তুল্য?”

পৃথ্য দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হল।
মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাসবাণী—
“এসো আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এসো যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।”

এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলাম তাঁর স্বর্গলোকে।
শুনলাম, “উর্ধ্বে তোলা তোমার হৃদয়কে।”
উত্তর দিলুম, “প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেছি
তোমারই দিকে।”

চলে এসুম বাইরে
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।

তারা দেহকে পীড়ন করে চলেছে

ক্লান্ত আক্রান্ত গুরুভারে,
তাদের জন্য নেই স্বর্গ,

নেই হৃদয়কে উর্ধ্বে উদ্‌বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে

নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,

নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।

কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত তৃষ্ণার তারা, ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস
পরিপোষণহীন দেহ।

এ দিকে তাঁর বিষন্ন দঃখাভিভূত মুখশ্রী,

উদার বিচারের মহিমায় তিনি মূকুটিত।

গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

“আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি

যে নিম্নতা

সে আমারই প্রতি।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

C. F. ANDREWS
from Viswabharati News

১৯৩২ সাল থেকে ইংরাজী Visva Bharati News প্রকাশিত হতে থাকে। এঞ্জেল সাহেব শান্তিনিকেতন আশ্রমজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমবন্ধু বলে সম্মান জানাতেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবং আশ্রমের সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল তারই সাক্ষ্য হিসাবে Visva Bharati News-এর এঞ্জেল সম্পর্কে খবরগুলি সংকলিত হলো।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের দিক থেকেই এই সংকলনের তাগিদ, তাই মূল ইংরাজী রক্ষিত হলো, অনুবাদের চেষ্টা করা হয়নি।

September, 1932

Nitindranath Gangulee,

Words utterly fail to convey the bereavement we feel at the passing away of the poets only grandson Nitindranath from our midst. Those of us who were here last year cannot fail to remember his charming and youthful personality and the loss we felt at what we then considered a temporary separation. He left for Germany in April 1931 and letters assured us of his health and progress until news suddenly arrived some two months ago that the tuberculosis which had been suspected some time back had appeared in unmistakable form. His mother Mira Devi, left for Europe last July and was able to be with him during his last moments, in the beginning of August. His temporary separation has become permanent, but each one of us who knew him shall, as long as we ourselves live, carry the picture of his youth, beauty and charm within the innermost recesses of our being. And later—who knows whether this separation will be eternal?

The following are passages from a letter written by Mr. C. F. Andrews, who was present at Schomberg, to the poet.

“We were able to complete everything in connexion with Nitu’s last resting place in the village graveyard at Schomberg where his body rests among the village people who have been buried there. It would be difficult to find a more beautiful spot where nature sheds her beauty so lavishly on every hand. There is a pine forest always musically whispering as the wind passed through its branches. It is at the very edge of this that Nitu has been laid to rest as far as his dear earthly remains are concerned. The grave has been already covered with beautiful growing flowers and a tree with its young slender stem waves its tender branches at the foot of the grave. It is a flowering tree in the summer and now the red berries on it are providing food for the birds which love the place. Far away to the distant horizon in front of the valley with its green fields and gardens stretches out while the village nestles below in a covert of the hill side and

the church tower stands out against the sky. We are very anxious that Nandalal should make with his own hands a covered brass design which will contain a text from your own hand. Thus a memorial in this German land of love and friendship for India will bind the two peoples together. It would be quite impossible to describe the lavish affection which has come from these dear people and has turned sorrow almost with joy."

A touching tribute has been paid to the deceased by his father Dr. Nagendranath Gangulee, who has arranged for a 'Nitu Memorial Bed' in the Pearson Memorial Hospital which will be for the service of the Ashrama and the villagers if they need treatment as the in-patient. He also wishes a few articles of furniture belonging to Nitindranath, which are to be sent direct from Munich to be used in connexion with the bed and an appropriate inscription to be placed at the head of it with some Bengali words from Rabindranath.

Oct. 1932

We thankfully acknowledge the following donations during the last financial year (October to September):

	Rs.	as.	p
The Maharaja of Pithapuram	1000	0	0
Miss Hilda Cashmore and			
Mr. Eric Hayman	30	0	0
Mr. W. N. Edwards	65	14	0
Haverford Friends School	54	0	0
Govt. of Bengal	3000	0	0
Mr. C. F. Andrews	4500	0	0
Maharaja of Bansda	500	0	0
Roland Hamilton	50	4	0

March 1933

Santiniketan
August 2, 1932

Dear Charlie,

I have read your book on Christ. It made me think. The mode of self-expression in a Christian life is in love which works, in that of a Hindu it is in love which contemplates, enjoys the spiritual emotion as an end in itself. The attitude of mind that realises the superhuman in a human setting has rendered a great service to civilization, just as its perversion has been the cause of an awful and widespread mischief. You know how all through my life, my idea of the divine has concentrated in Man the Eternal and I find that in your own religious experience. You have the same idea concentrated in a concrete historic personality. Evidently it strongly helps you in the realisation of perfection in your life and it must be a source of unflinching consolation to you to be able to feel in your constant love a divine comradeship in Christ. The mental and physical energy stored up for ages in your Western constitution urges you to activities that are saved from aberration when they are related to a living centre of Truth. Instances of heroic devotion and unselfish sacrifice springing from that source are most valuable for us in order to keep us firm in the faith in the abiding truth in the immortal. And I knew you have been of help to your fellow being not merely for some individual benefits that you may have rendered them but for a direct inspiration that gives us certainty of the ultimate greatness of Man.

With love,

Ever yours,
Rabindranath Tagore.

Sept 1933

Poona
23.8.33

From C. F. Andrews

Gurudeva
Santiniketan

Thank God. Agony over. Bapu resting quietly Parnakuti. Sends love.

Charlie.

C. F. Andrews arrived in India on the 17th August last and immediately rushed off to Poona to be by the side of Mahatmaji during the fast. He will be coming here as soon as he is free from his discussions with Mahatmaji.

Oct. & Nov. 1933

It was a great delight for all of us to receive our old friend C. F. Andrews again at the Asrama on Tuesday, the 3rd October. In spite of incessant and clamorous demands from various places all over the country he managed to spend a quiet week here. "The Wandering Christian," as he has been so aptly described by a witty friend, sails for England on 11th November next and within a short time of his going home he will sail again for South Africa to help our suffering compatriots there.

February 1934

Rabindranath has sent a detailed telegram to Mr. Andrews in England about the earthquake devastations in Behar for the purpose of issuing an appeal in foreign countries in his name.

October 1934

Our old friend C. F. Andrews taking

advantage of his present hurried visit to India, came and spent a restful week with us in the middle of the last month. He arrived from Wardha where he was carrying on important discussions with Mahatma Gandhi on the 16th September and left on the 23rd for Patna for a visit to the flood stricken areas of Behar. He sails from Bombay on the 6th of this month for England.

Perhaps the younger and the newer members of the staff as well as the present students community do not fully know of the relations that exist between C. F. Andrews and ourselves. For he is one of us and will ever remain so. In whatever part of the globe he might be, he always looks upon Santiniketan as his real home and whatever be his other affections, Rabindranath is always his dearest Gurudeva. There is no department at Santiniketan, no branch of activity here that has not received his generous contribution, material and spiritual. Larger humanity has now claimed him away from us and deprived us of his immediate physical presence. But in one way he is also one of the gifts of the Visva Bharati to the world.

During the days, but too brief, that he was here he again lived the normal life of the Ashrama, taking part in our daily work. He attended a social arranged in his honour by the Visva Bharati Sammelani and gave a lecture on the Zanzibar situation under the auspices of the said Society. He met the heads of the departments and other important workers and immediately

discussed the present state of affairs here. He said he noticed allround progress and hoped it would be maintained.

He held out the promise of another visit to India and to us sometime in early spring, next year.

December 1934

Mr. C. F. Andrews has come back to India for a few days' hurried consultation with Mahatma Gandhi and it is expected he will make time to visit us during the coming Utsab.

January 1935

C. F. Andrews was again with us for 4 days during the Pous Utsab. It was after many long years that he was present for the Utsav. On the 24th morning he gave a short sermon on the life of Jesus Christ and then presided over the annual gathering of the ex-students. He expects to be back here during the summer and spend a couple of months with us.

The 34th anniversary of the Santiniketan Asrama was celebrated in the usual manner on the 23rd of December. Last year Rabindranath himself could not join the festival as he was away in Hyderabad raising funds for Visvabharati. But on this occasion he made it a special point of being present and presiding over the function as the Acharya. Fortunately for us Mr. C. F. Andrews also happened to be in India at that time and he too was present at the ceremony. An important feature of the utsav this year was the presence of a large and representative gathering of ex-students who evinced great interest in the

recent developments of their Alma Mater.

On the 7th Pous Gurudev conducted the service in the Mandira. On the 8th Pous C. F. Andrews delivered a sermon on Jesus Christ in celebration of the Christmas eve. Later on he presided over the annual general meeting of the Asramika Sangha.

March 1935.

Letters from Abroad—Pretoria Jany. 14.

"I have been living most of my time with Mr. Gandhi himself and have learnt to know him as a friend. He is all that we in India felt him to be and more besides, a saint of the heroic type, a saint of action rather than of contemplation, essentially India in his inner life though touched by the activity of the west. Every day I see more and more the magnificent heroism of his position and the originality of his mind and the tenderness of his nature. Yet much as I wished to do so (for his noble character was transparent) I could not love him immediately, instinctively, as I loved you when I saw you in England. I did not, of course, expect that to be repeated in its intensity for it was a unique experience which *could*, never be repeated. But I did expect with all my overflowing love of India to find that love running freely between us. It was done so to a certain extent, but not as it did at the Ashrama or in Bengal. The fact is you in Bengal have spoilt me! You have accepted me with such abandon and unreserve and my own nature has so easily responded. But here I find I have to cut channels for love to run freely and to get past the barriers of

mere kindness and friendliness which fall short of true love, . . . When I am walking with you at sun-set or sitting in the moonlight I only want to be quiet and share your stillness of spirit and then I am supremely happy and love flows in a hundred unseen ways. But this unity of spirit I cannot as yet feel with my new Gujrati friend ; for it does not seem to exist for him. But if on the other hand I do some simple act he is deeply touched and love flows forth.

May 1935

We are glad to learn that C. F. Andrews will reach here on the 1st of May and spend a month in the ashrama. It is an extremely welcome piece of news to us as we shall have him for the birthday celebration of the Founder-President to be held on the 8th May.

June 1935

C. F. Andrews arrived in India too late to take part in the poet's birthday celebrations, having been detained in England for some important discussions with the authorities. He is now staying at Simla and is busy giving finishing touches to his coming book on the Indian political situation. He will spend the monsoon term with us in the ashrama.

July 1935

C. F. Andrews arrived in Santiniketan on Sunday 14th July for a stay of few weeks before returning to England. He is busy giving finishing touches to his coming book called *India and Britain : a moral challenge*. He delivered two lectures

to the students on the subject.

An evening with 'A. E'.

[George Russell, the Dublin Poet]

For Rabindranath Tagore himself he had a very deep affection, which had reverence at its base. He admired him not only as a poet but as a man ; and while he sought from me information about the poet he also gave me lavishly his own ideas in return. He seemed to know Tagore's prose-poems almost by heart and referred to them again and again. Gitanjali was the book he loved best. Among the prose works of Tagore he told me that *Sadhana* had been of the greatest help to him and had made its deep impression on him because it was the first book to explain to him quite clearly the outline of the philosophy of the East, which he longed so much to understand.

Sept. 1935

C. F. Andrews left the ashrama on the 3rd August last for Ahmedabad where he spent the rest of the month trying to raise some money for Visva Bharati. He will sail for England by the P & O boat S. S. Corfu Due to leave Bombay on 31st August.

May & June 1936

Twenty five years ago, my whole heart was given to the poet, Rabindranath Tagore and it has remained with him ever since. He has been my Gurudeva, teaching me to understand and love humanity in the East no less than I had learnt in earlier years to love it in the West. By his love and patience he broke down within me the

narrow barriers of religious tradition which had confined me before, owing to my birth upbringing and education. Nothing but a friendship so deep and sincere as his could have effected this. Now looking back after a quarter of a century, I can say with truth that this friendship has grown stronger as the years have passed and has remained steadfast throughout. It has been a supreme treasure in my life ; the greatest gift which God has given me in human ways.

July 1936

C. F. Andrews is now on a lecturing tour in Australia and in a recent letter to Rabindranath, he gives us the happy news that towards the end of August next he hopes to be again here for some time on his way back to Europe.

Sept. 1936

In a letter to Rabindranath from Fiji C. F. Andrews gives us the welcome news that he will be in the Asrama by the middle of November. He is now in Australia on a lecturing tour. As usual, Santiniketan and its Founder-President loom large in these lectures.

Nov. & Dec. 1936

C. F. Andrews who had come to India a few weeks earlier on his way-back to England on the completion of his Australian tour arrived on 28th November for a few days' stay. We are sorry that

the strain of the tour has proved too much for him and he is far from well.

Sept. 1937

C. F. Andrews came to India in the first week of August. He has been forced by ill health to take a few weeks' rest in Simla. He is making use of this leisure by writing the last chapters of his forthcoming book on the life of Christ.

Oct. 1937

Almost at the same time that the poet lay unconscious, hovering between life and death, C. F. Andrews at Simla lay struggling in the grip of a severe attack of Choleric dysentery which had well nigh proved fatal. Not only we in the asrama who look upon uncle Charlie as our own and love and revere him next only to the poet, but the whole of India will rejoice and be grateful that the life of this noble lover of men has been spared to us. As the poet was saying only yesterday evening, he respects Christianity not so much because he has *read* the life of Jesus as because he has known the lives of Pearson and Charlie. Some of the letters that Andrews has been writing of late to the poet make very noble reading, coming as they do direct from the heart of a sincere lover, but as some of them are too personal and as there is not enough space at my disposal, I am reproducing only his last letter :

"My dearest Gurudev,

The joy and thankfulness at your recovery still remain uppermost in my mind and have greatly helped to give me back my own health again ! I am busy at your

book, which I am dedicating to you. For many years past, ever since that outrageous attack of 'Mother India' there has been a constant stream of books of a similar kind and along with them there have been missionary publications always emphasising the darker side, so that it almost becomes stereotyped in the minds of Western readers, that the whole of India is a land of 'untouchables' and of 'Hindu Muslim riots'. The present is a good occasion to do something to dissipate those impressions without in any way condoning what is wrong in India and it seemed possible for me to do it. For a very long time I have been troubled and distressed at all these attacks and now an opportunity has come to say something positive. Ten years ago when 'Mother India' first appeared, Mahatmaji asked me to go direct to England and sit down and answer that book, but I did not then see its importance or realise his practical wisdom.

Here the sky is blue again and the joy of recovering has been very great indeed. I cannot help sharing it continually with you, for I know you are sharing it with me.

The Rajkumari sends her love.

With all my love,

(Sd) Charlie

January 1938

Inspite of strain involved, he [Rabindranath] delivered the annual sermon at the Mandir on the Founder's day on the 22nd of December. But it was thought inadvisable for him to undertake

any other responsibilities during the festival and in all other functions, C. F. Andrews, who had arrived only a few days before, officiated in his place. Mr. Andrews is now busy with his biography of Jesus Christ and will stay on at Santiniketan for some weeks before returning to England.

The Annual General Meeting of the Ashramika Sangha took place at the Amra Kunja on the 23rd of December under the presidency of Sjt C. F. Andrews. There was a large attendance of old students and teachers. Mr. Andrews spoke, as follows :

"When Mahatma Gandhi came to learn that I should be shortly leaving for Santiniketan he wanted me to convey his love to you all and with his love comes his blessings. His health has been a cause of anxiety to us for a long time. We hope and pray that the rest that he is taking now in the mild climate of Juhu will give him back to us restored in health and strength."

"There will be no end of telling stories if I once start recalling the early days when Santiniketan and Sriniketan were small in area though naturally full of the promise of their great future. Nevertheless I cannot help recounting a few touching episodes : and the first name that comes to my mind is that of our dear friend William Pearson. As far back as 1913 we lived in one house together close by this spot where we are now seated, and if these old mango trees and the long row of tall sal trees could tell their own tale they would bear testimony of those wonderful days.

After his sad death by railway accident in Italy, we constructed a road called Pearson Road which leads to the Santhal village. On the Pearson anniversary I pointed out that just as this road led to the Santhal village so Pearson was always reminding us of our duty towards the poor and humble folk around us. One of the little boys of the Asrama came to me and said "I have a better story than that," when I asked him with a smile what it was, he answered "Dont you see that the Pearson Road lead from East to West and also from the West to East? That is what Pearson used to do."

"This was wonderfully true for that is what Willie Pearson was always doing. He tried to bring the whole world to a better love and understanding. Another name that occurs to me is that of Santosh Chandra Mazumdar who did pioneer work to help in starting the rural reconstruction work of the Visva-Bharati in Sriniketan, which is working out some of the most intimate ideals of our Gurudeva, among the villages. In those days Surul was full of malaria, but he went fearlessly to live among the poorest, lowliest and the lost.

Mr. Andrews then referred to the close personal memory of his own serious illness of Cholera in 1915 when his mohamedan servant and cook rendered him services instinct with the spirit of devotion and sacrifice. "When I think" he said "of the question of Hindu Muslim unity, I always remember that I owe my life to Jahuri, my dear mussalman cook who nursed me during the first night

of agony. It was vacation time, and I was all alone because every one had gone away. I remember also how Gurudeva himself came the very next day from Calcutta and the sight of his dear face brought me back to life. This year when I was lying ill in hospital in Simla, and when Gurudeva was far more seriously sick here, I remembered those days and yearned to come to his bedside and render whatever service might be possible and now, this time, I come back to this old dear ashrama with new life and new determination. Santiniketan has a message not only for Bengal or India but for the whole world. I have everywhere found how that one slender book of Gurudeva's "Gitanjali" has contributed more to a sincere desire for peace and goodwill among mankind than anything else. My one ceaseless prayer to God is that He should grant me the strength to go on dedicating my life to this work of love for all mankind which Gurudeva has built up."

Mr. Andrews concluded by suggesting that a complete record of the students and teachers who had lived in Santiniketan should be carefully kept. Such a record would bear evidence of the creative work and spiritual genius of Gurudeva Rabindranath Tagore.

February 1938

(Note for the poem The Tajmahal)

Twenty five years ago, Willie Pearson gave me one day a translation he had made of Satish Chandra Ray's poem on The Taj Mahal, and I tried to capture the spirit of it in English verse. It was published, I think, in the 'Nation' but I

have revised it since then until it has taken the form given below. Satish was one of the earliest and most brilliant teachers of our ashram—C. F. Andrews

March 1938

The fifteenth anniversary of the Institute of Rural Reconstruction, at Sriniketan, was celebrated on the 6th of February last. In the unavoidable absence of the Founder President, C. F. Andrews presided over the function which was attended by hundreds of people from the neighbouring villages.

HOW SRINIKETAN BEGAN

C. F. Andrews

More than quarter of a century ago, in the year 1912, I was with Rabindra Nath Tagore, in a suburb of western London named Ealing, when a transaction was made with Major Sinha of Raipur the brother of Lord Sinha, in the course of a few moments' conversation, whereby the old house and its surroundings at Surul were purchased. I can well remember at the time how the whole matter was settled between the two friends. The price offered was immediately accepted. It seemed to come like a flash to our Founder, that here, on this very spot, something great was going to happen; and to day after a quarter of a century we see how right he was but so little did I realise there at Ealing that what was likely to prove an important event in the history of Bengal was then taking place.

In the very next year, 1913, when I first came to Santiniketan one of the teachers took me over the upland to Surul in order to visit the house there.

This new venture was to be made and there our new agricultural work was likely to begin. My heart sank within me as I noticed the dilapidated state into which everything had fallen. Indeed the land all round the great central house had gone back into the jungle. It was clearly a deadly breeding place for malarial mosquitoes.

When the poet himself came back from Europe I told him how I had marvelled at his act of faith in determining to start work under such exceptionally adverse conditions. Indeed I also openly expressed to him my own misgivings; but he simply brushed them aside and remained quite resolute about the future. Indeed he seemed already to have foreseen in his wide vision what was going to happen.

—

There were pleasant informal ceremonies, both at Santiniketan, and Sriniketan on the 12th of February last on the happy occasion of the 68th anniversary of the birthday of C. F. Andrews. It was after many years that we had the pleasure of having him in our midst on this day. His youthful vitality has successfully kept at bay the ravages of age and for the sake of suffering humanity we hope and pray he will be spared to us for many years to come.

We are happy to learn that he has been invited to deliver the Convocation Address of the Calcutta University on the 5th of March.

April 1938

C. F. Andrews who had been staying at the asrama for some time past left for Madras on the 16th of March. It

is expected that he will come here again during the winter and make a long stay.

June 1938

C. F. Andrews is busy editing a complete authorised edition of Rabin-dranath's prose writings which will be a companion volume of his "Collected Poems" published by Messers Macmillan & Co., two years ago. The book will contain some of his latest articles which have not yet been published in book-form.

August 1938

An Open Air School (Contd)

C. F. Andrews

Sept 1938

An Open Air School

C. F. Andrews

Oct 1938

A Letter

C. F. Andrews

January 1939

In the vacancy created by the retirement of Charu Chandra Datta, the Samsad (Governing Body) has unanimously elected C. F. Andrews as Upācharya (Vice President) of the Viswabharati for a period of two years commencing from January 1939. It may be noted here that Mr Andrews had been our first Vice-President when the Viswa-Bharati was formally inaugurated in 1921.

He returned to the Asrama from Madras on December 24 to take part in the anniversary celebrations and left the next day for Allahabad where he had to preside over the All India

Philosophical Congress. He is expected back in the first week of January.

February 1938

C. F. Andrews, our Upacharya, after his visit to Orissa returned to the Asrama on Jan 13, where he has been staying since then, relieving Gurudeva considerably of his official work. We expect him to be with us till the end of this session.

April 1938

Upacharya C. F. Andrews left for Delhi on March 17 to be with Mahatma Gandhi and help him in his work there. We are much distressed to learn that he is suffering from high blood pressure and has had to cancell all his engagements and seek shelter in the Hindu Rao Hospital. As soon as he is better and fit to undertake the journey, he will leave for a quiet hill station in South India.

His new book 'The True India' has just been published by Messers George Allen & Unwin Ltd. It is dedicated with love to Gurudeva.

May 1938

Old Memories of the Asrama

—C. F. Andrews.

Upacharya C. F. Andrews who was with Gurudeva during his stay at Puri left on May 9 for Coonoor where he will spend the summer months. He is much better now, even though his blood pressure continues to remain considerably above the average.

June 1938

To Gurudeva

Time can but add to thy majestic
brow
The snowwhite radiance of the
mountain height.
Thou canst look back on all the past
years now.
Veiled in the clouds below, while
azure light
Crowns thee with splendour.
As a noble singer
Who never stooped to baseness in
thy verse
Thou hast loved this life, and longed
to be a bringer
Of joy to young and old, who shall
rehearse
Thy songs, and hand them on from
age to age,
To gather laurels as the seasons roll,
And give mankind a generous
heritage
Of all the tenderest hopes that touch
the soul.
Poet while other glories fade and die
Thy words have won their immor-
tality

— —

September 1938

Our Vice-President C. F. Andrews has been requested by the Indian Community in South Africa to go there to advise them in view of the contemplated drastic regulations of the Union Government against the Asiatics. In spite of his indifferent health, he has decided to leave towards the beginning of September for South Africa but he hopes to be able to return in time for the pous festival here on the third week of December. At the moment he is staying at Christakula Asrama at Tirupattur.

December 1939

Upacharya C. F. Andrews who has been undergoing a course of electric treatment will return to the asrama towards the second week of December and will spend the winter term at santiniketan. Owing to the war he has had to cancel his tour in South Africa where his presence was urgently needed by the Indian community faced with several anti Indian legislative proposals.

January 1940

Besides the usual festivities and the Xmas service conducted by Mr. C. F. Andrews, meetings of the Karma Samiti, Samsad and the Annual general Meeting of the Viswa Bharati Parishat took place during these days. There was a good gathering of the alumni and the Asramika Sangha held their re-union in the Mango Grove presided over by C. F. Andrews.

February 1940

We regret that C. F. Andrews has been keeping rather indifferent health for some time now. He left for Calcutta on January 27 and has been admitted to the Presidency General Hospital for treatment. We earnestly hope to see him on the way to recovery at an early instant.

March 1940

Our Upacharya C. F. Andrews is lying seriously ill in the Presidency General Hospital, Calcutta.

He had an attack of dysentery while residing in the asrama and towards the last week of January decided to make a journey to Calcutta in order to undergo a course of treatment there. Subsequently he developed high blood pressure and

other symptoms necessitating a minor operation for the latter. The operation along with a number of serious complications brought severe strain on his system and for over a week now his condition has been causing great anxiety.

Numerous friends and admirers of C. F. Andrews will be glad to know that all possible arrangements have been made for his nursing and medical treatment. The medical council formed in Co-operation between the authorities of the Presidency General Hospital and some of the best Indian physicians and surgeons outside, will enable the public to get authoritative news from time to time.

The second operation, which it seems has to be undertaken in order to deal radically with the disease will be postponed for the time.

We offer our prayers for the early recovery of our Upacharya and hope that he will be spared to us and to humanity for many more years to come.

April 1938

--- In Memoriam ---

As the news was being despatched information reached us that our Upacharya C. F. Andrews passed away peacefully in the early hours of the morning on April 5 at the Riordan Nursing Home, Calcutta.

Following a simple yet impressive service at the St. Pauls Cathedral the cortege, followed by hundreds of people, was taken to the Lower Circular Road cemetery where the remains were interred. The most Reverend Dr. Foss Westcott, Lord Bishop of Calcutta and Metropolitan of India, officiated at the service

and also performed the last rites at the grave side. The Lord Bishop was one of Andrews oldest friends.

Mahatma Gandhi was represented at the funeral by Sri Mahadev Desai, his secretary, and Gurudev was represented by Rathindranath Tagore.

The passing away of our Upacharya C. F. Andrews plunged the whole Asrama into the deepest gloom. In the afternoon of April 5 a memorial service was held in the Mandir. Gurudeva addressed the congregation.

A short summary of the address is given below

[The Bengali original version is printed in this number]

Grave anxiety is felt here on account of a serious set back in our Upacharya C. F. Andrew's condition. He was removed a few days ago from the presidency General Hospital to a private nursing home where a second operation so long deferred was performed successfully. The operation was undertaken on march 3, and since then we have been receiving telegraphic messages bearing upon his condition. Earlier reports were definitely reassuring, but later on there was a critical turn due mostly to his general weakness and advanced age. We hope and pray that he might be given the strength to go through the crisis successfully.

Prayers were offered both at Santiniketan and Sriniketan for his early recovery. May he be long spared to us and to the world.

Gurudeva has received a number of messages of condolence from many friends of C. F. Andrews all over the

world. Their sympathy has touched him deeply and Gurudeva regrets it is not possible for him to acknowledge the messages individually. Copies of the messages are being sent to Andrew's sisters in England.

We intend to bring out a special Andrews-Memorial number as the June issue of the Visava-Bharati News.

(On the eve, of his second operation C. F. Andrews dictated the following message to Amiya Chackraburty and asked him to hand it over to Gurudeva if anything should happen to him.)

During these days of waiting since the decision was taken that I should have this operation, my thought have all the while been with God and I know that whatever happens His will will be done. Everyday I have been praying the prayer ; Thy will be done. I have been wonderfully helped in thus keeping Shanti by thoughts of Gurudeva and all I have learnt at Santiniketan ; also by Mahatma Gandhi and what I have learnt from him all these past years. Above all, from the loving spiritual visits in the hospital, from day to day, of the Metropolitan whose christian faith has marvellously sustained me through all these days of very great suffering and bodily weakness. He has become in these days dearer to me than ever he was before. I have found how absolutely his heart is one with mine in his love for India and for all the world.

God has given me in my life the greatest of all gifts—namely, the gift of loving friends. At this moment when I am laying my life in this hands, I would like to acknowledge again what I have acknowledged in my books—this supreme

gift of friendship, both in India and in other parts of the world. For while I have written so far about those who are near me here in India I have been all the while equally conscious of the loving friends in my own dear land of England whose spiritual help I have been receiving along with constant letters and telegrams. I have also had the same spiritual help from friends who have remembered me in other parts of the world.

While I have been lying in the hospital I trust that my prayers and hopes have not been merely concerning my own sufferings which are of the smallest importance to day in the light of the supreme suffering of the whole human race. I have prayed every moment that God's Kingdom may come and His will may be done on Earth as it is always being done in Heaven.

30, 3, 40 (Sd) Charlie Andrews

In April, 1914 C. F. Andrews came here to finally dedicate himself to Gurudeva's Work. On that occasion he was given a reception by the Asrama where Gurudev recited a poem especially composed to welcome the guest.

Gurudeva's own translation of the poem is given below—

From the shrine of the west
You have brought us living water
We welcome you, friend.
The East has offered you
Her garland of love,
Accept it and welcome, friend.
Your love has opened
The door of our heart,
Enter and welcome, friend
You have come to us
As a gift of the Lord,
We bow to him, friend.